বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ঃ বারো

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৬০,
তৃতীয় মুদ্রণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩
চতুর্থ মুদ্রণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—বঙ্কিমবিহারী রায়
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭/এ, বলাই সিংহ লেন,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট-শিল্পী
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

তিন টাকা পঞ্চাশ ন. প.

এই পৃথিবীকেই রোজ দেখায় আর হঠাৎ একদিনের দেখায় এক এক সময় বড় প্রভেদ হয়ে যায়, তারই নগণ্য ইতিহাস এই চিঠিটুকুতে রয়েছে। এতই নগণ্য যে, এক একবার মনে হয় এ চিঠির খাম ছেঁড়া না হলেই যেন ভালো ছিল।

'গুপী-নারাণী-পালবৌ'-এর কাহিনীটি বহু পূর্বে বেরিয়েছিল, পরে আমার একটি গল্পপুস্তকে স্থান পেয়েছে। ওটিকে আবার এইখানে গুঁজে দিলাম কেন, আশা করি তার কারণ পাঠক-মাত্রেই আন্দাজ করে নেবেন, আলাদা কৈফিয়ত দেবার দরকার হবে না। এবার থেকে ওর জায়গা কায়েমীভাবে এখানেই।

এই সাত-আট বছরের মধ্যে মাঝেরহাট-ফলতায় অনেক কিছু বদলেছে, স্বতরাং কেউ যেন খুঁটিনাটি মেলাতে না যান—নিজেও বিড়ম্বিত হবেন, আমাকেও বিড়ম্বিত করবেন।

ব. ভ. ম.

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু॥

—রবীন্দ্রনাথ

এক

প্রীতিভাজনেষু,

জীবনে সবচেয়ে কিসে বেশি আনন্দ পেয়েছি জানতে চেয়েছ। বড় শক্ত প্রশ্ন। এই অর্ধশতাব্দী ধরে একটা জীবন, মহাকালের দিকে একবার চোখ তুলে দেখলে যেমন কিছুই নয়, একটা বুদ্বুদ মাত্র, যা এইবার ফেটে মিলিয়ে যাবে, মানুষের সীমাবদ্ধ আয়ুষ্কালের তুলনায় আবার তেমনি অনেকখানিই তো? এতে, এরই মধ্যে কতভাবে কত আনন্দের আলো ফুটল, কত দুঃখের ছায়াপাত হল, গভীরতার অনুপাতে তাদের ওপর নম্বর বসিয়ে হিসাব করে বলা কি সহজ?

উত্তরটা দেবার চেষ্টাই করতাম না, "একরকম আছি, সর্বাঙ্গীণ কুশল তো?" বলেই সেরে ফেলতাম চিঠিটা, হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটা জিনিসে খুব আনন্দ পেয়েছি এক সময়। সবচেয়ে বেশি কিনা—তোমার এই সবচেয়ে শক্ত প্রশ্নটার উত্তর দেবার চেষ্টা না করে কথাটাই সোজাসুজি বলে যাই, লিপির দীর্ঘতা দিয়ে যদি আনন্দের গভীরতা মাপবার চেষ্টা কর, আমার আপত্তি নেই।

ঘোরা বাই ছিল খুব বেশি। ভুল বুঝতে পার, তাই বলে দিই এ-ঘোরার মধ্যে কোন আভিজাত্য ছিল না। হোল্ড-অল-সুটকেস-ব্রাডশ-বিবর্জিত এই ঘোরা, এর একদিকে যেমন ছিল না সিমলা-শিলং-উটী, অন্যদিকে তেমনি ছিল না—কাশী-কাঞ্চী-রামেশ্বরম্। বড় কাজের পর বড় অবসরে একটু বড় করে হাঁপ ছেড়ে আসা নয়, নিত্যকর্মের মধ্যে সামান্য একটু পলাতক-বৃত্তি—এই ছিল আমার ঘোরার মূল কথা। এত সামান্য কথা যে লিখতে কুণ্ঠা আসে!

কিন্তু কি করব? ঐতেই পেতাম আনন্দ হয়তো সবচেয়ে বেশিই। যদি বলি, ঐ একটুখানি ঘুরে আসার নেশা আমায় ঘটা করে ঘোরার উল্লাস থেকে

বঞ্চিত করেছে তো মিথ্যা বলা হবে না। নিতান্ত কেজো ভ্রমণের মধ্যে ফাঁকি দিয়ে আমি দিল্লী, আগ্রা, প্রয়াগ এদের টুরিস্টদের ফাঁকির নজরে যা একটু দেখে নিয়েছি এককালে; তাই—লিখতে লজ্জিত হচ্ছি—পাঁচজন জানিয়ে-দেখিয়ের মধ্যে বসলে একটু মাথা হেঁট করেই বসতে হয় আমায়।...."না মশাই, কাশ্মীরটা দেখিনি,....দার্জিলিংটা হব-হব করেও হয়ে ওঠে নি এখনও ...না, যাব-যাব করেও চন্দ্রনাথটা কৈ আর হয়ে উঠল?"...এত 'না'-য়ের সঙ্কোচের মধ্যে সোজা হয়ে থাকা যায় কেমন করে?

বিপদ এইখানে যে বাঙলাদেশ আমার প্রবাসী মনটাকে অষ্টপ্রহর রাখত টেনে—এর নদী-নালা, ডোবা-জঙ্গলের অদ্ভুত মোহ দিয়ে; এর ভাঙা অট্টালিকা, পুরনো দেউল, জটিল বট-অশ্বত্থের মৌন স্বপ্ন দিয়ে মৃত্যুর কোলে এর জীবনের যতটুকু বেঁচে আছে—এখানে-সেখানে—তার হাসি-অশ্রুর অপূর্ব মাধুর্য দিয়ে। ত্বর সইত না; কাজ নিয়ে গেলে ক্রমাগতই মনটা ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়বার অবসর খুঁজত, আর যখন শুধু অবসর বিনোদনের জন্যই যেতাম দেশে তখন তো কথাই নেই, নাকে মুখে তাড়াতাড়ি দুটি গুঁজে সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তায় পা না বাড়ালে চলতই না আমার।

কি করব?—ঘরের মোহ কুণো করে রাখত আমায়। কবিগুরু যার জন্যে আপসোস করে গেছেন—

'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু—'

—তারই সাতরঙা আলো থেকে যদি আমি চোখ ফিরিয়ে দূরের দিকে চাইতে পেরে থাকি তো আমায় দুষবে কেমন করে?

মনকে একেবারে মুক্তি দিয়ে বেরুতাম, বয়স ভুলে, অবস্থা ভুলে, পদবী ভুলে। পাছে এই মুক্তির মধ্যে একটুও বাধা এসে পড়ে এই জন্যে আমার এ ধরনের পর্যটনে কখনও সাথী নিতাম না। যেখানে খুশি যাব, যা খুশি দেখব, যখন যেখানে যেভাবে খুশি বসব, যতক্ষণ খুশি মূঢ় বিস্ময়ে হাঁ করে থাকব

চেয়ে—এত নিজেকে এলে-দেওয়া ভ্যাগাবণ্ডিজমের সাথী পাওয়া দুষ্কর; আর সত্যি কথাই বলছি, এই ভূতে-পাওয়া মানুষটাকে বুঝবে এত অন্তরঙ্গ বন্ধু বা আত্মীয় আমি পাই নি এখনও। আমার সত্তার এখানটা অনাত্মীয়ই থেকে গেল।

ধরো, গ্রীষ্মের দুপুর ঝাঁঝাঁ করছে, আমি চুপ করে বসে আছি ফলতা-কালীঘাট রেলওয়ের মাঝেরহাট স্টেশনে; এই লাইন ধরে যেতে হবে। কোথাও যাওয়া তা এখনও ঠিক করে উঠতে পারি নি। পৌনে দুটো হয়েছে, দুটো সাতচল্লিশে গাড়ি ছাড়বে, ততক্ষণ বসে আছি টিকিটঘরের সংলগ্ন বারান্দায় বেঞ্চটাতে। আমার একদিকে নীচে একটি বুড়ি, একটি চাঙারিতে মুড়ি নিয়ে বসে আছে, এ-বর্ধমানের এই সীতাভোগ-মিহিদানা। কিনেছিলাম চার পয়সার, শেষ হয়ে গেছে। আমার বাঁয়ে বেঞ্চের ওপর বসে আছে বদন, জাতিতে ধীবর; একটি ধূলিধূসর পা (আমার দিকেরটাই) বেঞ্চের ওপর মুড়ে তোলা, একটা উবুড়-করা মাঝারি সাইজের ঝুড়ির ওপর। পরিচয় হয়েছে; বদনের বাড়ি বড়-জাউলে, সরারহাট স্টেশন থেকে চার ক্রোশ। ঝুড়িটা মাছের, বদন বলছে—"আর কন কেন, সেই কোন রাত তিনটেয় বেইরেছিলাম মাছ নে, গলদাচিংড়ি, উদিককোর ওটা নামী কিনা, ধাপার চিংড়ি ফেলে খেতে হবে—কালিঘাটের বাজারে ফোড়েকে ডিলিবারি দিয়ে আসচি।"

"রোজ আস?"

"আজ্ঞে না, একদিন অন্তর দে।"

"কত থাকে ফি খেপে—মোটা রকম বাঁচে কিছু?"

"থাকার কথা আর কইবেন না; তবে হ্যাঁ জিনিসটোর ডিম্যাণ্ড আচে। …ঐ শুনি, তা মেড়ো ফোড়ে ব্যাটারা আর আমাদের দেয় কোথায়?"

"তা বাঙালী ফোড়ের সঙ্গে ব্যবস্থা কর না কেন?"

একটা ঘরোয়া গাল দিয়ে বললে—"ও…রা আরও বেইমান। নিজের জাত কিনা…মাচিস্ আচে?"

ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী একত্র করে বাঁ হাতের মুঠোর ওপর ঘষলে। বললাম—"নেই, রাখি না।"

একটা বিড়ি দাঁতে চেপে ধরেছে, সেইভাবেই মুখটা ঘুরিয়ে চারিদিকে চাইলে,—কাকে ধরে? দুপুরের গাড়ির যাত্রীও কম, এখনও জোটেও নি সব। উঠে গেল।

কি রকম মনে হচ্ছে তোমার? রুচিতে আঘাত দিচ্ছি, না? কিন্তু আমার সে চমৎকার লাগছিল। তুমি ঐটুকুতেই ঘাবড়াচ্ছ?…আমি অরুচির ব্যাপারটুকু আরও রুচিকর করে নেবার চেষ্টা করলাম এর পাশে গতকাল আর পরশুকে এনে ফেলে, অর্থাৎ by contrast আজকের এই রুচিহীন দুপুরটিকে আরও ফুটিয়ে তুলে।··পরশু আমি আমার অফিসে, এখান থেকে তিনশ মাইল দূরে আমার ম্যানেজারির আসনে বসে আছি। দৈনিক ইংরাজী কাগজের ম্যানেজারি। কদিনের জন্যে কলকাতায় যাব, সবাইকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে, ডিউটি সম্বন্ধে তাগিদ করে দিতে হবে। অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজার বসে আছে টেবিলের পাশে, বাকি সব ডিপার্টমেণ্টের ইন্‌চার্জরা টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, প্রায় সবাই; রিভল্‌ভিং চেয়ারে নিজের অক্ষের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তাদের সঙ্গে কথা কইছি। পরিধানে স্যুট, নেকটাই, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, কথার ফাঁকে অ্যাশ-ট্রেতে ছাই ঝাড়ছি মাঝে মাঝে।

কাল ছিলাম 'প্রবাসী' অফিসে, ব্রজেনবাবু, শৈলেনবাবু, আরও সবাই; কবি অপূর্ববাবু এলেন। জমাট আড্ডা—সাহিত্য, রাজনীতি, খোশগল্পও—যার যে রকম পুঁজি বা যখন যেদিক ঢল নামছে। ব্রজেনবাবু রাঁচির অভিজ্ঞতা শুনিয়ে চলেছেন—কলকাতা থেকে আগত 'ড্যাম-চি' বাবুদের কথা; সস্তা বাজার দেখে দরদস্তুর না করে যা দেখছে তাই কিনে যাচ্ছে বাবুরা, যা বলছে সেই দরে!…"ডিম? ডজন কতয়?" "দু আনা।" "ওঃ, ড্যাম্ চীপ! দে তিন ডজন। তোর কপি?….তিন পয়সা? ড্যাম চীপ!" ভ্যাবাচাকা মেরে গেছে, ডিমের মতন তো ডজন-ডজন নেওয়া চলবে না!

স্থানীয় খদ্দের থৈ পায় না; দর গেছে অসম্ভব চড়ে, একটু নামাবার চেষ্টা করলে শোনে—"যা কেনে, তুদের সাধ্যি নয়, ড্যামচি বাবুরা লিবে ··"

—জমাট গল্পের মধ্যে মাঝে মাঝে হাসির হররা উঠছে।

আজ এই মাঝেরহাট স্টেশনে। খনখনে রোদ চারিদিকে ঠিকরে পড়ছে। ওপরে টিনের ছাত, সামনে প্যাসেঞ্জার গাড়িখানা নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সময় হলে এইটেই আমাদের নিয়ে যাবে। শকটশিল্পের মূর্তিমান প্রত্নতত্ত্ব। তা হোক, লাগছে ভালো। এই দুপুরে আজ আমায় বর্তমান থেকে বহু-দূরে নিয়ে গেছে, সে-দূরের বাসিন্দা হল বদনেরা। সে এক চির-অতীতের দেশ, মানুষ সেখানে কোন এক যুগে খানিকটা এগিয়ে সেই যে এক সময় থেমে গেছে, আজ পর্যন্ত থেমেই আছে। বদন যে এ-যুগের অতি-আধুনিক ডিজেল-ইঞ্জিন-চালিত আট চাকার বগি গাড়ীতে চড়ে আসন্ন স্বাধীনতার আলোচনা করতে করতে তার সেই স্বপ্নের দেশ থেকে যাওয়া-আসা করে না, পরন্তু এই চার চাকার বাক্সগুলিই তার বাহন—এই ব্যাপারটা আজকের এই দুপুরটির সঙ্গে যেন বড় মানানসই।

স্টেশন-প্রাঙ্গণের ও দিকেই বি এ আর-এর (এখন ই আই) বড় লাইন; কিকৃড়ি বের করতে করতে চলে গেছে ক্যানিং ডায়মণ্ডহারবার বজবজ। ওদের মাঝেরহাট খালের পুলটার ওদিকেই। একখানি গাড়ি বালিগঞ্জের দিক থেকে বিপুল গতিতে এসে বেরিয়ে গেল—তর্জনগর্জন, গতি, অঙ্গক্ষেপ সব তাতেই যেন বিদ্রূপ ঠাসা ফলতা লাইনের বেচারী এই প্রত্নতত্ত্বটিকে নিয়ে। ···আগেই বলেছি, গতি-শ্রুতি-দৃষ্টির মতো মনটাকেও একেবারে মুক্তি দিয়ে বেরুই, সে-বয়সের মত ইচ্ছে যা খুশি ভাবি, সেই জন্যে শৈশবের একটি অবুঝ আক্রোশ এসে গেছে মনে বড় গাড়ির এই অহংকেরে ঠাট্টায়। মনে মনে বললাম—"ঢের দেখেছি, বাপের ব্যাটা হোস তো আমাদের ওদিককার তুফান মেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবি।"

অর্থাৎ শৈশব হলে যা মুখ ফুটে বলতাম—হাঁক পেড়ে—সেটা যেন একলা পেয়ে কি করে আপনি এসে মনের দুয়ারে ধাক্কা দিলে।

কেমন যেন সব জড়িয়ে যাচ্ছে,—প্রেসের ম্যানেজার, সাহিত্যিক, বদনের বন্ধু; চুরুট নেভিকাটের সঙ্গে বিড়ি, প্রৌঢ়ের সঙ্গে শিশু, নিশ্চল অতীতের সঙ্গে শ্রান্তিহীন বর্তমান। কি করব, এই জট-পাকানো আবর্তই আমার

আনন্দ; এই নেশাতেই কাশ্মীর হল না, রামেশ্বরম্ হল না, আরও কত কী যে হল না, তার কি হিসেব রেখেছি?

বদন ধরানো বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে নিজের জায়গায় এসে বসল, এবার ছুটো পা-ই তুলে। গড়গড়ায় তাকিয়ার মতো বিড়ির পক্ষে এইটেই বোধ হয় রাজাসন, তোয়াজ জমে ভালো। একটু কি যেন ভাবলে, তারপর ফতুয়ার পকেটে হাতটা সাঁদ করিয়ে কতকটা কুণ্ঠিতভাবে একটা বিড়ি বের করে বললে—"ইচ্ছে করেন?"

চকিতে ম্যানেজারের গদি-আঁটা রিভলভিং চেয়ারটা মনে পড়ে গেল একবার, কিন্তু নিতান্ত ক্ষণিকের জন্য, কাটিয়ে উঠে বললাম,—'করি বৈকি, দাও, ভালো জিনিস?"

কিছু না বলে জ্বলন্ত বিড়িটা বাড়িয়ে দিলে, ভাবটা, আমার মুখ থেকেই উত্তরটা বেরুক না। ধরিয়ে নিয়ে ছুটো টান দিয়ে তার প্রত্যাশী দৃষ্টির দিকে চেয়ে বললাম—"নিন্দের নয় তো, বাঃ!"

কেমন একটা সাধ হচ্ছে জানাই, এ-ব্যাপারে আমি নিতান্ত আনাড়ি নই; অর্থাৎ মিশে যাওয়ার আর কিছু ব্যবধান রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে না; বললাম—"কি মার্কা?—মোহিনী, না, মোহন, না, দরবারী, না, রাজারাম?"

বদন একটু গোড়া থেকেই আরম্ভ করলে; প্রশ্ন করলে—"আপনারা?"

উত্তর করলাম—"ব্রাহ্মণ।"

"পাতঃপেন্নাম হই। এই এক বিঞ্চিতে বসে আচি, ইদিকে হাতে আগুন, মিথ্যে কইলে রনন্ত নরক—মদ নেই, তাড়ি নেই, গ্যাঁজা-চণ্ডু কিছু নেই, নেশার মধ্যে এই এক বিড়ি আর তামুক, তাও সে কদিচ-কখনও (একটু বাদ-সাদ দিলাম, বদন কামিনী-কাঞ্চনের নেশার কথাটাও তার নগ্ন মেঠো ভাষায় জুড়ে দিয়েছিল); তা এতে কেফায়েত করিনে মশাই। কি হবে ক'ন মহাপ্পেরাণীকে কষ্ট দিয়ে? সঙ্গে করে কিছু বেঁধে নিয়ে যেতে পারব?"

বিড়িটা নিভে গিয়েছিল, হাত বাড়াল। আমি নিজেরটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—"কে আর কবে পেরেচে?"

বিড়িটা ধরে এসেছে, কিন্তু হঠাৎ কি মনে হওয়ায় তাচ্ছিল্যভাবে বদন

সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে—বোধ হয় কেফায়েত না করার একটা সন্ত উদাহরণ হিসেবে। পকেট থেকে নতুন একটা বের করে ধরিয়ে আমারটা ফেরত দিয়ে গোটাকতক টান দিলে। তারপর বললে—"মার্কাও খেয়েছি এককালে, খাইনি বললে খেলাপ বলা হবে, এ-জিনিস খেয়ে মার্কায় এখন আর মন ওঠে না, আপনার গিয়ে যত বড় বড় নামকরা মার্কাই হক। এ আমার যা দেখছেন, একেবারে ইস্‌পিসেল ; আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"স্প্যাসালটা বুঝলাম না তো।"

"বড়জাউলি ঢুকতে প্রেথমেই আপনার পড়বে চণ্ডীতলার হাট—সোম, বেস্পতি আর শনি। সোম বাদ দিয়ে, বেস্পতি বাদ দিয়ে, শনিবারের যে হাট, তাইতে দেখবেন একধারে একখানি চট বিছিয়ে বুড়ো রমজান মিঁয়া বসে আচে। সামনে, বেশি নয়, মেরে কেটে এই পঁচিশ-তিরিশ বাণ্ডিল বিড়ি, পুরো এক হপ্তায় বুড়ো যা বাঁধতে পারে, নিজের হাতে। হাটে নিন না কত রকমের মার্কাওয়ালা বিড়ি নেবেন, উদিকে হাওয়াগাড়ি আচে, রামরাম আচে—সিগ্রেট, কিন্তু··"

পাশে খট করে আওয়াজ হল, টিকিটবাবু জানালা খুলেছেন। টিকিট নেবার পর বদনকে আর দেখতে পেলাম না ; খুঁজলামও না, আমার এই নিরুদ্দেশ যাত্রায় এও একটা বিশেষত্ব রেখেছি। এক-এক সময় যখন ইচ্ছে হয়, ছবি কিংবা কাহিনী একেবারে যতটুকু চোখে পড়ল বা কানে গেল, সেই-টুকুই করি গ্রহণ ; একেবারেই যখন মুক্ত রাখছি মনটাকে তখন সম্পূর্ণতার পেছনেও ছুটি না, সেও তো বাঁধন একটা। আর ওটা একটা আমাদের মনের রোগও—এই 'শেষকালে কি হল' খুঁজে বেড়ানো, একটা পূর্ণচ্ছেদ না বসিয়ে নিস্তার না পাওয়া। সৃষ্টিতে তো ওটা নিয়ম করে নেই, না সময়ের দিক দিয়ে, না স্থানের দিক দিয়ে। খণ্ডের মালা অখণ্ড স্থান আর কালের সূত্রে গেঁথে চলেছে—সেই খানিকটা সৌন্দর্যই তো মনকে রাখে মাতিয়ে। চলতি গাড়ি থেকে দেখা ছবির মতো ছবি আমি জন্মে দেখলাম না। এই অসমাপিকার সুরেই মনটাকে বেঁধে রাখতে চাই—শেষ খুঁজতে গিয়ে একটা নিয়ে পড়ে থাকতে গেলে একমেবাদ্বিতীয়মের মরুভূমিতেই যে দিন কেটে যাবে।

কিন্তু আবার বলি, এও তো একটা নিয়মই, শেষ খুঁজব না বলেই বা অশেষের পায়ে দস্তখত লিখে দিই কেন?...তাই এমনও হয়—পূর্ণতাকে না পাওয়ার যে অশান্তি, তাকে তৃপ্ত করবার জন্যে হয়ে উঠি ব্যস্ত এক-এক সময়, সেটুকু যার অভিজ্ঞতার আড়ালে পড়ে মনের রং দিয়ে সেটা পূর্ণ করে নিই।

কথাটা হচ্ছে জীবনে সবচেয়ে বড় মুক্তি খেয়ালের দাসত্ব করা, কেননা, খেয়ালের চেয়ে মুক্তি আর কিছুই নেই যে চরাচরে।

গাড়ি ছাড়ল। বিক্রম আছে, ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্পীড। অবশ্য স্পীডের একটা ফুটনোট আছে—গাড়ি যে সাঁসাঁ করে এগিয়ে যাচ্ছে তা নয়, শুধু ইঞ্জিনের প্রচণ্ড গর্জন আর গাড়ির উৎকট ঝাঁকানি; আড়ম্বর দেখলে মনে হয় এখন পঁচিশ-ত্রিশ মাইলের জন্যে হাত-পা গুটিয়ে বসা চলে।

একটা মোড়, তারপর গোটা দুই তিন ছোটখাট বাঁক, তারপরেই ঘোলসাহাপুর এসে পড়ল, আধ মাইলের কয়েক গজ বেশি। ইঞ্জিন হাঁপাচ্ছে, গাড়ির ক্যাঁচক্যাঁচানি থামতে চায় না।

দেখছি এইটেই এ লাইনের জামালপুর; একাধারে হাওড়া-জামালপুর বললেই ঠিক হয়। গোটা তিনেক বাড়তি ইঞ্জিন, একটা উঁচু জলের ট্যাঙ্ক, ওয়ার্কশপ। একটা ইঞ্জিনের চিকিৎসাও চলছে দেখলাম—অস্ত্রোপচার;—টেণ্ডার আলাদা, বয়লার আলাদা, চাকা আলাদা। জনচারেক লোক হাতুড়ি-সাঁড়াশি নিয়ে খুব ঠোকাঠুকি করছে, নীল নেকার-ব্রোকার-পরা ওরই মধ্যে ভারিক্কে গোছের একজন দেখলাম আমাদের গাড়ি পৌছুবার সঙ্গে সঙ্গে একটা খোলা চাকার ওপর একটা পা তুলে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকতে আরম্ভ করলে। মাঝে মাঝে ওদের কি নির্দেশ দিচ্ছে, মাঝে মাঝে আমাদের গাড়িটার দিকে চাইছে। সাধারণের মধ্যে নিজেকে বিশিষ্ট করে তোলবার আর্টটা দেখছি চমৎকার আয়ত্ত করা আছে লোকটার, মনে হতেই হবে, নেহাত লোকো সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট না হোক, ফোরম্যান তো না হয়ে যায় না। অথচ বোধ হয় আমাদের স্কুলের জোখন মড়রও হতে পারে।

জোখন ছিল আমাদের স্কুলের পিয়ন। কিন্তু এমন ঠাটবাট করে থাকত সে, ছেলেদের কাছে একটা রোয়াব তো ছিলই, বাইরের লোকেরাও অনেক

সময় মাস্টার বলে ভুল করে বসত। চেহারাটা নিন্দের ছিল না; স্কুলের আবহাওয়ায় থেকে গোটাকতক ইংরিজীর বুকনিও আয়ত্ত ছিল, তার ওপর হেড মাস্টারের পুরনো কোট, থার্ড মাস্টারের কামিজ, ড্রিলটিচারের হাফ-প্যাণ্ট, কারুর বা জুতো—এই রকম গোছের দু-তিন সেট সংগ্রহ করা ছিল, স্কুলের পালপার্বণে কোনটা—বা তেমন তেমন বুঝলে পুরো একটা সেটই পরে আসত। একবার ইনস্পেক্টারকে শেকহ্যাণ্ড করে নামিয়ে নিয়ে এল···আসতে দেরি হচ্ছে দেখে হেড মাস্টার ক্লাশগুলো ঠিক গোছগাছ কিনা একবার দেখে আসতে গিয়েছিলেন; জোখন মড়র ফটকের কাছে অপেক্ষা করছিল। ঠিক এই অবসরে ইনস্পেক্টারের মোটর এসে হাজির। হাতটা অবশ্য জোখন আগে বাড়ায়নি, তবে ইনস্পেক্টার বাড়ালে বেশ সহজভাবেই, বোধ হয় একটা ইংরিজী বুকনি দিয়েই তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়েছিল।···রহস্য ভেদ হলে ইনস্পেক্টার জোখনকে ডিসমিস করবার হুকুম দেন; হাতে ধরে নিয়ে এসেছিল, পায়ে ধরে সে যাত্রা রক্ষা পায়।

ঘোলসাহাপুর বেহালার স্টেশন। দুদিকে ঘর, মাঝখানটায় খোলা, একটা বারান্দা, টি-স্টল আছে, আরও দু-তিনটা দোকান আছে, প্যাসেঞ্জারের আমদানিও মন্দ নয়, কয়েকখানা গাড়ি-রিক্সাও থাকে বাইরে। এক কথায় বেহালা যে পরিমাণে কলকাতা, ফলতা লাইন যে পারিমাণে ই আই আর, ঘোলসাহাপুরও সেই পরিমাণে হাওড়া; বেহালা এখানে দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়ে নিচ্ছে?

সানুষ্ঠানে গাড়ি ছাড়ল; ঘণ্টি, হুইসিল, গার্ডের বাঁশি, গলা বাড়িয়ে ড্রাইভার গার্ডে মুখ-দেখাদেখি। স্টেশন না ছাড়তে ছাড়তে সেই স্পীড, অজক্ষেপ, ফলতা মেল তাঁর পঁচিশ মাইল রানের যাত্রা শুরু করলেন।···ভুল বুঝো না, ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল নয়, মাঝেরহাট থেকে ফলতা—এই পঁচিশ মাইলের দৌড়টুকু কিঞ্চিদধিক দু ঘণ্টায়।

হাত তিনচার পরেই দুধারে তারের বেড়া, তার পরেই ঘনবসতি—গ্রাম বা শহর যা-ই বলে বেহালা এখানে নিজের পরিচয় দেয়।

একটি ডোবা, ওদিকে দুটি বাড়ির দুইটি ঘাট খিড়কি থেকে এসেছে নেমে, আম-জাম-নারকেলের ঘন ছায়া বেয়ে। একটি ঘাটে জন পাঁচেক মেয়ে—সব বয়সের, বাসন মাজার দোলার মধ্যে থেমে গিয়ে গল্প হচ্ছে। গাড়ি এসে পড়তে একজন হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে মাথার কাপড়টা টেনে দিলে, একজন একটি কিশোরী বধূকে বললে টেনে দিতে। বধূটি নিজের ঘোমটা কিন্তু টানলে না, হয়তো বধূ নয়, ঝিউড়ি মেয়ে, গাড়ির কু-দৃষ্টিকে আমল দেয় না। অন্য ঘাটের মাথায় একটি ছোট মেয়ে, কোমরে ডুরে শাড়ি, আসন-পিঁড়ি হয়ে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে একটা বেড়াল-ছানাকে আদর করছে। মা (বোধ হয় মা-ই হবে) বাসনের গোছা নিয়ে উঠতে, নিজেও বেড়াল ঘাড়ে করে উঠল।···বাড়ির গায়ে বাড়ি—ছোট, বড়, মাঝারি; গাড়ির বেগে একটি আর একটিকে আড়াল করে ঘুরে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ঐ ছোট ছোট ছবিগুলোও। গাছে গাছে ছয়লাপ, মাঝেরহাট স্টেশনের সে রোদ সবুজের স্পর্শে যেন জাত হারিয়ে ফেলেছে—তাপসের তেজ যেন বনবালিকার হাতে গেছে নষ্ট হয়ে। সময় নিয়ে একটু সন্দেহ হতে হাত উল্টে দেখি, তিনটে দশ। পাশের লোকটি বড়ই উৎপেতে দেখছি; অপরাধের মধ্যে লড়াইয়ের পরিণাম সম্বন্ধে দু-একটা আলগা মন্তব্য করেছিলাম, সেই থেকে ও আমায় একজন প্রচ্ছন্ন চার্চিল, বা স্টেলিন ঠাউরে প্রশ্নে প্রশ্নে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।···"তাহলে আপনার মতে শেষ পর্যন্ত মিত্র-শক্তিকেই নাকে খত দিতে হবে?"

বানিয়ে বলছি না, 'নাকে খত'টা ওরই ভাষা, আমি নাকে খত দিলে যদি থামে তো না-হয় তাই দিই! সবুজের স্রোতে ছবির পর ছবি যাচ্ছে ভেসে, দৃষ্টি অপলক রেখেও দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায়, এর ওপর কানের কাছে এই উপদ্রব। বললাম—"তাই তো মনে হয়।"

—বেশ যে সন্তুষ্ট হয়ে বলছি না, গা-ঝাড়া দেবারই ইচ্ছে, এটা লুকুবার কোন চেষ্টাই করলাম না।

"কেন, এই তো রাশিয়া প্রায় বাপের নাম ভুলিয়ে দিলে, মিত্রশক্তিই তো?"

বেশ ইডিয়াম দিয়ে কথা বলতে পারে, তাইতে আরও যেন গায়ে বিষ ছড়িয়ে দেয়।

বললাম—"একটু ভেবে দেখলে নিজেই বুঝতে পারবেন।"

না ভেবেই বললে—"কৈ, ভেবে তো কূল পাচ্ছি না মশাই।"

"রাশিয়া নিজের শক্তির কথা টের পেলে আর এদের সঙ্গে থাকবে মিত্রতা ? ভেবে দেখুন না।"

চুপ করলে।

বঁড়শে-বেহালার খিড়কি দিয়ে চলছে গাড়ি।

পাকা আমটির মতো এক বুড়ো, ঘরের দরজা খুলে সামনের রকটিতে মাদুর পাতলে একটা, ওপরে জামরুল গাছ, থোবা থোবা মুক্ত ফলে রয়েছে। বৃদ্ধের সঙ্গে ফ্রক-পরা ফুটফুটে মেয়ে একটি, নিশ্চয় নাতনি ; পুকুরের ওপারে, তবু মনে হয় হাতে ওটা দাবার ছকই। নিদ্রাপর্ব শেষ হল, এবার ব্যসন-পর্ব, সখীরা জুটবে। মুখের পানে একবার চোখ তুলে চেয়ে নিয়ে নাতনি যেমন ঘটা করে ছক পেতে বসল, মনে হয় খেলা ততক্ষণ ওর সঙ্গেই চলবে। ···হাঁসের সার পুকুরের ধার বেয়ে উঠছে। ওপরের গুটিকতক হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ; একটা রোমন্থনরত গোরু, তার পিঠে একটা কাক—এই সামান্য একটা দৃশ্যের মধ্যে হাঁসের দল "কাকতালীয়" গোছের কোন ন্যায়-সূত্রের খুঁট ধরতে পেরেছে নাকি···এই জাতটার ওপর কেমন একটা শ্রদ্ধা আছে আমার—স্কুল বয়সে পঞ্চতন্ত্রে 'হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ' পড়া ইস্তক। ওরা যে জলের মধ্যে থেকে ক্রমাগত পাঁকই বেছে নিচ্ছে এতে আমার শ্রদ্ধা এতটুকুও পঙ্কিল হয়নি। তারপর মনুষ্যত্বের উৎকর্ষেরও একদিকে সার্টিফিকেট ওদেরই ছাপ,—পরমহংস ; শৌর্যের দিকটা যেমন সিংহ অধিকার করে বসেছে। এটা আমার চিরদিনই একটা রহস্য বলে মনে হয়েছে—ওরা যেমন জলের মধ্যে থেকে দুধ বেছে নেয় বলে, তেমনি সমস্ত পাখির মধ্যে থেকে ওদের বেছে নিয়ে কে এই মহা গৌরবের আসনে বসিয়েছে ? আর কেনই বা ? দিনকতক একটা সমাধান করে নিশ্চিন্ত ছিলাম যে এই সাধুবাদ বোধহয় ওরা নির্বিচারে ডিম দিয়ে যায় বলে—নিঃস্বার্থভাবে বুকে চেপে তা দিয়ে

বাঁধবার উপযোগী ক'রে। একেবারে ছেলেবেলাকার সমাধান, সে বয়সে মনকে যাহোক একটা উত্তর দিতে না পারলে ঘুম হত না। এ সমাধান অবশ্য বেশীদিন টিঁকল না, তারপর এখন পর্যন্ত কিছু পাইও নি।

শুধু তো এক রকম নয়, মরাল-গমন এদের নিয়েই ; একেবারে এরা না হোক, এদের জাতভাই তো ? তারপর সোনার ডিম প্রসব করতেও ওরাই ; মানুষ যেন ওদের পেয়ে বসেছে।

আর কি রকম মানুষের মতো দেখেছ ? একটা কিছু হোক, কাছে পিঠে যদি গোটাকতক হাঁস থাকে, কৌতূহল দৃষ্টি নিয়ে এসে দাড়াবেই ! আর একটু পাশ পাশ থেকে দেখো, ঠোঁটে একটা মুরুব্বিয়ানার হাসি লেগেই আছে অষ্টপ্রহর।

এইখানেই শেষ নয়। ত্রিলোকজয়ী,—জল স্থল আর আকাশকে, এমন করে, কে দখল করে বসতে পেরেছে ?

জাতটার থৈ পেলাম না।

সবুজের নিজের এলাকায় এসে পড়েছি। বাড়িঘর গেছে কমে, গাছ-পালার নিবিড়তা সেই পরিমাণে গেছে বেড়ে, এক এক জায়গায় এত লাইন-ঘেঁষা যে গাছপালাগুলো ছপ-ছপ করে গাড়ির গায়ে এসে পড়ছে, ফলতা-মেলের মানসম্ভ্রম আর থাকতে দিলে না এই অর্বাচীনের দল। আমরা সবুজের মধ্যে একেবারে গেছি ডুবে, গাছপালা ভেদ করে রোদের যে একটা আভা প্রবেশ করছে গাড়ির মধ্যে, সেটা খুব হালকা সবুজ রঙের, অনুভব করছি সেটা মনের মধ্যেও করছে প্রবেশ, সমস্তটুকুর সঙ্গে তপ্ত বনভূমির একটা মিশ্র গন্ধ মিশে গিয়ে যেন একটা নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে।

হ্যাঁ, নেশা জিনিসটাও সবুজই, স্বীকার কর তো ? সত্যই সবুজের এলাকায় আমরা।

"আসুন, সিগারেট খান তো ?"

সেই ভদ্রলোক ; বেঞ্চের পিঠে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, আবার উঠে পড়েছে। এ সব লোকের মরণ হয় না, তবু যদি একটানা খানিকক্ষণ ঘুমোয় তাহলেও লোকে বাঁচে, তাও নয়। বললাম—"আজ্ঞে না, অভ্যেস নেই।"

ও মাঝেরহাট স্টেশনে আমায় যদি বদনের হাত থেকে বিড়ি নিয়ে ফুঁকতেও দেখে থাকে তো এই উত্তর দিতাম। লোকটা এত বোঝে, শুধু এইটুকু কেন বুঝছে না যে আমি বিরক্তি হচ্ছি ?

"আমেরিকান মিলিটারি সিগারেট, এ মাল বাজারে পাবেন না ; এক বেটার সঙ্গে ভাব হয়েছে, মাঝে মাঝে দেয়, মিলিটারি সাপ্লাইয়ে কাজ করছি কিনা।"

এতগুলো কথার উত্তরে শুধু বললাম—"ও !"

"চলবে একটা ?"

দুধার একটু ফাঁকা হয়ে গিয়ে দৃশ্যপট গেছে বদলে, একটুকু যদি হারাই তো মনে হচ্ছে আপসোসের সীমা থাকবে না।

উত্তর করলাম—"বললাম তো অব্যেস নেই ; অব্যেস না থাকলে মোটর মার্কাই বা কি, আমেরিকান মিলিটারিই বা কি। বলুন না।"

--দেখি, বাড়িয়ে বললে যদি নিষ্কৃতি দেয়, কিন্তু কার বয়ে গেছে ?

"শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে জগন্নাথকে তো আর দিয়ে আসেন নি ···অব্যেস নাই-বা রইল।"

নিজের রসিকতায় হেসে উঠল, আমি একেবারেই যোগ না দিয়ে বললাম—"ও পাটই নেই।"

"তাহলে থাক। আমেরিকান বলেই যে সত্ত সত্ত হাতেখড়ি করতে হবে ···আর, একটা বদ্অব্যেসও মশাই, নিজের বদ্অব্যেস বলেই যে রেখেঢেকে বলতে হবে এমন তো নয়। · তবে ঐ একটি, তাও শুধু সিগারেট, তার ওপরে নয়।"

একটা আধ-শুকনো বেলগাছকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে কি একটা চেনা-চেনা লতা হলদে ফুলে বোঝাই হয়ে উঠেছে। হরগৌরী। কিন্তু একটু দুচোখ ভরে দেখতে দেবে তবে তো···

উত্তর করলাম—"নেশা বাদে অন্ত বদ্অব্যেসও তো থাকতে পারে মানুষের।"

"আমার কথা বলছেন ?"

একটু সামলে নিতে হল, তবুও হাতে রাখলাম খানিকটা। বললাম—"না, বিশেষ করে আপনার কথাই নয়, সাধারণভাবে মানুষের দুর্বলতার কথা বলছি, নিজেদের দোষ আমরা তো দেখতেই পাই না সব সময়, খুঁজে-পেতে দেখবার চেষ্টাও করি না।"

খোলা কেসের মধ্যে থেকে একটি সিগারেট বের করে নিয়ে অন্যমনস্ক-ভাবে ডালটা কয়েকবার খুট-খুট করে বন্ধ করলে, কয়েকবার খুললে; আমার কথাটা ভাবছে। একটু পরে কেসটা পকেটে রেখে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে এমন নির্লিপ্তভাবে টানতে লাগল, মনে হল নিরাশ হয়ে ওদিকটা ছেড়েই দিয়েছে। থাকে চুপ করে, ভালোই, নয়তো যেমন মাথামোটা দেখছি এবার মুখ খুললে সোজা ধমক দিয়েই চুপ করাতে হবে বোধ হয়।

'সখের বাজার' খানিকক্ষণ আগে ছাড়িয়ে এসেছি, গাড়ি এসে দাড়াল 'ঠাকুরপুকুর' স্টেশনে। সেই এক ছাঁদ; একদিকে ছোট একটি বুকিং অফিস, বাকিটা খালি, ওপরে টিনের চালা, তার মধ্যে দিয়েই বাইরে যাবার ব্যবস্থা। কাছে-পিঠে আর বাড়ি নেই, তাতে এইটুকুই যেন বেশী করে নজরে পড়ে।

স্টেশন থেকে বেরিয়েই একটি রাস্তা, তার দুদিকে নারকেল আর সুপুরির সারি, মাঝামাঝি একটা পুল। গাছগুলোর বেশি বয়স নয়, সবে মাথাঝাড়া দিয়ে উঠেছে। এই আগাছার জঙ্গলের মাঝখানে এইটুকু যেন অদ্ভুত একটা কৌতুক জাগায় মনে। স্টেশনে আসবার জন্যে এমন একটি বীথিপথ রচনা করেছে, কে সে শৌখিন মানুষ? এক সময় ছিল অবশ্য এই রকম প্রাচুর্যের অতি-শৌখিনী খেয়াল; প্রাচুর্য মানে প্রাণের প্রাচুর্য; খরচ করবার লোকে পথ পেত না, তাই পথে ঘাটেই খরচ করে হালকা হত। কিন্তু সে কি এই বিশ-পঁচিশ বছর আগেকার কথা?—নারকেল-সুপুরি গাছগুলোর বয়স দেখে বরং একটু বাড়িয়েই বলছি।·· কিন্তু মন যখন রোমান্স রচনা করবেই, তখন অত করে ইতিহাসের তারিখ ঘেঁটে বের করতে চায় না। রেলগাড়ি তখন স্বপ্নেরও অতীত। রাস্তাটা বেঁকে যেখানে ঘন গাছপালার মধ্যে গেছে মিলিয়ে সেইখানে—সেই সুদূর অতীতেই একটি সৌধ রচনা করলাম—ঠাকুর-পুকুরের ডাকসাইটে ঠাকুরদের জমিদারবাড়ি। কে তারা জানি না, ছিল

কি না কখনও তাও জানি না—তবে রাজধানীর পাশে তাদের এই নিজের রাজধানীতে তাদের ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ আর তাদেরই সাতমহল বাড়ির সিংদরজা থেকে এই পথ বেরিয়ে এদিক দিয়ে কোথায় গিয়েছিল চলে—হয়তো রুদ্রদেব ঠাকুরের (ধরে নিচ্ছি নামটা) প্রমোদভবনে। কিংবা রূপসায়রের ধারে বাণলিঙ্গ শিবের মন্দিরে (এ দুটোও ধরে নেওয়া নাম) যাওয়ার পথ—পুরাঙ্গনাদের জন্যে—সিংদরজা থেকে মোটেই বেরোয়নি—একেবারেই উল্টো দিকে অন্দরমহলের একটি সঙ্কীর্ণ দ্বার থেকে এসেছে চলে—ষোল বেয়ারার পাল্কি এসে লাগত, প্রতিদিনই বা ক্বচিৎ কখনও কোনও পর্বদিনে—আগে-পিছে পাইক-বরকন্দাজ—রাণীমা চলেছেন দেবার্চনায়—

সেসব আর কিছুই নেই, কিছুই ঘটে না আর। বনের মাঝখানে অতি যত্ন করে রচিত রাস্তার খানিকটা আছে পড়ে—তার একদিকের মহাল আর অন্যদিকের দীঘিদেউল গেছে মুছে—নারকেল-সুপুরির দোলাতে মনে হচ্ছে যেন একটা রোম্যান্সের গোটাকতক পাতা-ছেঁড়া বইয়ের মাঝখানে কি করে আছে আটকে—কোন্ অতীত বসন্ত দিনে রচা, আজকের এই নিদাঘ বায়ুতে ফর-ফর করে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

তুমি হাসছ নাকি?

তাহলে কোনও বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের দুপুরে আমার মতো এখানে এসে দাঁড়িও। চারিদিকের শ্যামলিমার ঠিক ওদিকে যে চোখঝলসানো রুপালী পর্দাটা দুলছে তার গায়ে এই রকম ছায়াচিত্র উঠবে জেগে—একদিন যা হয়েছিল বা হতে পারত। যা একেবারে প্রত্যক্ষ, নিতান্ত কাছের, নিতান্তই আজকের—এই স্টেশন, যাত্রা, রেল, সব কিছু দুপুরের দাহনে হয়ে গেছে মূর্ছিত, জেগে রয়েছে শুধু দুটিতে—তুমি আর অতীতের এমনি একটি ছবি। কিছু অসম্ভব বলে মনে হবে না; দুপুর রাতের গায়ে অশরীরীদের আবির্ভাব যেমন অসম্ভব বলে মনে হয় না। এদিক দিয়ে রাত দুপুরের সঙ্গে দিন দুপুরের একটা আত্মীয়তা আছে চমৎকার, বিশেষ করে খর গ্রীষ্মের দুপুরের সঙ্গে। খানিকটা সময় নিয়ে দিনটা পড়ে গেল নিঃসঙ্গ, নিরালা, মাঝ-রাতের মতোই অবয়বহীন, তখন তুমি যাই চাও না কেন, তাই দিয়ে দিব্যি করে তার শূন্যতাটুকু পূর্ণ করে দিতে পার।

হয়তো মিছেই বকে গেলাম খানিকটা—এ সমস্তটা নিতান্ত আমার ব্যক্তিগত ; আর সব সময় বাদ দিয়ে বৈশাখের দুপুরে ফলতার গাড়িতে চড়ে বেড়াবার শখ, বদনের অফার-করা রমজান মিয়ার 'ইসপিসেল' বিড়ির ওপর ভক্তি, আরও যা সব উদ্ভট ব্যাপার, যা হয়তো তোমাদের পরিচিত (?) এই জীবটিতেই সম্ভব, আর ভগবান যাদের এই ছাঁচে গড়ে ধরাতলে দিয়েছেন নামিয়ে।

ব্যক্তিগত আর একটা কথা তাহলে বলে দিই এইখানেই। কলকাতার দক্ষিণের সমস্ত জায়গাটাই আমার চোখে বড় রোম্যান্টিক বলে মনে হয়। কলকাতার উত্তরে যে-জায়গাটা, সেখানে কোম্পানি আর রাজা মিলে ইংরেজি আমল যেন চেপে বসে আছে—রাজশক্তির প্রত্যক্ষ তদারকের নিচে রোম্যান্স সেখানে বিকশিত হবারই অবকাশ পায়নি—বিশেষ করে গঙ্গার দুধারে—নদীবাহিত বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে বণিকরাজের দৃষ্টি সেখানে বরাবর ছিল সজাগ।...আমার একটা মত বা ধারণার কথা বলছি, একে তর্কের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে ডিসেক্‌শন করবার দরকার নেই। দোহাই তোমার, আজকের দিনের সবকিছুই তোমার ঐ তর্ক থেকে বাদ দাও—শাস্ত্রের তর্ক, সম্ভাবনার তর্ক, সামঞ্জস্য আর উচিতানুচিতের তর্ক নিয়ম আর সুসঙ্গতির বাইরে এক ধরনের out-law করে রাখো আমার এই একটি দিনকে।

আমার ধারণা, দক্ষিণ যেন এখনও একটা অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ড ; অলঙ্কারের সাহায্য নিয়ে একটা গ্রন্থই বলি, যার অর্ধেকটা সুন্দরবনের ঘন মসিলেপে চিরতরেই অবলুপ্ত হয়ে আছে।

মতে না মিললেও দক্ষিণে এসে বেড়িয়ে যেও মাঝে মাঝে। তবে আর কত দিনই বা? দক্ষিণও হয়ে উঠছে উত্তর—বেহালা গেছে, বঁড়শে গেছে, কলকাতা উপচে ঠাকুরপুকুরকেও করলে বুঝি গ্রাস।

"একটা কথা...কিন্তু আপনি আবার কিছু জিজ্ঞেস করলেই যা বিরক্ত হয়ে উঠছেন !"

—সেই ভদ্রলোকটি। বিরক্ত যে হচ্ছি, সেটা টের পেল এতক্ষণে। ভরসা হল একটু, বললাম—"বলুন।"

"বলছিলাম, কবি নয় তো?—মানে, বাইরের দিকে যেমন চুপ করে চেয়ে বসেছিলেন ..."

ভাবের ঘোরে ধরা পড়ে গিয়ে একটু অপ্রতিভভাবেই হেসে বললাম—"না···এটা কি কবিতা করবার সময়?"

"তাই তো ভাবছিলাম···একটুকরো মেঘও নেই কোনখানে যে ··দুটোর মধ্যে একটা তো দরকারই, কি বলেন?"

"দুটো কি?"

"হয় মেঘ, নয় কোকিল—সেই কালিদাসের আমল থেকে যা চলে আসছে··· ইস্তক আমাদের রবিঠাকুর পর্যন্ত।"

এর পরে আর কথা কইতে ইচ্ছে করে না, শুধু মুর্খতার বহর দেখে নয়, অসভ্যতার জন্যও। কিছু বলতে গেলেই খুব বেশি কড়া হয়ে পড়বে; চুপ করেই রইলাম।

ঠাকুরপুকুর থেকে বেরিয়ে খানিকটা এসে লাইনটা ডাইনে বেঁকেছে। ঝোপঝাড়ও এসেছে কমে। বাঁ দিকের একটা টানা মাঠের মাঝখানে খানিকটা দূরে একটা অদ্ভুত ধরনের বাড়ি; টানা দোতলা, কিন্তু নীচের তলাটা নেই, গোটা কতক খুঁটি ধরে রয়েছে ওপরটাকে। কাঠের বাড়ি বলেই মনে হয়। একেবারে মেঠো জায়গা, বাড়িটাতে লোকজন কেউ নেই, কাছে-পিঠে আর কোন বাড়িও নেই; এর আবার কি ইতিহাস, কে জানে। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলে বোধ হয় টের পাওয়া যায় কিছু, এই পথে যাওয়া-আসা আছে, জানতে পারে। কিন্তু প্রবৃত্তি হয় না, নিজে ওপর-পড়া হয়ে যা বলছে, তাই বরদাস্ত করা শক্ত, কিছু জিগ্যেস করতে গেলে তো আরও মাথায় উঠে বসবে। বাঁকের মুখে আড়ালেও পড়ে গেল বাড়িটা···আমার কৌতূহলী কল্পনা ওর শূন্য গহ্বরে কি যেন খোঁজাখুঁজি করছে,—কারা ছিল এমন আজগুবি জায়গায়, আজগুবি বাড়িতে? কি কাজ নিয়ে? গেল কোথায়?

ডাইনে বনের মধ্যে থেকে খানিকটা লাইন বেরিয়ে এসে এই লাইনটাতে মিলেছে। হয়তো আগে এইটেই ছিল রাস্তা, ডায়মণ্ডহারবার রোডের ধারে ধারে, এখন যেমন এইখান থেকে হল আরম্ভ।

হ্যাঁ, এইবার বাঁ দিকে একটু ঘুরে গাড়িটা উঠে পড়ল ডায়মণ্ডহারবার রোডের ওপর। কিনারায় আমাদের লাইনটা পাতা, ডান দিকেই পিচঢালা সড়ক, এখানটা নাকের সোজা চলে গেছে একেবারে। মাল-বোঝাই গাড়ি, মানুষ-বোঝাই বাস, গলা পিচের ওপর দিয়ে চর চর শব্দ করতে করতে বেরিয়ে যাচ্ছে—কোন্ মায়ার প্রদীপ জ্বালতেই যেন একটা শতাব্দী ডিঙিয়ে কোথায় পড়লাম এসে—বিংশ শতাব্দীর একেবারে মধ্যাহ্নে—১৯৩৫—কলকাতার সভ্যতাক্লিষ্ট তপ্ত নিশ্বাসের শব্দ যায় শোনা এখান থেকে। মাঝখানে ঐটুকু যে কি করে এখনও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সবুজ স্বপ্ন দেখছে, বুঝে উঠতে পারা যায় না—ঐ ঘোলসাহাপুর থেকে ঠাকুরপুকুর তাও সমস্তটা নয়—উনবিংশ শতাব্দীর 'আদি অকৃত্রিম' রেলপথ সদর বেহালা আর বঁড়শে থেকে আত্মগোপন করে যেখান দিয়ে সন্তর্পণে এসেছে বেরিয়ে।

পরিবেশটা গেছে একেবারে বদলে। আগাছার নামমাত্র আর নেই। রাস্তা, তারপরেই দুদিকে টানা মাঠ, সেটা শেষ হয়েছে গিয়ে একেবারে গ্রামের কোলে। অনেক দূরে দূরে বাড়িঘর ক্বচিৎ পড়ে চোখে; গাছপালার একটা নীল রেখা, নিশ্চল, শুধু নারিকেল গাছের মাথাগুলো একটু একটু দুলছে। রেখাটা যেখানে যেখানে এগিয়ে এসেছে, গাছগুলোও একটু স্পষ্ট, সেখানে দু-একখানা বাড়ি চোখে পড়ে। কৃষকপল্লীর প্রান্ত, পোয়াল গাদা, দুএকখানা গরুরগাড়ি মাথা নীচু করে আছে দাঁড়িয়ে, ধরিত্রীকে প্রণাম করার ভঙ্গিতে, পাশেই ঘরের উঁচু দাওয়ার ওপর গোলপাতার চাল এসেছে নেমে, কোনটায় আবার রাঙা রানীগঞ্জের টালি, কালো মেয়েদের মাঝখানে হঠাৎ একটি যেন টুকটুকে।···পুকুরের পাশ দিয়ে একটা রাস্তার রেখা, নির্জন, যেখানটায় গাছের ছায়া পড়েনি, দুপুরের রোদে চিকচিক করছে।··চক্রবালের নীল রেখাটা আবার দূরে সরে গেল।

ডায়মণ্ডহারবার রোডটা আমার বড় প্রিয়; কয়েকবার বলে থাকব তোমায়। ওর আলোচনা উঠলে (আমিই তোলার পথ খুঁজতে থাকি তেমন শ্রোতা পেলে) আমি একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি। পাহাড়ের কথা বাদ দিলে, টানা সমতলভূমির ওপর এমন চমৎকার রাস্তা আমি আর মাত্র

একটি দেখছি,—রাজগীরের রাস্তা, যেখান থেকে সেটা বক্তিয়ারপুর পেরিয়ে ই আই আর-এর লাইন টপকে দক্ষিণমুখো হল। অবশ্য দুটোর সৌন্দর্য দুধরনের, ওটাতে আছে একটা এপিক গ্র্যান্‌জার (পরিভাষা সমিতি কি বলেন দেখো), আর ডায়মণ্ডহারবার রোডে আছে একটা লিরিক বিউটি। এ দুটির আবার নিজের ঋতু আছে। রাজগীর রোডের খোলতাই হয় ভরা বর্ষায়। দুদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশি—যতদূর দৃষ্টি যায়, একেবারেই আকাশের কোল পর্যন্ত। পুন্‌পুন্‌ নদী পাহাড় থেকে বয়ে এসেছে, গঙ্গার সঙ্গে মাঝে মাঝে হয়েছে ভেট-মোলাকাত, গতির উল্লাস গেছে বেড়ে। টানা হাওয়ায় বড় বড় ঢেউ, ফেনায় চুরমার হয়ে রাস্তার গোড়ায় পড়ছে আছড়ে; রাজগীর রোড নিঃশঙ্কভাবে মাথা তুলে গেছে সোজা এগিয়ে, পাশ দিয়েই এই রকম লাইনের একটি পাড়—বিহার-বক্তিয়ারপুর লাইট রেলওয়ের, মাঝে মাঝে দীর্ঘ শাঁকো, পুন্‌পুনের সঙ্গে আপোস, রাস্তা না ছেড়ে দিলে সে প্রলয় ঘটাবে, ছোট্ট নদী বলেই তার মর্যাদাবোধ আরও বেশী; আর তার না গঙ্গার সঙ্গে কুটুম্বিতা!

ডায়মণ্ডহারবার রোডের রূপ খোলে শরতে। মাঝখানটিতে পিচের কালো রেখাটুকু, পুরু দূর্বাঘাসের চাপ দুদিক থেকে ঠেলে এসেছে, এতটুকু খালি জায়গা নজরে পড়ে না। তদারকের কড়া দৃষ্টি সত্ত্বেও মাঝে মাঝে দুএকটা অজানা লতাগুল্ম, (বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় নাম বলতে পারতেন)—কোনটায় সবুজ ফুলের গুচ্ছ, ট্যাপারির মতো ঢাকনা-দেওয়া ফল, কোনটায় বা রঙীন ফুল। এর পরে রাস্তার গোড়া থেকে গ্রামের সেই নীল রেখা পর্যন্ত ধান, ধান, আর ধান। সমস্তর ওপর শরতের আকাশ ঝলমল করছে। মন্থর সাদা মেঘের স্তূপ, শুধুই সবুজ, আর নীলের একঘেয়েমিটা নষ্ট করবার জন্যে শিল্পী ঐ শাদার ছোপছাপগুলো মাঝে মাঝে দিয়েছে বসিয়ে। তৃপ্ত পরিপূর্ণতার এমন চোখ জুড়ানো রূপ আমি আর কোথাও দেখিনি।

রাজগীর রোড যেন পৌরুষে সমুজ্জ্বল—সিধা, সমুন্নত, একক, কতকটা রুক্ষই; ডায়মণ্ডহারবার রোডের সু-বঙ্কিম ঠাম, অঙ্গে জড়ানো সবুজ শাড়ি, তার সঙ্গে সচল পরিপূর্ণ জীবনের কত দিকই যে রেখেছে জড়িয়ে তার যেন

হিসাব হয় না। সে যেন সত্যিই একটি নারী, স্মিতাননা, কল্যাণময়ী। পুরুষের মতো একক নয়, বহুকে আশ্রয় দিয়েই তার পূর্ণতা।

রাজগীর রোড যদি হয় একটি চৌতালের ধ্রুপদ তো ডায়মণ্ডহারবার রোডকে বলতে হয় মনোহরসাহী কীর্তন।

'নীলাঙ্গুরীয়'টা পড়েছ? মীরা আর শৈলেন যেদিন সবচেয়ে কাছাকাছি হয়েছিল সেদিন তাদের এনে বসিয়েছিলাম এই ডায়মণ্ডহারবার রোডের পাশে খানিকটা সবুজ ঘাসের ওপর—দুটি পরিপূর্ণ চিত্ত আর চারদিকের এই পরিপূর্ণতা—সময়টা ছিল সন্ধ্যা, সূর্যাস্ত হয়ে গিয়ে চাঁদ আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ওটার সিনেমা-রূপ তুমি দেখোনি নিশ্চয়, তোমার পুণ্যের জোর আছে, বেঁচে গেছ। ওরা সেই মিলনটুকু ঘটিয়েছে একটা ডোবার ধারে, নারিকেল-গুঁড়ির ঘাটের রানার ওপর বসিয়ে। বোধ হয় এই ত্রুটিটুকুর সংশোধন হিসেবেই একেবারে শেষে দুজনের হাতে মালা জড়িয়ে দিয়ে ভেবেছে শেষরক্ষা হল। হায় শৈলেন-মীরা, হায় আর্ট, হায় সিনেমা!

ওটা বোধ হয় আমার কুষ্ঠী-ঠিকুজী-গত ব্যাপার একটা, ভগবান বেছে বেছে একজন বেরসিককে আমার সঙ্গে গেঁথে দেবেনই। ওপরে ঐ উদাহরণ দিলাম একটা। নিমন্ত্রণে গেলে প্রায়ই আমার পাশে এমন একটি লোক আসন নিয়ে বসে, যার ভয়ে পরিবেশকরা সেদিকটাই মাড়াতে চায় না পারতপক্ষে, মাড়ালেও এমন নিঃসম্বল হয়ে ওঠে যে তাদের কিছু ফরমাস করতে পারা যায় না, করলেও কিছু ফলের আশা থাকে না। সিনেমা থিয়েটারে গেলে যে-লোকটা সবচেয়ে কম বোঝে, সে না-জানি কি করে আমার পাশটিতে, পেছনে বা সামনে জায়গা পেয়ে যায়, থাকেও প্রায় সদলবলে। একবার হিন্দী মেঘদূত দেখতে গিয়ে একদল গাড়োয়ালী সেপাইয়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম মনে আছে। কখনও ভুলব না। তুমি এটা জান কিনা বলতে পারি না—মৃত্যুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে জীবন কাটাতে হয় বলে এরকম জাতিগতভাবেই সেপাইরা স্বভাবতই বড় স্ফূর্তিপ্রবণ হয়ে থাকে—কতকটা সবচেয়ে মারাত্মক জিনিসটা কণ্ঠস্থ করে

নিয়ে সদাতুষ্ট নীলকণ্ঠ হয়ে থাকার মতো…ওদের ধারণা ওরা একটা হাসির 'খেল' দেখতে এসেছে। কি করে হয়েছিল জানি না, তবে আমার ডান পাশে যেটি বসেছিল, আমায় একবার বললে—"বাবুজী, এর যেখানে যেখানে হাসি আমাদের একটু বলে বলে দেবেন কি ?"

অদ্ভুত প্রশ্নের একটা উত্তর জোগাতেই দেরি হল একটু, তারপর বললাম —"সে কি সর্দারজী, এই খেলটার তো আগাগোড়াই…"

ঠিক এই সময় আরম্ভ হয়ে গেল সিনেমা…এবং তারপরেই আমার শেষ কথাটা একেবারে চাপা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই হাসি। সর্দারজী শুধু একবার হাসির মধ্যে সবাইকে জানিয়ে দিল এর আগাগোড়াই হাসি, তারপর সেই যে আরম্ভ হল, শেষ হবার আগে থেমেছিল কিনা, আমার জানা নেই, কেননা আমি নিজেই শেষ পর্যন্ত থাকতে পারিনি।…জিগ্যেস করবে, থামিয়ে দিলে না কেন, উঠিয়েই বা দিলে না কেন। ওঠাবার কথাই আসে না। সেটা আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, বিলাতী আর আমেরিকান সেপাইরা দুএকটা সিনেমায় মদ খেয়ে হুজ্জুতও করেছে। তবু থামাবার চেষ্টা হয়েছিল। গোড়াতেই যখন ডজন দুয়েক লড়াইয়ে মুক্তকণ্ঠে হাসিটা ওঠে, একটা আপত্তির রবও উঠেছিল—"থামো, থামো !…থামুন !….খামোশ !….বত্তি বত্তি বার দেও !!" বত্তি কিন্তু যখন বারা হল, ঘর একেবারে ঠাণ্ডা— হাসির উৎস-মুখগুলির দিকে চেয়ে কারুর আর হেম্মত হল না যে, দাঁড়িয়ে উঠে মনের ভাবটা ব্যক্ত করে। আমি তিনটা প্রচেষ্টা পর্যন্ত দেখেছিলাম— প্রায় মিনিট পনের। তৃতীয়বারে ম্যানেজার দাঁড়িয়ে দলটির দিকে চেয়ে হাতজোড় করে "খামোশীকে সাথ" দেখবার অনুরোধ করলে।—লোকটা ছিল থলথলে মোটা, নিতান্ত দৈবাৎই, তার ওপর প্রথম শ্রেণীর দূরত্ব থেকে তার হাত-পা নাড়া ছাড়া বিশেষ কিছু বোঝাও যাচ্ছিল না; এটা হাসির 'খেলের' একটা নবতর অভিব্যক্তি ভেবে প্রচণ্ডতর হাসিটা উঠল, আমি আর আশা না দেখে তার মধ্যেই উঠে আসি।

কুষ্ঠী-ঠিকুজীর কথা কেন বলছি ? একবার নিতান্তই গল্পপ্রসঙ্গে আমার এই সব দুর্ভাগ্যের কথাটা বলি পাঁচ-সাতজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে। তার মধ্যে

ঠিক বান্ধবের স্তরে না পড়লেও একজন আমার শুভানুধ্যায়ী এদেশী পণ্ডিত ছিলেন। তিনিই বলেন—ওটা হয়, আর তার খণ্ডনও আছে শাস্ত্রে—এতখানি ওজনের লোহার বাসন, তিল, রাই-সর্ষপ, মাষকলাই (সব বিশেষ ওজনে) প্রভৃতি দান করতে হয় অমাবস্যায়, মন্ত্রানুষ্ঠানও আছে। কতকটা ভূত ছাড়ানো আর কতকটা রাহুমুক্ত হবার মতো বিধান।

অতটা বিশ্বাস করা শক্ত, নিশ্চয় উচিতও নয় এযুগে, তাই কান দিইনি। এবার ভাবছি অমাবস্যার অন্ধকারে, একদিন এ যুগকে লুকিয়ে ওটা সেরেই নোব।

আবার সেই লোকটি। টের পেয়েছি, কবারই সিগারেট টানার ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে ঘুরে দেখছে; একটু হেসে বললে—"একটা কিছু আছে, 'না' বললে শুনবে কে? একবার নোটবুকটাও বের করতে যাচ্ছিলেন। না কবি তো লেখক তো নিশ্চয়।"

হাসিও পায়। বোধ হয় তাই থেকেই আমার রাগটা পড়ে গিয়ে একটু দুষ্টুমির কথা মনে পড়ে গেল; কতকটা সেই 'সিংহির মামা ভোম্বলদাস'-এর গল্পের মতো—অনেকগুলো বাঘ মেরেছে আর একটা হলেই পুরো হয়, তারই জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে জঙ্গলে।

চতুর একটু হাসি নিয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে, আমি হেসেই উত্তর দিলাম—"না, এবার আর সত্যিই লুকোন গেল না। আছে একটু একটু বাতিক; কিন্তু আপনি টের পেলেন কি করে?"

"ঐ যে বললাম, নোট বইটা বের করতে যাচ্ছিলেন, তার ওপর ছমছমে ভাব।...এসব জিনিস নজরকে এড়িয়ে যেতে পারে না মশাই। শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলেই টের পাওয়া যায়"—

—হাসিটা আর একটু স্পষ্ট করলে।

বললাম—"গোঁফ মুড়িয়েও যখন নিষ্কৃতি নেই, তখন মেনে নেওয়াই ভালো। আছে বাতিক একটু, তবে কবিতা নয় মশাই। তিথিটা তৃতীয়া, তাই আকাশের চাঁদটা ঐরকম তেরছা হয়ে উঠেছে; কথাটা সোজা না বলে যদি আমায় বলতে হয় আকাশ-সমুদ্রে একটা রুপোর নৌকো যাচ্ছে তো তাতে আমি রাজী নই।"

"উচিতও নয় রাজী হওয়া। না এটা সমুদ্র, না ওটা নৌকো। অথচ সেই আমিই আবার ছেলেকে বলছি—'সদা সত্য কথা বলিবে।'...নিন্, একটা ধরান।"

নিলাম একটা অ্যামেরিকান সিগারেট, যেন এ-সম্বন্ধে আগে কোন কথাই হয়নি। ধরিয়ে বললাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ, যে কলম দিয়ে ঐসব মিথ্যের ডাই লিখছেন, সেই কলম দিয়েই আবার তার 'সত্যবাদিতা'র এসে (Essay) দিচ্ছেন করেক্ট্ (correct) করে। সে-ছেলে যুধিষ্ঠির হয়ে দাঁড়াবে এটা তো আশা করতে পারেন না? দেশ উচ্ছন্নও যাচ্ছে।"

"যাবেই, বৃথা চেষ্টা।...কিন্তু...একটা কথা রেখে কথা বলব? এসে করেক্ট (Eassy correct) করবার কথায় মনে পড়ে গেল—একটি ভালো মাস্টার সন্ধানে আছে?"

আমার সেই ভোম্বলদাসের ফন্দীতে বাধা পড়ে যাচ্ছে, যেমন এক কথা থেকে অন্য কথায় গিয়ে পড়ছে লোকটা; তবু প্রশ্ন করলাম—"কোন্ ক্লাসের ছাত্র?"

"নাইন্থ্ ক্লাসের, আমার ছেলেই। আছে মাস্টার একজন, কিন্তু তাকে আর রাখা চলবে না।"

হাতের সিগারেটটা একবার কষে টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেললে বাইরে, মাস্টারকে রাখা চলবে না এটা জোরালো করবার জন্যই বোধ হয়, কেননা বেশি পোড়েনি সেটা তখনও।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মুখের পানে চাইলাম।

"আজ্ঞে না, চলবে না রাখা। বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি, কানে গেল ছেলেটাকে শেখাচ্ছে—রিউম্যাটিজ্ম (Rheumatism) মানে রোমন্থন। বুঝুন, একটাতে পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে থাকা, আর একটাতে ক্রমাগতই চোয়াল নাড়ছে!...বেরুচ্ছি, তখন আর কিছু বললাম না, মনে মনে ঠিক করলাম—'দাঁড়াও, এসেই তোমায় বিল্বপত্র শোঁকাচ্ছি, বাড়ি গিয়ে যত খুশি রিউম্যাটিজ্ম করোগে বসে বসে।'...আর আণ্ডার ম্যাট্রিক রাখব না, কান মলেছি। আই-এ হলেই ভালো, অন্তত ম্যাট্রিক; খাওয়া, থাকা কুড়ি থেকে পঁচিশ টাকা মাইনে। পান তো এই ঠিকানা আমার, পাঠিয়ে দেবেন।"

মিলিটারি কণ্ট্র্যাক্টারের ছাপানো কার্ড বের করে আমার হাতে দিলে।

"হ্যাঁ, কবিতার দিক মাড়ান না বলছিলেন, তাহলে?"

"এই গল্প, উপন্যাস···"

"কিন্তু আবার তো সেই মিথ্যেই এসে পড়ল ঘুরে?"

"ঠিক চাঁদকে নৌকো বলার মতন নয়তো। তারপরেও যে মিথ্যেটুকু ছিল, তাও কেটে এসেছে ক্রমে ক্রমে—আজকাল আবার রিয়েলিজ্‌মের (Realism) দিকে ঝোঁক কিনা পাঠকদের, আমাদেরও তাই জোগাতে হচ্ছে।"

"শুনি বটে। আদার ব্যাপারী, বুঝি না অত ব্যাপারখানা কি। Real হয় আসল; Ism আজকাল গার্ডের গাড়ির মতন—গুড্‌স্‌, এক্সপ্রেস, পার্সেল, প্যাসেঞ্জার—সবতেই দিচ্ছে জুড়ে···"

এবার বেশ আস্তে আস্তে এসে গেছি, আবার নতুন ফিকড়ি না বের করে বসে। বললাম—"ঠিকই ধরেছেন Real হল আসল, বাস্তব, Ism-টা হল যাকে বলে বাদ। বাস্তববাদ, মানে দেখো আর লেখো।"

"বুঝেছি; আর মাথা ঘামাবার দরকার রইল না; আসান্‌ করে এনেছে বলুন না এক কথায়।"

একটু চুপ করে থেকে কুণ্ঠিতভাবে চোখ তুলে হাসলাম, বললাম—"হয়েছে কি আসান? একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন। এই আমার কথাই ধরুন না—কোথায় ইলেক্‌ট্রিক পাখার নীচে বসে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকলেই চলে যেত—একরকম বলতে গেলে আকাশ থেকে উপন্যাস দুয়ে নেওয়া—তার জায়গায় দুপুর রোদ্দুরে ছেলেধরার মতন ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে—পকেটে নোট বুক নিয়ে··"

"মানে?" রহস্যভরে হেসেই জিগ্যেস করলে।

"ঐ Realism, খসড়া একরকম ঠিক; আর সব চরিত্র পেয়ে গেছি, শুধু একটা ধরা দিতে চাইছে না। ঠিক ভিড়ের মধ্যে যখন তখন তো পাবার নয়, তাই এই দুপুর রোদ্দুর মাথায় করে শহরের বাইরে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে। নিগ্রহ নয়?"

"একশ বার। তা কি রকম লোক এখন দরকার আপনার? লোক চরিয়ে খাচ্ছি, বোধ হয় দিতেও পারি সন্ধান।"

"এই ধরুন, কাজ থাক আর না থাক, আপনার ঘাড়ে পড়ে একথা সেকথা তুলে উদ্বাস্ত করে মারবে আপনাকে—আর সব-জান্তা...."

—স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে, মুখটা হয়ে গেছে ফ্যাকাশে, একটু হাসবার চেষ্টা করে শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করলে—"তাই নোট নিয়ে রাখছেন?"

"চেহারা, প্রত্যেকটি কথা, অবশ্য যতদূর সম্ভব। মানে Realistic হওয়া চাই তো। সমালোচকদের তো চেনেন না। আজকালকার পাঠকও তেমনি—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে—যদি ভূমিকায় জানিয়ে দিতে পারেন অমুক চরিত্রটাকে অমুক ঠিকানায় দেখেছি তো আরও ভালো, একশ মার্ক পেয়ে গেলেন।"

"পেয়েছেন দেখা?" মুখটা একেবারেই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম উঠেছে জমে।

স্টেশন এসে যেতে লোকজনের ওঠা-নামায় যে একটা বিরতি হল, তাইতে আমাদের আলাপ গেল একটু থেমে। গাড়িটা এখানে একটু থামবে, ওদিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। দেরি হচ্ছে দেখে একটু উঠে গিয়ে, প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিকে মুখ বাড়িয়ে দেখি, অনেক দূরে ইঞ্জিনের ধোঁয়ার রেখা দেখা যাচ্ছে। সরে এসে নিজের জায়গায় বসতে যাব, দেখি সে-লোকটি নেই।

গাড়িটা আসতে দেরি করছে; হয়তো মালগাড়ি। এসব কথা ভুলে, নিতান্ত গাড়ির গরমের জন্যেই নেমে গিয়ে স্টেশনে চালাটুকুর মধ্যে দাঁড়ালাম একটু। ট্রেনটা এসে যেতে আবার গাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছি, হঠাৎ নজর পড়ল ইঞ্জিনের পরের গাড়িটার মধ্যে একেবারে ও-কোণে একটি লোক তীব্র ঔৎসুক্যে আর আতঙ্কে আমার পানে একটু ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে আছে। গাড়িতে একটু অন্ধকার ছিল, কিন্তু চিনতে দেরি হল না। তারপর কখন কোন্ স্টেশনে নেমে গেছে খোঁজ রাখিনি।

এক ধরনের আত্ম-আবিষ্কার হল সেদিন,—আমরাও তাহলে একেবারে নিরস্ত্র নই!

আপদ কেটে গেলে আমার নজর গিয়ে পড়ল স্টেশনের গায়ে স্টেশনের নামটার ওপর—'পৈলান'। নজরটা যেন আটকেই পড়ল। অদ্ভুত নামটা, কিন্তু বেশ মিষ্টি, কেমন যেন এদিককার সুরটা লেগে রয়েছে গায়ে। নামের ব্যাপারে দেখেছি, এক এক সময় ব্যাকরণ অভিধান দেখে রাখা হয়েছে, ওতরায় নি, অথচ এমনি হ্যালাফেলা করে রাখা গোটাকতক অক্ষরের নিবর্থক সমন্বয় হঠাৎ কেমন সার্থক হয়ে উঠেছে। আমি প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেলেছি পৈলানকে। অবশ্য ভালোবাসার মতো তার কোনও অবয়ব নেই। গ্রাম তো নয়ই, ছোট্ট একটি স্টেশন, আর গুনেগেঁথে গুটি পাঁচ-ছয় ছাড়া-ছাড়া ঘর, তার পরেই চারিদিকে মাঠ। তা কেউ নামেই মজে, কেউ কুন্তলে, কেউ গঠনে, কেউ নয়নে; আমি মজেছি নামটিতে। আর কিছু না পারি অন্তত একটা গল্পেই, পৈলান নামটাকে আমার লেখার মধ্যে ধরে রাখব। কি করব?—কবিতা তো আসে না, ঐ হবে আমার ভালোবাসার ট্রিবিউট।

ইঞ্জিনের কি একটা দোষ হয়ে আরও একটু দেরি হয়ে গেল; রোদ পড়ে এসেছে একটু। ডায়মণ্ডহারবার রোডে ওঠবার পর থেকেই রাস্তার দুধারের দৃশ্যে আরও একটা পরিবর্তন এসে পড়েছে। মাঝে মাঝে বেশ খানিকটা করে জায়গা নিয়ে এক একটা বাগান, মাঝখানে একটা পুকুর, জায়গা হিসেবে ছোট, বড় বা মাঝারি গোছের, চারিদিকে ছোট ছোট সুপুরি আর নারকেল গাছ, এই সবে ফলন আরম্ভ হয়েছে, নতুন বয়স, তার সঙ্গে নতুন মাটির রসটানা, বেশ নধরকান্তি, সুপুষ্ট; কলার ঝাড়ও আছে, কিছু কিছু ফুলও। বাগানের মাঝখানে একটা করে বাড়ি, কোঠা বা রানীগঞ্জ টালির। এক একটি ছবির মতন; মুক্ত, প্রশস্ত জায়গার মধ্যে বলে আরও মানিয়েছে। একখানি ওরই মধ্যে বেশ আভিজাত্যসম্পন্ন, নামে পর্যন্ত একটা রুচি আর আভিজাত্যের ছাপ আছে—'চিরন্তনী'। আগেই এসেছি ছাড়িয়ে।

কিন্তু ভাবছি—কি 'চিরন্তনী'।—এই অবিরাম চলার পথে মানুষের একটু নীড় বাঁধার ইচ্ছাটুকু? ধরে নেওয়া যাক, তাই; কিন্তু তাও কত মধুর, কত

তরুণ,—দুর্বার গতির কাছে দুর্বল স্থিতির এই দুটি ব্যাকুল চোখ তুলে চেয়ে থাকা…

রেল চলেছে ছুটে। রেল নয়তো যেন রেল-রেল খেলা। সেই জন্যেই লাগছে আরও ভালো—ছোটার সময় বোধ হয় যেন ইচ্ছেমতো নেমে পড়া যায়, এ স্টেশনের ছোট ঘর থেকে ও স্টেশনের ছোট্ট ঘরটি যায় দেখা। 'ভাসা' এসে পড়ল, বোধ হয় মাইল দুয়েকও নয়। বেশ মিষ্টি নয় এ নামটাও?

মাঝে মাঝে রাস্তার একেবারে ধারে গ্রামও এসে পড়েছে এক-একটা, একটির পাশ দিয়েই চলেছি। রাস্তার পাশেই খাল, তার ওদিকেই জেলেদের ঘরই বেশি মনে হল; গায়ে গায়ে বাড়ি, এর উঠানের মাঝখান দিয়ে, ওর ঘরের পিছন দিয়ে রাস্তা; বড় রাস্তার সঙ্গে সংযোগ কোথাও একটা পাকা পুলের ওপর দিয়ে, কোথাও বা শুধু বাঁশ—গোটা দুই বাঁশের চ্যারা মাঝখানে, তার ওপর গোটা দুই-তিন বাঁশ লম্বালম্বি করে ফেলা, ধরে যাবে তার জন্যে খানিকটা উঁচুতে লম্বালম্বি আর একখানা বাঁশ; বাবা আদমের যুগের জিনিস। বেশি নয়, এর মাইল দশ বারোর মধ্যেই হাওড়ার পুল, আধুনিক পূর্তশিল্পের জয়জয়কার।…তা বলে যেন ভেবো না বাঁশের চ্যাড়াপুলের বংশলোপ চাইছি আমি; আহা ওরাও থাক্, যেমন সবটা কলকাতা না হয়ে গিয়ে ভাসা-পৈলানও থাক বেঁচে। বংশবৃদ্ধিও হোক। আসল কথা, ছোটয়-বড়য় কল্যাণ; শুধু রাঘব-বোয়ালের রাজত্বটা রামরাজত্ব নয়।

সমস্ত গ্রামখানি নিবিড় ছায়ায় ঢাকা। রোদের তাপে যেন ঝিমিয়ে রয়েছে, হন্দ ঘরের আড়ালে দুটো বলদের অলস রোমন্থন, দুটি নগ্ন শিশুর খেলাঘর পাতা; একটি চাষা-বৌয়ের হেঁসেল তুলতে দেরী হয়েছে, বাসনপত্র মেজে এই পাট সারা হল। বাসনের গোছা হাতে নিয়ে আধ-ঘোমটা টেনে নারকেল গুঁড়ির পৈঠায় ঘুরে দাঁড়িয়েছে।…এরা দেখছি এখনও নথ পরে! আমার ভয় ছিল আধুনিকতা বুঝি জিনিসটাকে একেবারেই দেশছাড়া করে দিয়েছে। তবে আর কতদিনই বা? ওরই পাশকরা ছেলের বৌ বোধ হয় শাশুড়ির সেকেলেপনা দেখে ন্যাড়া নাক সিঁটকুবে; একেবারেই ন্যাড়া নাক, আর তো নাকছাবিও তুলে দিলে দেখছি। যাক, After me the Deluge;

আমি তো আর দেখতে আসছি না। এর পর এরা আধুনিক বলে নাকটাকেই চেঁচে ফেলে মুখ থেকে তো ফেলুক। কার কি বয়ে গেছে?

না নিতান্ত যে ঝিমিয়েই রয়েছে গ্রামটা তাই বা কি করে বলি?—পার্লামেণ্ট ইন সেশন্! অবশ্য তাও শুনেছি ঝিমোবারই ব্যাপার, এ কিন্তু তা নয়। গোটা দুই বড় বড় কি গাছ মিলে ঘন ছায়ায় একখানি কম্বল দিয়েছে বিছিয়ে, গ্রামপঞ্চায়েতের বৈঠক চলেছে তারই ওপর বসে। হাত নাড়ানাড়ি যেমন প্রায় হাতাহাতিতে দাঁড়াবার গোত্র দেখছি, তাতে মনে হয় আলোচ্য বিষয়টি খুবই গুরুতর। দল থেকে একটু দূরে এখানে ওখানে উপদল, কোথাও দুই, কোথাও তিন, কোথাও হুঁকো আছে, কোথাও নেই; লবি টক্ (Lobby talk) বোধ হয়। ওরা মাথা ফাটাফাটি করে মরুক, ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত যা হবার তা হয়ে যাচ্ছে এইখানে গোপন পরামর্শে।

ভাসার পর ইঞ্জিনটাও চলেছে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। আমার আপত্তি নেই, সময় পেয়ে দেখতে পাচ্ছি ওরই মধ্যে একটু গুছিয়ে।

একেবারেই সরে একটা ডোবার ধারে একটি যুবা বসে আছে, সাবান দিয়ে কাচা ফরসা কাপড়, গায়ে একটা নীল কামিজ, পায়ে কালো বার্নিশ জুতো, বোধ হয় সস্তা রবারের, যা বাজারের ফুটপাথে দেখা যায়। বসে আছে মাথা হেঁট করে। মাঝে মাঝে জমায়েতটার পানে ঘুরে চাইছে হেঁট মুখেই।

ওর এই একান্তিক একটা যেন কাহিনীর আভাস এনে দিয়ে অস্বস্তি জাগিয়েছে মনে। আজকের অধিবেশন যে ওকে নিয়েই, তা বেশ বোঝা যায়, কিন্তু কথাটা কি···বেশ দেখতে দেখতে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম আস্তে আস্তে, মাঝখানে তুমি এসেই যে গোলমাল বাধালে হে লবকান্ত; এই আধ-খ্যাঁচড়া গল্প নিয়ে আধ-কপালে ধরতে আমার আর কতক্ষণ?

গাড়িটা একটু এগুতেই পট-পরিবর্তন, একটি যেন রিভলভিং স্টেজই (Revolving stage) গেল ঘুরে। খানকতক বড় বড় ধানের মরাই আর একটা আলোকলতায় বোঝাই কৃষ্ণচূড়া গাছের আড়ালে সমস্তটা ঢাকা গেল পড়ে—হাতা-হাতি, লবিটা, মায় সেই লবকান্তটি পর্যন্ত; প্রায়, শুধু তার জুতোপরা পায়ের খানিকটা খানিকটা যাচ্ছে দেখা। মরাইয়ের এদিকে সম্পূর্ণ অন্য দৃশ্য। দশ

বারজন মেয়ে, নানা বয়সের উলঙ্গ শিশু থেকে লোলচর্ম বুড়ি পর্যন্ত, মাঝখানে ষোল-সতের বছরের একটি মেয়ে মাটি কামড়ে পড়ে বুকের কাপড়টা চেপে ধরে মাথা চালছে—না—না—না···কি একটা জিনিস কোনমতেই করতে রাজি নয়।

বোঝাচ্ছে পাঁচ-সাতজন, অবাক হয়ে চেয়ে আছে পাঁচ-সাতজন। জন তিনেক একটু আলাদা হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাথা দোলাচ্ছে, একজনের গালে তর্জনীটি টেপা···খুবই জটিল আর দুর্ভাবনার কথা। "হ্যাগো, কালে কালে এ হল কি !···"

আমি কিন্তু বাঁচলাম, আধ-কপালের ভাবটা কেটে গেছে। আমার কাহিনী পুরো হয়ে উঠেছে।

ছুড়কো মেয়ে। শ্বশুরবাড়ি থাকতে চায় না।···না—না, কোনমতেই ফিরে যেতে রাজি নয় সে।

আমার কাহিনীর ডায়লগ্ গড়ে উঠেছে বেশ। ঐ যে বুড়ি, মাথায় শনের নুড়ি পিঠে হাত বুলুচ্ছে—

"নে দিদি, ওঠ, নিতে যখন এয়েচে, আর কি ? মান খুইয়ে মান ভাঙাতে এয়েচে, হল তো ?

"না আমি যাবুনি—যাবুনি আমি, ও ড্যাকরা আমায় মারে··"

"ছেরকালই কি মারবে গো ? ··ছেলেপিলে হবে, ঐ মানুষই আবার সমিহ করতে শিখবে যা হয়, যা হয়ে আসচে ছেরকালটা···আমরা খাই নি মার ? তোর মা মার খায়নি তোর বাপের হাতে ?···জিগুগে যা····"

—অন্য একজন বলে।

আর একজন মেয়ে জোগান দেয়—"বিয়ে-করা মাগ, অথচ দু-ঘা খেতে হয় নি বরের হাতে এমন অনাছিষ্টি হয় নি পিরথিমিতে এখনও····তুই যেগে, নে ওঠ্।"

"আমি যাবুনি, বলুন আমায়,—আমি মাকে ছেড়ে থাকতে পারবুনি গো পারবুনি।"

"যাবি নি! অমন বর, পড়ে থাকবে? এখন আদিখ্যেতার মাথা কোটা, তখন মাথাকোটা কাকে বলে দেখবি!"

"এই আমিই চললুম দখল করে নিতে। তুই তবে থাকগে আমার বুড়োকে নিয়ে....গেরামও ছাড়তে হবে নি, ঘরও ছাড়তে হবে নি। হুড়কো মেয়ে কি হয় না?—হয়—তা বাপের কালে তোর মতন হুড়কো দেখলুম নি বাছা!...উৎপরিঙ্কে!"

সত্যি কি আমার মুখের কথাই বললে নাকি বুড়ি? যেমন মেয়েটার পিঠে একটা ধাক্কা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বসল।

শেষে যা দেখলাম—অনেক দূর থেকে—মেয়েটি বুকে কাপড় চেপে উঠে পড়েছে। হয়তো ক্লান্তি, একটু দম নিয়ে আবার পড়বে কামড়ে। আমার কাহিনী কিন্তু ঐখানেই শেষ করে দিলাম। যাবে বৈকি, যাবে।...বেশ ছেলেটি, গোলগাল, বউ নিয়ে যেতে ভালো করে চুল ছাঁটিয়ে তেল-চুকচুকে হয়ে এসেছে। আজ বিকেলেই কিংবা কাল, বউয়ের তাত রোদের তাতের মতো যখন বেশ পড়ে এসেছে—চাকা ডুবতে ডুবতে যাতে বাড়ি পৌঁছে যাওয়া যায় এই রকম আন্দাজ করে বেরুবে দুটিতে।...এই গ্রাম থেকে নেমে ঐ মাঠ, চওড়া আলের ওপর দিয়ে রাস্তা, কোন রকমে দুজনে যাওয়া যায় পাশাপাশি। চলছে দুটিতে, ছেলেটা আগে, বউ পেছনে...ছেলেটা হন হন করে চলেছে বলে মেয়েটা পড়ছে পেছিয়ে...কি মতলবখানা—আবার পালাবে নাকি? দাঁড়িয়ে পড়ল ছেলেটা।...বার দুয়েক এ রকম হবার পর দুজনে পাশাপাশি হয়ে গেল। তখন অনেকটা দূর। দূর বলেই তো হয়েছে পাশাপাশি, মেয়েটা একবার ঘুরে দেখলে, এত তাড়াতাড়ি যে ভাব হয়ে গেল এরা কেউ দেখছে নাকি?

আমার গল্পটি ফুরাল।

রেলে আর রাস্তায় হাত ধরাধরি করে চলেছে। অদ্ভুত লাগছে। রেল জিনিসটা বরাবরই আভিজাত্য-গর্বিত, খানিকটা উঁচু, অনেকটা আলাদা, খানাখন্দর, আগাছার জঙ্গল, তারের বেড়া এই সব দিয়ে আর সব কিছু থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে চলে নিঃসঙ্গ, নিরালা; নিষ্ঠুরও; ওর সঙ্গে মিতালি

করতে গেলে কখন কী যে ঘটাবে কেউ বলতে পারে না। রাস্তা যদি কোন একটা এসেই পড়ল পাশে তো, একটি স-সম্ভ্রম দূরত্ব রক্ষা করে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে চলে, একটা গুমটির মুখে যদি নেহাত গা-ঠেকাঠেকি হয়ে গেল একবার তো তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে আবার নিজের সাবেক দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়ায়।...প্রচণ্ড বেগে মেল যাচ্ছে বেরিয়ে, ধূলি-ঝঞ্ঝার ভৎর্সনা তুলে, দুদিকে লোহার গেট চেপে মূক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আছে যত সব পথচারী—বাস, লরি, মোটর সাইকেল, গোরুর গাড়ি; পদচারী ও ছাগলের পাল, রাখালের দল।

এখানে সেই সড়ক যেন শোধ নিচ্ছে। এক-এক করে গোটা তিন লরি পেছন থেকে এসে আমাদের ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল, হাত-চারেকের তফাত রেখেই—গরম পিচের সঙ্গে নরম চাকার সঙ্ঘর্ষে একটা কর্কশ ব্যঙ্গের মতো শব্দ উঠেছে। একটায় ইটের গাদা, তার ওপর জনতিনেক পশ্চিমা কুলি বসে কানে হাত দিয়ে গান ধরেছে (ওরা এ অবস্থাতেও পারে), সুদূরস্থিত কোনও 'দুলারিয়া'র উদ্দেশে, যে সঙ্কোচবশেই দয়িতের সঙ্গে পা ফেলে চলে আসতে পারলে না বলে ঘরের কোণেই রইল পড়ে।...কার কবেকার দুলারিয়া জানি না, তবে আপাতত গানটা যে আমার ফলতা-মেলকেই উদ্দেশ করে তাতে ওরা সন্দেহের কোন অবকাশই রাখে না। ·অনেকখানি বেরিয়ে গেল ওরা, ইঞ্জিনের কাছে গিয়ে খানিকটা ঝুঁকে গানটাকে আরও জোর করে দিয়ে তিনটে হাত দিলে বাড়িয়ে— 'দুলারিয়া গে! দুলারিয়া!—দুলারিয়া—দুলারিয়া!!...''

বোধহয় আবক্ষ-শ্মশ্রু ড্রাইভার রহমৎ শেখই। পোড়া কপাল বেচারির!

দুটো বাসও গেল বেরিয়ে। একটা সাইকেলও চেষ্টা করলে; অবশ্য এতটা কি হয়? এখনও চন্দ্রসূর্য আকাশে উঠছে।....কিন্তু আমি বলছি ওর অশ্রদ্ধার বহরটার কথা। একটা বিচালির গাড়ির গাড়োয়ান পর্যন্ত বলদের লেজ মলে কি মন্ত্র ঝেড়ে দিলে।....অ্যাঙ যায় ব্যাঙ যায়, খলসে-পুঁটিরও কি একটু সাধ হতে নেই?

ফলতা-মেল যাই মনে করে করুক আমার কিন্তু লাগছে বড় ভালো—দুটি দ্রুত স্রোতে জীবনের ওই গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে বয়ে যাওয়া—পরস্পরকে সঙ্গ-দান করে, তা যতই হোক না কেন হাসি-বিদ্রূপ, জয়-পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে।

এক নম্বর হল্ট। স্টেশন-ঘর বলে কিছু নেই; পাশে হাট বসেছে, তারই খাতিরে গাড়িটা একটু বেশি করে দাঁড়িয়ে রইল।

নিজের খেয়াল নিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে হাটের কেনাবেচা দেখছি, হঠাৎ একটা সোরগোলে সচকিত হয়ে উঠলাম।

আমার পাশেই যে কামরাটা, দুখানা বেঞ্চ নিয়ে, তাইতে একটি ছোট পরিবার উঠেছে; কর্তা একজন প্রৌঢ়, বৃদ্ধ বললেও ভুল হয় না। রোগাই, একটু কুঁজো, মাথার চুলগুলি পেকে এসেছে, গায়ের রংটা বেশ মাজা, একটু লালচে।

আরও লালচে হয়ে উঠেছে রেগে টং হয়ে রয়েছেন বলে। সঙ্গে যে একটি মহিলা রয়েছেন, তাঁকে স্ত্রী বলেই মনে হল, তবে যেন দ্বিতীয় পক্ষের; আধাঘোমটা দেওয়া পাড়াগেঁয়ে গিন্নিবান্নি গোছের মানুষটি; মুখটি ভার ভার; রা নেই তাতে। একটি তের-চৌদ্দ বছরের মেয়ে, আর একটি বছর দশেকের ছেলে; দুটিই ফুটফুটে, বিশেষ করে এ সব পাড়াগাঁ অঞ্চলে অমন একটি মেয়ে চোখে না পড়বারই কথা।

কর্তা যে একটা বকুনি মুখে করে উঠেছেন তারই জের টেনে বলছেন—"আমি বলিনি তখুনি যে খরচ করে, মেহনত করে যাওয়াই সার হচ্ছে, ঠিক ঐখেনে এসে আটকাবে; ফলল কি ফলল না? সে বনহাটীর বাচস্পতিদের বংশ, আজ ইংরিজী ঢুকেছে বলে শাস্ত্র জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার মেয়ের চেহারা দেখেই সে হামড়ে পড়বে এ তো হয় না। অপদস্তই হতে হল তো? আর সেটা হল তোমার কথা শুনে ছুটে গেলাম বলেই তো?··· স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, সে কি আর সাধ করে বলেছে? বলেছে অনেক দেখে-শুনে, অনেক ভেবেচিন্তে, এই রকম অনেক ঘা খেয়ে।"

গৃহিণী নিরুত্তর, যেন এ ধরনের ব্যাপার সয়ে সয়ে ঘাটা পড়ে গেছে। চেহারায় কথায় মেয়েটির চোখদুটি অবাধ্যভাবেই কয়েকটি মুখের ওপর গিয়ে পড়ল, রেঙে উঠল বেচারি। কর্তা বলেই চলেছেন—"বিয়ে আর হতে হবে না, থুবড়ি হয়েই থাকবে, এই লিখে রাখো, বলে দিচ্ছি। আর যাতা একটা ঠিকুজী গড়ে আমি তঞ্চকতা করতে যাব, এই যদি তোমার বিশ্বাস থাকে মনে তো তোমার বিশ্বাস নিয়ে তুমি থাকো। আমার ঠিক লগ্নটি

চাই একেবারে ঘণ্টা মিনিট পল অনুপল বিপল ধরে—মনে করে দিতে পার, সঙ্গে সঙ্গে তোয়ের করে দিচ্ছি ঠিকুজী, না পার, থাক্, রইল তোমার মেয়ে। একটু সময়ের এদিক ওদিক হলে কী আকাশ-পাতাল তফাত হয়ে যায় জান? শেষকালে ভুল ঠিকুজী খাড়া করে একটা অঘটন ঘটাই আর কি!"

"কেউ সাধছে?"

—এতক্ষণ পরে এইটুকু মন্তব্য। কর্তা একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

"সাধছে না কেউ! কেন সাধতে যাবে? গরজটা আর কারুর নয়তো তাই এই ঘাড়ে করে করে টাঙিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি—কে দয়া করে নেবে গো আমার মেয়ে, কে দয়া করে নেবে? গরজ যদি থাকত কারুর তো একটা হিসেব রাখত! এ রকম বেহিসেবীপনা করে আবার মুখনাড়া দিতে তোমরা মেয়েরাই পার! কই, আমি যার যার বেলায় ছিলাম, এ রকমটি হয় নি তো।...'কেউ সাধছে?'—আটকাল না মুখে কথাটা! কেউ সাধে নি, কিন্তু ভোগান্তিটাও কেউ যে কমাবে সে মুরোদ নেই তো!"...

অনেকটা বুঝতে পারছি, এ ধরনের পারিবারিক আলোচনার মধ্যে বসে থাকা দুষ্কর হয়ে উঠছে উত্তরোত্তর, কিন্তু উপায় নেই বলেই সয়েও আসছে দেখছি। তবু এরই মধ্যে আরও একটু নির্লিপ্তভাব নিয়ে ভালো করে ঘুরে হাটে মনোনিবেশ করতে যাব আবার, এমন সময় একটা সুরাহা হল।

আগেকার মতোই আচম্বিতে আমাদের গাড়িরই পেছন থেকে একটা বাজখেঁয়ে গলা উঠল—"রাঙা দিদি যে গো!...শুনন্থ ভেয়ের বাড়ি গেছলে, বাচপোতদের ঘরে মেয়ে দেখাতে, তা হল পছন্দ তেনাদের?"

ঘুরে দেখি গাড়ির একেবারে শেষ কামরায় কখন জনপাঁচেক নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক উঠে পড়েছে। যার গলা, তার চেহারা দেখেও সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফেরানো গেল না। যেমন লম্বা তেমনি আড়ে, তবে ঢিলেঢালা নয়, বেশ আঁটোসাঁটো; মাথায় কদমছাট কাঁচাপাকা চুল; তুলসী কাঠির দুছড়া কণ্ঠিমালা গলায় এঁটে রয়েছে, এদিকে প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গে ওদিকেও

আরম্ভ করে দিয়েছে একদফা দুটি যে পুরুষযাত্রী বসে রয়েছে তাদের সঙ্গে—"তোমাদের এবার উদিক পানে গিয়ে বসলেই হয় না, হ্যাঁগা···কাকে যেন বলচি !···"

উত্তর হল—"কেন, দোষটা কি হয়েচে ? জায়গা তো কম নেই।"

ছোট ছোট পুঁটুলিগুলো ঠিক করে রাখছিল, দুটো কোমরে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল—

"অ ! ··রস ! তাই তো গা, পাঁচটি মেয়েলোক একত্তর হয়েচে, একটু লবনারী হয়ে মাঝখানটিতে বসব না ?—তাতে দোষটা হয়েচে কি এমন !··· না, না, উঠতে হবে না, ঐ রকম লটবর হয়ে থাক বসে—দু নয়ান ভরে দেখি একটু···ওকি, পোঁটলা নিয়ে উঠলে যে, ও শ্যামরায় !···"

ততক্ষণে দুজনে বেঞ্চ টপকে এদিকে এসে মুখ ঘুরিয়ে বসেছে।

গিন্নি বললেন—"পালবউ যাচ্ছে, আমি যাই ওদিকে গিয়ে বসিগে; অ তুই যাবি—তো আয়।"

মেয়েটি তো নিষ্কৃতি পায় তাহলে। দুজনে নেমে আবার ও-কামরায় বসার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিলে। ছেলেটি রইল বাপের সঙ্গে।

কর্তা একটু কলহপ্রিয়, অন্তত বকারোগ আছেই, একলা পড়ে গিয়ে একটু যেন অস্বস্তির মধ্যে চুপ করে রইলেন, তারপর ঘুরে গলা তুলে বললেন—"পালবউ যে ! চলেছ কমনে সবাইকে নিয়ে ?····কি যেন মেয়ে দেখাতে নিয়ে যাবার কথা জিগ্যেস করছিলে। তা গিয়ে বসেছে তো ঘেঁষে, দেখ না কি উত্তরটা পাও।"

পালবউ গিন্নির মুখের পানে চাইতে তিনি মাথাটা নেড়ে অস্ফুট কণ্ঠেই জানালেন—হল না।

কর্তা এদিক থেকে বললেন—"ঐ নাও, শুনলে তো ?—এক কাঁড়ি টাকা রাহা খরচ, সব মেহনত—জলে। এখন একবার জিগ্যেস কর না। হল না-টা কিসের জন্যে। ওঁর মুখেই শোন, আমি বললেই তো গায়ে বিষ ছড়াবে, মুখ বুজেই থাকতে চাই।"

ওদিকে নিম্নকণ্ঠে কি একটু কথা হল, গাড়ি ফুল স্পীডে, ঝরঝরানির

মধ্যে শুনতে পাওয়া গেল না। তারপর পালবউ সবাইকে ডিঙিয়ে সেই সাবেক গলায় প্রশ্ন করলে—"বলি হ্যাঁ চাটুজ্যেমশাই, একি শুনি আজগুবি কথা,—নাকি মেয়ে খুব চোখে নেগেছিল, স্থদু ঠিকুজীর জন্তে সব ভেস্তে গেল!"

"কথাটা আজগুবি?"—কর্তার গলা গাড়ির আওয়াজ ছাপিয়ে পৌছুল ওদিকে।

"নেও! তাহ্‌লে আর আজগুবি কাকে বলে?···বলি লোকে যে সংসার-ধম্মো করবে, তা ঠিকুজীর সঙ্গে না মানুষটার সঙ্গে?···এই যে সোনার চাঁদের মতন মেয়ে, এই কাত্তিকের মতন ছেলে—বলি, এসব তোমার ঠিকুজী দিয়েচে, না এই লক্ষ্মী-প্রিতিমে?"

আমি বেশ ভালো করে ঘুরে বসলাম, পালবউয়ের কথা একটাও বাদ গেলে আফসোসের অন্ত থাকবে না। তর্কটা নবদ্বীপের ন্যায়ের টোলে নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আপাতত চুপ করিয়ে দিয়েছে কর্তাকে। অবশ্য যেমন দেখছি, কথাবার্তায় কিছু পর্দা থাকবে না। তা না থাক, যেখানকার যা রীত, আমিই বা কেন কানে ঘোমটা দিয়ে বসে থাকি? আর অতি-পর্দাটা কি একটা রোগ নয়?—অতি-সভ্যতার একটা ন্যাকামি নয়?

থাবা খেয়ে কর্তা একটু অপ্রতিভও হয়ে পড়েছেন, আমার দিকে চেয়ে নিম্নকণ্ঠে বললেন—"মেয়েছেলের সঙ্গে তর্ক···নিন, কি করে বুঝ্‌বেন, বোঝান।"

অবশ্য চুপ করেই রইলেন না, উত্তরটাতে একটু দেরি হল, এই যা—

"তা বলে ঠিকুজী চাইবে না? এ যে নতুন ধরনের কথা বলছ তুমি। আবার অতবড় পণ্ডিতের বংশ।"

"তা ভালোই তো, পণ্ডিতের বংশ তো গড়ে নিক ঠিকুজী। কলুর বাড়িতেও তেল পেড়ে দিয়ে এসতে হবে?"

গিন্নির ঠোঁট দুটি ব্যঙ্গের হাসিতে কুঁচকে উঠেছে, লজ্জার মধ্যে মেয়েটিও ফিক করে হেসে মুখটা ফিরিয়ে নিলে।

কর্তা আমায় সাক্ষী মানলেন—"দেখলেন তো?"

দুবার সাক্ষী মানলে একটা লোক, কতকটা সে জন্যেও, আবার কতকটা

তর্কটুকু চালু রাখবার জন্যেও, আমি মুখটা আড়াল করে নিয়ে চাপা গলায় বললাম—"তেল পেড়ে না হয় নিলে, কিন্তু সরষে জুগিয়ে দিতে হবে তো? সেইখানেই যে হয়েছে গলদ, জিগ্যেস কর না। সন্তান যে জন্মাল একটা তিথিক্ষণের হিসেব রাখবে তবে তো?"

গিন্নি পালবউকে নিম্নকণ্ঠে কি বললেন, পালবউ বললে—"কেন তার হিসেব তো রয়েছে, রাঙা দিদি বললে ঐ।"

"শুধু সন আর তারিখ—তাতে ঠিকুজী হয়? একে ঘড়ি ধরে কটার সময় হল—কত মিনিট, কত সেকেণ্ড তা না ধরে দিলে ঠিকুজী করা চলে?—এক পল কি অনুপলের এদিক ওদিক হলে যে আসমান-জমিন তফাত হয়ে যাবে গণনায়। ফিস ফিস করে তো পাশে বসে জোগান দিচ্ছে, জিগ্যেস কর তো, তার একটা হিসেব রেখেছে?"

পালবউ হাঁ করে শুনছিল, যেন এমন উদ্ভট কথা সে বাপের জন্মে শোনে নি; শেষ হলে গালে আঙুলের চারটে ডগা চেপে বললে—"হ্যাগা, চাটুজ্যে-মশাই, আপনি বলতে পারলে কথাটা?—লোকে বলে গব্ভযন্ত্রণা, একটা পুনর্জ্জন্ম, জগৎ তার কাছে তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, কোন রকম করে খালাস হলে বাঁচে, আর সে কিনা চৌধুরীদের নতুন বউয়ের মতন কব্জিতে ঘড়ি বেঁধে হিসেব করবে কটা বেজে ক মিনিট হল···আবার বলচ কত পল, কত হ্যাঁকো, কত ঢ্যাঁকো···"

কানে তোমার নিশ্চয় লাগছে একটু। আমার কিন্তু একেবারেই লাগে নি। সমস্তই তো আপেক্ষিক, ষোল আনাই নির্ভর করে কি পরিবেশের মধ্যে কথাটা পড়ল বা ঘটনাটা ঘটল। তুমি চিঠিটা পড়ছ হয়তো তোমার বৈঠকখানায় বসে, সভ্যতা আর সুরুচির নিদর্শন মেঝে থেকে নিয়ে ছাত পর্যন্ত, দেওয়ালে একটা বিলিতী নগ্ন চিত্র থাকলেও তা আর্টের রক্ষাকবচে আঁটা। এ হেন জায়গায় বসে নীরবে পড়ে গেলেও তোমার কানে লাগবে। অথচ শুনেও আমার কানে এতটুকু লাগে নি—শোনাও কেমন, না, একেবারে সাক্ষাৎ, শোনাকথা, শোনা নয়; একেবারে শ্রীমুখ থেকে নির্গত; 'হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস্' নয় যে একটা আড়াল আছে, স্বয়ং হিজ্ মাস্টার। শুধু কি

তাই? যাকে উপলক্ষ্য করে বলা সেও হাত কয়েকের মধ্যে, খান কয়েক খর্ব বেঞ্চে এতটুকুও আড়াল সৃষ্টি করতে পারে নি।...ঐ একটি মানুষই মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছিল—যদিও ওকালতিটা লেগেছিল নিশ্চয় খুবই মিষ্টি—বাকি সবাই নির্বিকার—যেন এতবড় সোজা আর ঘরোয়া কথা আর হয় না, পালবউ যা বললে, তা যেন একটা নিত্যদিনের সমস্যার চরম মীমাংসা। ...এ বেদ-সূক্তের ছন্দ বদলানো চলবে না, আর শুদ্ধ সংস্কৃত নয় বলে যদি এর ভাষা সংস্কার করতে যাও, তো সমস্ত জিনিসটুকুর মর্যাদাই করা হবে নষ্ট।

গাড়ি এসে উদয়রামপুরে দাঁড়াল।

এইখানেই একটা কথা বলে রাখি। 'পৈলান' নিয়ে সেই গল্পটার কথা। সেটা আর একটু এগুল; তার নায়িকা পেয়ে গেছি, ঐ পালবউ।

উদয়রামপুরকে ফলতা লাইনের এলাহাবাদ বলতে পার; এ পর্যন্ত যতগুলো জায়গা পার হওয়া গেল, তার মধ্যে সবচেয়ে জমকাল। স্টেশনের ধারেই চমৎকার একটি বাগান, মাঝখানে লম্বালম্বি একটা পুকুর, বাঁধানো ঘাট, একটি বেশ শৌখিন বাড়ি, বড় চমৎকার লাগল। একটা দুঃখের কথা তোমায় বলি—বাঙলা দেশে এলে আমি একটা জিনিসের অভাব বোধ করি বড্ড বেশি করে—ফুলের বাগান। যেখানে জায়গার অভাব, সেখানে দুটো ফুলের গাছই থাক না হয়, তাই বা কৈ? অথচ গাছ পোঁতে বাঙালী, বরং বাতিকই আছে গাছ পোঁতার, কিন্তু শুধু আম-জাম-কাঁঠাল-জামরুল, সুপারি-নারকেল; প্রায় সব বাড়িতে ঢুকেই আলো, রোদ, অবাধ হওয়ার অভাবে আমাদের ওদিককার লোকের যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। ফুল কৈ?—ক্বচিৎ এক-আধটা মল্লিকা কি গন্ধরাজ, কাজের গাছের আওতায় যেন কুঁকড়ে-মুকড়ে আছে—অনেক অভিভাবকের বাড়িতে নূতন বধূর শঙ্কিত গীতের মতো; কোথায় একটু নিরিবিলি কোন্ জানলার ধারটিতে বসে গুনগুন করে গাওয়ার সাধ মেটাচ্ছে।

বলবে শখ যে করবে, তার জন্যে মানুষ হওয়া চাই তো,—আঘাতে-অভাবে যে সে স্তর থেকে নেমেই আসছে বাঙালী!...পুরোপুরি সায় দিতে পারলাম না। শখ আছে বৈকি, তবে ধারা গেছে বদলে—রাস্তায় দুর্ভিক্ষের মড়ার

ভিড় ঠেলে যে বাঙালী সিনেমায় ভিড় জমাতে পেরেছে, তার শখ নেই বললে তার প্রতি অবিচার করা হয়। একটা মিটিং হলে আর্টের ঘটায় আসল জিনিস চাপা পড়বার উপক্রম হয়। আর্ট অর্থে অবশ্য আধুনিক সঙ্গীত আর ডাগর মেয়েদের ওরিয়েণ্টাল ডান্স; এবং বললে দোষ হবে না, এই আর্টের জন্যেই মিটিং অনেক ক্ষেত্রে, সাহিত্য, সংস্কৃতি একটা উপলক্ষ্য।....এতেও কেমন করে বলি শখ নেই? আসলে ঐ যা বললাম—ধারা গেছে বদলে। এত জায়গায় যাই, কোথাও একটু ফুলের বাহুল্য দেখলাম না, ফুলের উচ্ছ্বসিত আলোচনা একটু কানে গেল না। অথচ আমি আশা করেছিলাম, জাতিগত হিসাবেই আমাদের স্থানটা এ বিষয়ে ভারতবর্ষে সবার ওপরেই হবে। ফুল আমাদের শখ না, প্রয়োজন। ভাগ্যিস গোটা কতক ঠাকুর এখনও ভয় দেখিয়ে, চোখ রাঙিয়ে বেঁচে আছে, ভাগ্যিস বিয়ে-ফুলশয্যাটা হচ্ছে এখনও, ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে, ভাগ্যিস বছরে দু-একটা সভাপতি কি প্রধান অতিথি হবার নিমন্ত্রণ জোটে কপালে, তাই ফুল দেখতে পাই একটু, নইলে এও বন্ধ হত। জাতিচরিত্র প্রকাশ পাবে সব জায়গায়ই। আর একটু উঁচুতে উঠে দেখ না,—ইডেন গার্ডেনের মতো একটা সত্যিকারই নন্দনকানন বাঙালীর হাতে পড়ে মারা গেল, এ হত্যাকাণ্ড অন্য কোন জাতের দ্বারা সম্ভব হত? কার্জন পার্কটা দেখেছ? লালদীঘি? একটা আটতলা বাড়িই হাঁকড়ে ফেললে। অন্য কোন জাত হলে নিজের বুক পেতে দিত, লালদীঘির ইজ্জত নষ্ট করতে দিত না এভাবে—এক ছটাক জায়গা দিয়ে নয়। শুধু হেদো-গোলদীঘির তেমন কিছু ইতরবিশেষ হয় নি,ও দুটো তখনও ছিল বাঙালীর, এখন তো আছেই, শুধু স্বাধীনতার পর এখন বেশি করে আছে বলে বেশি করেই গেছে।

ইঞ্জিনটা বোধহয় একটু বেশি রকম জখম হয়ে পড়েছে। গাড়ি ছাড়ে না দেখে গলা বাড়িয়ে দেখি ড্রাইভার-খালাসী নেমে যন্ত্রপাতি নিয়ে খুব ঠোকাঠুকি লাগিয়েছে, গার্ড, স্টেশন মাস্টারও জুটেছে, বেশ একটু মোচ্ছব গোছের ব্যাপার পড়ে গেছে। নামলাম। রোদটা অনেকখানি নরম হয়ে এসেছে, একটা লোভ হচ্ছে; দেখি যদি সম্ভব হয়!

গিয়ে উপস্থিত হলাম।

"কি মশাই, বিলম্ব হবে নাকি?"

স্টেশন মাস্টার একবার মুখের পানে চেয়ে দেখলেন, তারপর প্রশ্নটা এগিয়ে দিলেন—"কি ড্রাইভার সায়েব্, কি রকম বুঝছেন?"

পূর্ববঙ্গের মুসলমান, বড় রেঞ্চটা খুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে—"হালার ইবলিস্ সেঁদিয়েচে, হয়রান করবে একটু।"

"কতক্ষণ--বিশ মিনিট—আধ ঘণ্টা?"—আমিই সোজা প্রশ্নটা করলাম।

"বিশ মিনিট কি আধ ঘণ্টা⋯?"

প্রশ্নটার শুধু পুনরুক্তি করে যেখানটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, সেই-খানটায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, পকেট থেকে একটা দোআনি বের করলে, খালাসীটার হাতে দিয়ে বললে—"এক বাণ্ডিল বিড়ি নে আয়। হালার ইবলিস্ সেঁদিয়েচে, হয়রান করবে একটু।"

বোঝা গেল। ইবলিস্কে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঘুরে দেখা যাক না জায়গাটা, একটু বলেও রাখলাম স্টেশন মাস্টারকে—"কাছেই একটু দরকার আছে, মিনিট দশকের মধ্যে আসছি।"

বললেন—"কাছেপিঠে হয়তো যান, হুইসিল শুনলেই যাতে পৌঁছে যেতে পারেন।"

গার্ডসাহেব একটু বেরিয়ে এসে ঠোঁট কুঁচকে বললেন—"যান আপনি। ইবলিস্ তাড়াবার জন্যে যেরকম ধোঁয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, আমার তো ভয়, ঘোলদাপুর থেকে অন্য ইঞ্জিন আনতে না হয়।"

জায়গাটি বড় স্নিগ্ধ, ঐ কামারের কারখানার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আমার যেন আরও ভালো লাগছিল। একটু উজিয়ে গেলাম। থানা, পোস্ট অফিস, একটু এগিয়ে এসে সেই বাগানটা; খবর নিয়ে জানলাম, এখানকার যে জমিদার, তাঁর কাছারি-বাড়ি। সমস্ত জায়গাটি বড় বড় গাছের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন; রোদ আছে, কিন্তু মুক্ত হাওয়াটা বড় মিষ্ট। বাঁ দিকে রাস্তা থেকে একটা মেঠো পথ নেমে গেছে কতকগুলো গাছপালার মধ্যে, বোধহয় গ্রামের পূর্বসূচনা। একটি চমৎকার রংকরা দোতলা বাড়িও তার মধ্যে আধ-ঢাকা

হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু এইতেই উদয়রামপুর প্রায় ফুরিয়ে গেল। আরও গোটাকতক ঘর এদিকে ওদিকে ছড়ানো। তারপর, জমিদারী কাছারির পরে স্টেশনটা। এদিকে গোটাকতক দোকান। ডায়মণ্ডহারবার রোডের ওপর যে সব গ্রাম, তাদের দৈর্ঘ্য যদিই-বা একটু আছে, বিস্তার নেই। ডায়মণ্ড-হারবার রোড যেন এক ধরনের লতা, একটানা চলে গেছে, মাঝে মাঝে শুধু পল্লব-পুষ্প-কিশলয়ে পরিধিটা গেছে বেড়ে।

স্টেশনের কাছাকাছি আসতে ডান দিকের একটা জায়গা দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। ইঞ্জিনের মেরামত চলছেই তখনও, তবে সবাই ওদিকে; একটা মানুষ যে কাজের নাম করে, বোশেখের রোদে অযথাই টো-টো-কোম্পানির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটা লক্ষ্য করবার মতো কেউ এদিকে নেই। এগিয়ে চললাম। দুটো থাম-বসানো একটা গেট, তার ভেতর খুব বিস্তীর্ণ একটা জমির ওপর দূরে দূরে কয়েকটা বাড়ি, একটা পুকুর, টানা মাঠ, সব তকতকে ঝকঝকে; হঠাৎ এরকম জায়গায় এ ধরনের জিনিস দেখব আশা করি নি। মাঠে গোলপোস্ট দেখে এটা বোঝা গেল যে স্কুল একটা, তবে সাধারণ পাড়া-গেঁয়ে স্কুল নয়; সমস্ত ছবিখানির মধ্যে দিয়ে যে সঙ্গতি আর রুচির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে হল কোনও মিশন স্কুল। রামকৃষ্ণ মিশনের কথাই আগে উঠল মনে। কিন্তু লোক নেই একেবারেই, কাকে জিগ্যেস করা যায়।

আমার সারথি আবার ওদিকে কখন্ হুইসিল দিয়ে বসেন। ঘুরে দেখলাম, না, ভিড় জমে রয়েছে, ইবলিস্ বাগ মানে নি এখনও।

দেখি, ভেতরে গেলে যদি কিছু সন্ধান পাই। গেটের ভেতর প্রথমেই একটা পরিখা গোছের, তার ওপর দিয়ে ছোট একটি পুল, বাঁ দিকে একটা আউট্ হাউস্।

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা; লোক নেই একটাও।

তারপর একটু দূরে ডান দিকে একটা বাড়ির সামনে নজর পড়ল। বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা তফাতে একটা গাছের নিচে কতকগুলি ছোট ছোট মেয়ে, একটু নূতন ধরনের আগন্তুক দেখে তারাও বিস্মিত হয়ে গেছে, বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার পানে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে আছে যেন একপাল হরিণ-শিশু।

এগিয়ে যেতে শঙ্কিত হয়ে পড়ল, কিন্তু পালাবে, কি দেখবেই দাঁড়িয়ে, সেটা ঠিক করে ফেলবার আগেই আমি গিয়ে পড়লাম।

ফ্রক-পরা ফিটফাট, সবচেয়ে যেটি বড় সেটির বয়স বোধহয় বছর নয়েকের বেশি হবে না, ছোটটি তার বোনের কোলে, বব-করা চুলে একটা নীল ফিতে বাঁধা, ভাসা ভাসা শঙ্কিত চোখে আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে, নূতন দুটি দাঁত ঠোঁটের ওপর চিকচিক করছে।

এ অবস্থায় হাতটা আপনি গিয়ে পকেটে সেঁদোয়—দুটো লেবেঞ্চুস কি কিছু।—হায়রে পোড়াকপাল! শখেরবাজারে গোটাকতক পেয়ারাও যদি কিনে রাখি!

শুকনো ভাবই করতে হল। ব্যাধের ভয়ে সম্মোহিত হয়ে হরিণশিশুর পাল আটকে গেছে, আবার বাজারের দিকে পা বাড়ালে কি ফিরে পাওয়া যাবে?

"তোমরা কি এখানেই থাক?"

আধ মিনিটটাক সেই রকমই কাটল—নতুন মানুষ দেখে ভয়ই বল বা সঙ্কোচই বল। বেশি নয়, আধ মিনিট, তারপর সেটা গেল কেটে। সঙ্গে-সঙ্গেই উল্ট স্রোত, প্রথমে একটি মেয়ের মুখে হাসি ফুটল, বড় একটির, তার ছোঁয়াচে দুটির, তারপরে পাঁচ-ছটির, তারপরেই সবার,—মুখ ঘুরিয়ে, এ ওর ঘাড়ে মুখ গুঁজে, সরে গিয়ে হেলে পড়ে হাসি—শুধুই হাসি, থামতেই চায় না। গুমটের পর আচমকা হাওয়া উঠে একটা পুষ্পিত করবীর ঝাড়কে যেন দুলিয়ে দিলে।

নির্জন জায়গায় নতুন মানুষকে শিশুরা ভূত বলে ধরে নেয়, তা যদি না হল তো একেবারেই সং। সত্যিকার, সহজ মানুষে দাঁড়াতে আরও খানিকটা পরিচয়ের দরকার হয়। ওদের মনটা একেবারেই বিরুদ্ধধর্মী, তাকে মাঝামাঝি অবস্থায় এনে ফেলতে সময় লাগে।

একটু অপ্রতিভই করে তুলেছে। প্রশ্নটাই বেখাপ্পা হয়ে গেছে নাকি?—যারা এখানেই রয়েছে তাদের জিজ্ঞেস করা—'এখানে থাক?'—কাঁধে গামছা, বুকে তেল ঘষতে ঘষতে পুকুরের দিকে যাচ্ছে দেখেও আমাদের প্রশ্ন করা চলে—'এই যে স্নান করতে নাকি?'—ওদের নতুন কান, ভাষার একটুও অসঙ্গতি ওদের মনে বেশি করে সুড়সুড়ি লাগিয়ে দেয়।

"প্রশ্নটা পালটে দিলাম—"এটা ইস্কুল ?"

"হ্যাঁ, ইস্কুল।" বড় মেয়েটি, আরও দুতিনটি মেয়ে একসঙ্গে উত্তর দিলে। একটু দৃষ্টিবিনিময়ও হল কয়েকজনে, একটু হাসি উঠল ছলকে।

"কি ইস্কুল ?"

চুপচাপ। তবে খুকখুক করে এখানে ওখানে হাসিটা আছে ঠিক। এখন আমি হয়তো আর সং নই ; কিন্তু না হাসা যে আবার বোকার লক্ষণ, ভেবেছ ওরা কেউ তাই নাকি ?

বরং বেশি চালাক, বোকা বানাতে জানে। ঠাট্টা করতে জানে, মেয়ে বলেই সে-শক্তিটা এখন থেকেই ওদের মধ্যে অঙ্কুরিত হচ্ছে। একটি আর একটির ঘাড়ে মুখ গুঁজে বললে—"কি ইস্কুল আবার ? পড়বার স্কুল।"

আবার এক ঝলক হাসি, কিন্তু গিন্নিপনাও হচ্ছে অঙ্কুরিত পাশে পাশেই। বড়টি ভারিক্কে হয়ে উঠল—

"অত হাসি কিসের ? বাঃ !"

চোখে বেশ শাসন। আমার দিকে চেয়ে বললে—"না গো, আমাদের এটা মিশন ইস্কুল।"

সবার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে—আর যেন হাসি না ওঠে, ও কি ছ্যাবলামি।

প্রোটেক্শন্ পেয়ে স্বস্তি বোধ হল। প্রোটেক্শন্ই বৈকি, দিব্যি অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল, অত বড় একটা প্রেসের ম্যানেজার, তাকে হাসির পাখনায় উড়িয়েই নিয়ে গিয়েছিল একটু হলে। আশ্বস্ত হলাম, সেই সঙ্গে সাহস এল ফিরে, নিজের বয়সের গুরুত্বটা অনুভব করলাম, যেমন বলা উচিত, বললাম—"আহা, হাসুক না, হাসবে না ? তোমরা সবাই ছেলেমানুষ এখন, খুব হাসবে।"

"আমি তা বলে ছেলেমানুষটি নয়"—বড়টি আপত্তি জানিয়ে আরও গম্ভীর হয়ে ঠোঁট দুটো চেপে রইল।

"আমারও জন্মতিথি হয়েছিল কাল—আট বছরের।"

—গম্ভীর, অথচ এইটিই ছিল এতক্ষণ হাসির পাণ্ডা। এইটির কোলের সেই খুকিটি, তার মাথাটা কাঁধে চেপে মস্ত বড় দিদির মতো ডাইনে বাঁয়ে

আস্তে আস্তে দুলতে লাগল। ওপাশ থেকে একজন সাক্ষী দিলে—"হ্যাঁ, কেক হয়েছিল, পুডিং হয়েছিল!"

ভয় গিয়েছিল, চপলতাও গেল; বড়র দল যে! ভেতর থেকে একজন এগিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, এক লহমার একটু সঙ্কোচ, তারপরেই সোজা মুখটা তুলে বললে—"আল্ আমাল বাবা আমাকে বলে বুলি।"

একটু চুপচাপ, সেও মাত্র এক লহমার। বড় হওয়ায় ওই বুঝি বাজিমাত করে নিলে! তারপর সবার বড়টি ঘাড় বেঁকিয়ে একবার করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে নিয়ে আমার মুখের পানে হেসে উঠল, বললে,—"বুড়ি বলে তাই বুড়ি হয়ে গেল! ঠাট্টা বোঝে না।"

কাছে টেনে নিলাম। সাবান-দেওয়া নরম চুলে একটি রাঙা ফিতের ফুল, পুরন্ত তুলতুলে গাল, স্পর্শে আমার সমস্ত দিনটি যেন মোলায়েম করে দিলে —বুকে তুলে নিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বুড়ো মানুষকে হঠাৎ অতটা খেলো করা ঠিক হবে কি?—ওদের মন আবার বড় ঠুনকো—বুঝুক না বুঝুক, এই ঠাট্টার টিপ্পুনিটাতে গম্ভীর হয়ে গেছে—কে জানে কি ব্যাপার? কোলে নিতে গেলে বোধ হয় উল্টো উৎপত্তি হয়ে পড়বে; ঠোঁট উঠবে থরথরিয়ে কেঁপে, তারপরেই চোখদুটি ভেসে উঠবে জলে। সামলাবার চেষ্টা করেই বললাম —"বাঃ, বুড়ি না? তোমাদের কারুর আট, কারুর নয়, ওর বয়সের তো হিসেব নেই, না গা বুড়িমা?"

জোরে মাথা দুলে উঠল, বললে—"হ্যাঁ, তাল বচোল!"

চারিদিকে একেবারে ছলছলিয়ে উঠল হাসি—"চার!···চার!···ওমা চার বছরের বুড়ি!····"

তাড়াতাড়ি তুলেই নিতে হল কোলে। কিন্তু না, সুরেই সুর মিশেছে; মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠল····"তাল বচোলের বুলি!"

জাতে উঠে গেলাম। কোলে উঠেও না-কাঁদা মানে আমি আর অপাঙক্তেয় নই, আমার বয়সের জঞ্জাল থেকে 'শুদ্ধি' করে আমায় আপন করে নেওয়া হল। এ-সব ব্যাপারে সব-ছোটই হল সমাজপতি, তার হাতেই জাতপাতের ফেণী-বাতাসা।

এইবার আনন্দভোজে অবাধ মেলামেশা। কিন্তু ফলতা মেল বাদ সাধলে, বাঁশি উঠল বেজে।

পাটা আপনা হতেই এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল, থমকে দাঁড়িয়ে বললাম —"এবার যাই।"

'তাল বচোলের বুলি'-কেও কোল থেকে নামাতে যাব, সে জড়িয়ে ধরে মুখের পানে চেয়ে বললে—"তাকো।"

রবটা সবাই তুলে নিলে—"থাকুন—থাকুন—না, যেতে পারবেন না, থাকুন। ...দোবই না যেতে—কক্ষণই না...."

ঘিরে দাঁড়াল। ওদের দখল অপ্রতিদ্বন্দ্ব, তার মাঝখানে কেউ এসে দাঁড়াবে না, কিছু এসে দাঁড়াবে না।...আর একটা ডাক, সঙ্গেই আরও তিনটে। এগিয়েই বললাম—"না, আমায় যেতেই হবে ঐ গাড়িতে, শুনছ না—হুইসিল দিচ্ছে?"

গড়া হতে না হতেই ভাঙন, সবার মুখে একটা ছায়া নেমে এসেছে—পরস্পরের পানে চাইছে, এবার সত্যিই বড়র মতো কিছু একটা বলুক না বা করুক না গা, যাতে লোকটা যায় আটকে।....না হয় থেকেই যাই? বেড়াতেই তো আসা—যেখানে যা পাই দুটি মুঠায় ভরতে ভরতে এগিয়ে যাওয়া, তা এর চেয়ে বড় কিছু পাব কি? এ যেন একটি স্বপ্নলোক, চলার পথের পাশেই একটু আড়াল করে রচা, হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়ে কি করে এসে গেছি, ঘুম ভাঙার মুখে মনটা যেন টনটন করে উঠছে।

আবার বাঁশি, কর্কশ। চলে গেলেই তো পারে, আমিও মনকে একট জবাবদিহি দিয়ে নিশ্চিন্ত হই, কী এমন অমূল্য সম্পদ আমি, যে ফেলে যেতে চাইছে না?

শেষকালে একটা রফা হল, ওরাও গেট পর্যন্ত চলুক সবাই। যেতে যেতেই পরিচয় পাওয়া গেল আরও খানিকটা। ক্রিশ্চানদের মিশন স্কুল, যা জন্মতিথিতে কেক-পুডিঙের ব্যবস্থায়, অনেকটা আন্দাজ করেই নিয়েছিলাম। স্কুলে ছেলে পড়ে সব জাতিরই, ছেলেও আবার মেয়েও। না, মাস্টার মশাইরাও সবাই ক্রিশ্চান নয়—এই তো সন্ধ্যা, ওরা হিন্দু, রমা, ওরা হিন্দু—ওর নাম জবা—ও

নাম মালা,—"ওগো, আমাল নাম দলি", কোলেরটি আমার মুখটা ঘুরিয়ে নিজের মুখের কাছে টেনে নিয়ে বললে।

স্কুলে এখন গরমের ছুটি। হেড মাস্টার মশাই এখানেই আছেন আর আছে এরা সবাই। সন্ধ্যারা চলে যাবে—ওর মাসি রাঁচিতে খুব বড় লোক —সেইখানে যাবে।

"তাই নাকি?" ফিরে প্রশ্ন করতে সন্ধ্যা ঠোঁটদুটি জড়ো করে একটু গম্ভীর হয়ে উঠল, বড় মানুষের বোনঝির যেমনটি হওয়া উচিত। ফ্রকের কোমরের কাছটায় একটু ছেঁড়া, সেইটে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে বললে— "দুখানা মটোর আছে।"

সবার মুখের ওপর থেকে কতকটা সভয় দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে এল,—কোনও হিংসুটি আবার ফ্রকের ছেঁড়ার কথাটা ফাঁস করে দেবে না তো?

গেটের কাছে এসে ফিরে দাঁড়ালাম।

"এবার যাই, কি বল?"

বিহ্বল কতকগুলি চোখ, ঠিক একরকম দৃষ্টি নিয়ে, মুখের পানে চেয়ে রইল। একি টনটনানি মনের মধ্যে! না এলেই যে ভালো ছিল, অথচ কতটুকুই বা ছিলাম? সব মিলিয়ে হদ্দ মিনিট পনের।

পেছনে বিদ্যায়তন, প্রশস্ত খেলার মাঠ, তারপর পুকুর, তাকে ঘিরে বাড়ি, বাগান; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পড়ন্ত রোদে একটু বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। না, আমারই মনের ছায়া পড়ল?

বড়টি বললে—"আবার আসবেন।"

তারপরেই—"আবার আসবেন···আবার আসবেন····আসবেন আবার ··নিশ্চয় আসবেন···"

—ভাষা খুঁজে পেয়ে যেন বাঁচল সবাই, আবার হাসিও ফুটল একটু একটু। ছোটটিকে একটি চুমু খেয়ে নামিয়ে দিলাম; কোল হালকা হয়ে কখনও মনটা এত ভারী করে দেয় নি। আর একটি চুমু খেলাম, বললে—"আবাল আছবেন।"

গলাটা টনটন করছে, কথা কইয়ে জবাব দেবার ভরসা হচ্ছে না, আসতে আসতে একবার যে ফিরে দেখব, তারও নয়।

ইঞ্জিনের সে-দোষটা সেরেছে—ড্রাইভার তাই বললে, ইবলিস্ এখন বাঁশিটা করেছে আশ্রয়। অতগুলো যে শব্দ ওটা আমার ডাক নয়, সে হালার পো' কোথায় ঢুকে বসে আছে, তারই অনুসন্ধান চলছিল।

প্রশ্ন করলাম—"দেরি হবে ?"

"হালাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিমু।"

গার্ড আর স্টেশন-মাস্টার ওদিক থেকে এলেন। স্টেশন-মাস্টার বললেন—"ঘোলসাপুরে বলেই দিয়ে এলাম মশাই, পাঠিয়ে দিতে একটা ইঞ্জিন। পুরো এক বাণ্ডিল বিড়ির ধোঁয়া, তাতেই বড় গেল ওর ইবলিস্ তো ফুঁয়ে যাবে !"

জিগ্যেস করলাম—"কতটা দেরি হবে মনে করেন ?"

"এই কোয়ার্টার তিনেক ; এক ঘণ্টায় মধ্যেই যাবে ছেড়ে।"

পুরো এক ঘণ্টা সময় নিয়ে উদয়রামপুরে কি করতে পারে লোকে, মাথায় আসছে না ; দেড় গজের শহর, সে তো এমুড়ো ওমুড়ো দেখা হয়ে গেল। মিশন স্কুল ? না মারার কাঠি হাতে করে রয়েছে সবাই, পনের মিনিটেই যা অবস্থায় বিদায় হতে হয়েছে, একঘণ্টা দিতে সাহস হয় না। টানছে বৈকি—তবে জীবনে মাঝে মাঝে 'মোহমুদ্গরটা' ভেঁজে নেওয়াই নিরাপদ।

'আমতলার হাটটা কতদূর হবে এখান থেকে ?—যদি এক কাজ করা যায়, হেঁটে চলে গেলাম, তারপর ওখানে গিয়ে আবার ফলতা মেল। রোদ্দুর এসেছে নরম হয়ে, ডায়মণ্ডহারবার রোডকে খানিকটা এইভাবেই পাওয়া যাক না।

বেরিয়ে পড়লাম। মিশন স্কুলের সামনে দিয়েই রাস্তা। না, কেউ নেই। নতুন অভিজ্ঞতাটা বাড়ি বাড়ি পৌছুতে গেছে।…"জবা বললে—ভূত। আমি বললাম—কক্ষণও নয়। আর ভূতের কি গা আছে যে, কোলে করবে ? —তারা তো শুধু ছায়া,—ধোঁয়ার মতন, না গা ?"

কিংবা ছায়ার মতোই মিলিয়ে গেছি মন থেকে। ওদের মন কি ধরে রাখতে জানে ?—একটাকে মুছে একটা এসে দাঁড়াচ্ছে, এই করে চলেছে নিত্যনূতনের মিছিল।

মিশন স্কুলের গেট দিয়েই একটা লোক বেরিয়ে এল রাস্তার ওপর। কালো, রোগা, খর্ব ; চলছে ডান দিকটা ঝুঁকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যেন ; বাঁ কাঁধে বোষ্টমের ঝুলির মতো একটা ঝুলি ; বয়সে তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে ; এর চেয়ে বেশি কিনা ঠিক করে বলা শক্ত। মাথায় একটা জীর্ণ ছাতা ; তালি-আঁটা, একটা শাদা, একটা লাল তালি। এই জিন্ আর সেই পরীর দল—মিশন স্কুলটা কি করে যেন আমার কাছে আরব্য রজনীর বোগদাদ হয়ে পড়েছে। তারপর মোরটুকু কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে পাশাপাশি হলাম, প্রশ্ন করলাম—"আমতলার হাট কতটা হবে ?"

"আজ্ঞে, পোটাক। উই তো দেখা যায়।"

"সত্যি নাকি,—ওটাই ?—এত কাছে ?

"একই জায়গা তো, উদয়রামপুর হল থানা, পোস্ট আপিস, আপনার গিয়ে জমিদারী কাচারি নিয়ে ; ওটা হল হাট। জায়গাটা একই।"

"তোমার বাড়ি কোথায় ?"

কি একটা নাম বললে, মনে পড়ছে না।

"আমতলার হাট থেকে কতটা দূর ?"

"আমতলার হাট ছেড়ে খানিকটে গিয়ে বড় রাস্তা থেকে নেমে পড়লেন, তারপর মাঠটুকু পেরিয়েই...."

"একটু আস্তে চল না ; এক দিকেই যাচ্ছি, গল্প করতে করতে যেতাম একটু। আমার অত পা চলে না।"

"রুস্তম কথা, এ… যো… আর, আপনাদের ছিচরণ তো চলবার জন্যে নয়, তা কেন যাবে চলতে ? আর, এই যে দেখছেন এক জোড়া খুটি, ওপরের চালাটাকে টাঙোনে রয়েছে, এই দুটোকে ডাইনে চেলে ছেড়ে দিয়েছে কিনা, থামবে একেবারে কবরের সামনে গিয়ে।"

"হাঁটাহাঁটির কাজ বুঝি ?"

"রুদয়রস্ত। উপস্তিন এই ; আর সমস্ত শরীলটা ঘুমুতেও তো পায় না আজ্ঞে।"

"বুঝলাম না।"

"কাল রেতের কথা। আরফানের মা তাগাদা দিচ্ছে—নাও, ওঠ, বেরুতে

হবে নি? মাল সব যে তোয়ের হয়ে গেল। বলচি—দাঁড়া, আগে পাদুটো ফিরে আসুক।…ঘুমুচ্চি, তাও মাজাটুকুন পজ্জন্ত, পা দুটো ঝুলি কাঁধে করে ফিরি করতে বেইরে গেছে—হালসা—গোবিন্দপুর—টিমটিমে—ভাসা—"

ফিরে চেয়ে একটু হাসলে। রহস্যটা বেশ পরিষ্কার হয়নি দেখে বললে—"স্বপ্ন, আজ্ঞে। পা দুটো দেখচে হেঁটে বেড়াবার স্বপ্ন, মাজার ওপরটা দেখচে আরাম করে নিদ্রে দেবার স্বপ্ন। যার যে রকম অব্যেস আর কি, আর যেটা যে রকম কপাল করে এয়েচে।"

ফিরে একটু হাসলে। জমিয়েছে ভালো, আলাপটা চালাবার জন্যেই আমিও একটু হেসেই বললাম—"কিন্তু কোমরের ওপরটাই বা সর্বদা ঘুমিয়ে কাটাতে পারছে কৈ বলো। তাকেও তো ঘুরে ঘুরেই বেড়াতে হচ্ছে।"

"হক্ কথা। কিন্তু সেতো চতুদ্দোলায় চড়ে, সেটাও হিসেব করে দেখতে হবে তো। পা দুটোকে উদিকে নাগিয়ে দিয়েচে—মর হালারা হেঁটে—নিজে লবাব খাজার্থা হয়ে—এই দেখুন-না, আবার তার ওপরে ছত্র।"

আরও একটু স্পষ্ট করেই হাসতে যাচ্ছিল, পেছনে মোটর বাসের হর্ন বেজে ওঠায় একটু সন্ত্রস্ত হয়েই সরে এসে রাস্তার পাশে দাঁড়াল, আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাসটা উগ্র বেগেই বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাবার পরও একটু দাঁড়িয়ে রইল, যেন ভেতরে ভেতরে হাঁপাচ্ছে। একটু উৎসুকভাবেই প্রশ্ন করলাম—"হল কি?"

মুখের প্রসন্ন ভাবটা ফিরে এসেছে, একটু হেসেই বললে—"আজ্ঞে হতে আর পেলে কৈ…কথাটা হচ্ছে, সেই রুদয়রস্ত ঝুলি-কাঁধে টহল দেওয়া। সারা শরীলটা টাল খেতে থাকে অষ্ট পহর। তাই শড়ক দিয়ে চলিও না তো, ওই মিশন ইস্কুল থেকে আমতলার হাট, স্রেফ এইটুকু, তাইতেও মটোর যদি এল তো, গড় করে একেবারে রাস্তার কেনারে গিয়ে দাঁড়াই। উপস্তিন আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে একটু আনমনা হয়ে গেলাম না?—অত খেয়াল করতে পারিনি, আচমকা এসে একটু ইয়ে করে দিলে আর কি।"

বললাম—"রাস্তা থেকে সরেই চল বরং ঘাসের ওপর, দিব্যি নরম ঘাসও।"

নিজে নেমে গেলাম। এল সরে, কিন্তু সে-ভাবটা একেবারেই গেছে। হেসে বললে—"তা চলুন, কিন্তু ভয় যা করছেন, তার কিছু নেই আজ্ঞে। হাজীসায়েব বলেন, যেটুকু দেনা করে এয়েচ, পিরথিমিতে সেটুকু আদা না করে তো যাবার উপায় নেই। আমায় এখন কাগজের পাকিটে করে এতগুলি চানাচুর ঘরে ঘরে আদা করে ফিরতে হবে—ধরুন গিয়ে সব মিলিয়ে এত মণ এত সের এত পোয়া এত ছটাক—খোদাতালা সেটা বেঁধে দিয়েছে। দুরকম পাকিট, এক ছটাক আর আদ ছটাক—তা সবটুকু আদা না হয়ে গেল তো ছাড় নেই—ত মটোর বাসই বলুন, ও আপনার গিয়ে মা শেতলাই বলুন, কি ওলাবিবিই বলুন,—কারুর আঁচড়ই দেবার উপায় নেই তো গায়ে একটু।"

হেসে চেয়ে রইল মুখের পানে, সমস্তটুকুর মাত্রা হিসেবে বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ, এই হল সার কথা। হিন্দুর বেদ বলুন, মোছলমানের কোরান বলুন, কেরেস্তানদের যীশু বলুন।"

"তা হলে তুমি চানাচুর ফিরি করে বাড়ি ফিরছ? মেহনত তো বেশ দেখছি! থাকে কি রকম?"

"খোদাতালার যেরকম মর্জি; তিন টাকাও থাকে, চারটে টাকাও হয়েছে, আবার গণ্ডা কয় পয়সা নিয়েও খালি হাতে ফিরে এসেচি।"

"মাস গেলে গড়পড়তা?"

"আজ্ঞে তা গোটা তিরিশেক থেকে যায়।"

"মোটে?"

"তার হেতু রয়েচে, টান এলে তো বেরুতে পারি না, তা এরকম টান মাসে কোন্ না দশটা দিন আসচে? তাহলেই হিসেব করে দেখুন না।"

"টান? হাঁপানি আছে নাকি?"

বললুম- ড় দশটা দিন, বেশিরটা ভালোই থাকি তানার মর্জিতে।"

"চলে কি করে? সংসার কি?"

"সংসার আরফানের মা, আরফান, ছোট মেয়েটা আর এই অধীন।... চলবার কথা নয়, তবে খোদাতালা কষ্ট বলে জিনিসটা আর হতে দেয় না।

....টানের কথাটা বাদ দিতে হবে আজ্ঞে, কর্তার ছেলো, ছাওয়ালের হবে এ নিয়ম তো বাবা আদমের সময় থেকে চলে আসচে, কেয়ামত পজ্জন্ত থাকবে, এতে খোদাতালাই বা কি করবে, আর পীর-পয়গম্বরই বা কি করবে! তবে যাকে কষ্ট বলে সেটা হতে দেন না। যেটি ইদিক দিয়ে কুলুল না, সেটা আরফানের মা পাঁচ বাড়িতে গতরে খেটে পুষিয়ে নেয়। অতিরিক্ত খাটুনি, কিন্তু সেদিক দিয়ে খোদাতালার মেহেরবানি আচে। আরফানের মা যদি কাত হল তো আমি ঠিক আচি, আমি যদি বুক চেপে পড়লুম, আরফানের মা ঠিক আচে।...দুজনেও পড়েচি—এমনটা যে না হয়েচে তা নয়, কিন্তু চালিয়ে দিয়েচেন—পাড়ার কেউ না কেউ এসে সামলে দিয়েচে। খোদাতালা কষ্ট দিলেন এমন অধম্মের কথা বলে যে গুনোগার হব, এটুকু কখনও হতে দেননি।...আপনি যাবেন কতদূর?

"ফলতা।"

"আচ্ছা, সেলাম আলেকম। আমি এই অশ্বত্থতলাটায় নেমাজ সেরে নিই রোজ। তারপর বাজার হয়ে বাড়ি ফিরি। এই সময় বাজারটা বসে কিনা। আচ্ছা আমি রয়ে গেলাম একটু।"

"তোমার নামটা জিজ্ঞেস করা হল না তো।"

"আজ্ঞে নবাবজান। ঠিক খাটে না বুঝি, তবে বাপমায়ের দেওয়া নাম..."

"খুব খাটে নবাবজান। জানটা নবাব হলেই তো হল, মানে দিলটা আর কি।"

"আজ্ঞে, তাও বলি খোদাতালাকে,—বলি, পাদুটোর জন্যে ভাবি না, য্যাতো খাটাবে খাটাও, কিন্তু ওপরটাকে সাচ্চা রেখে যেও!"

একলা পড়ে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে অনুভবও করলাম যে, রোদটা এখনও দিব্যি কড়া রয়েছে। তা থাক, হাঁটিতে কিন্তু বেশ ভালোই লাগছে। হয়তো নবাবজানের তত্ত্ববাদ কিছু প্রেরণা জুগিয়ে থাকবে, কিন্তু আসল কথা সামনে রয়েছে একটা নিশ্চিন্ততা—দুপা এগিয়ে গেলেই স্টেশন, পেছন থেকে গাড়ি আসছে আমায় তুলে নিতে—এই দুটোর মাঝখানে একটু এই যে হাঁটা, গাড়ি

থেকে যে জীবনটাকে আলগোছে ছুঁয়ে যাচ্ছিলাম, তার সঙ্গে এই যে গলা জড়াজড়ি করে চলা এতে একটা নিবিড় আনন্দ পাচ্ছি ; একটা ছেলেমানুষী উল্লাস। এই চিঠিতেই কোথায় এক জায়গায় তোমায় বোধহয় বলেছি যে, একই সময়ে শৈশব থেকে আর যতটা এগিয়ে এসেছি, তার সমস্তটাই উপস্থিত থাকে আমাদের জীবনে। কথাটা খুব সত্যি। সেটাকে প্রকাশ হতে দেওয়া অসামাজিক, বেমানান, কিন্তু নিজের কাছে মনের নেপথ্যে সেটা সুযোগ পেলেই আত্মপ্রকাশ করছে।....একটা ছেলেমানুষী উল্লাস পাচ্ছি আমি, ছেলেমানুষী বলেই তার আকার নেই, তাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। গাড়িতে যাচ্ছি—নামলাম, ঘুরলাম, দেখলাম, শুনলাম, আবার গাড়ি, ইচ্ছে করলেই ওঠা যাবে—একটা যেন খেলা, যা এই খেলাঘরের গাড়ি নিয়েই সম্ভব ; এর যা আনন্দ, তার সামনে মাথার ওপর ছটাক খানেক বোশেখী রোদ কি পায়ের নিচে তপ্ত পিচ, এসব তো 'তুশ্চু'। এই দিকে শোনাই একটা কথা ব্যবহার করা গেল।

পাঞ্জাব মেলের সেকেণ্ড ক্লাসে নিশ্চিন্ত আরামে বসে আছ, স্টেশনের পর স্টেশন, দৃশ্যের পর দৃশ্য যাচ্ছে ছিটকে বেরিয়ে—সে আনন্দও (অবশ্য, যদি পেয়েই থাক) আমার এ আনন্দের কাছে পারে না দাঁড়াতে। তুমি ওটা করেছ উপভোগ, (আমারও হয়েছে কতক কতক) কিন্তু আমার এটা তো করোনি, করবেও না কখনও, সুতরাং কি করে করাই তোমায় বিশ্বাস ?

একটু থাম, তোমার ও উপলব্ধির মধ্যেও যেটুকু আনন্দের অংশ সেটুকু শৈশবই। প্রমাণ দিই। একবার চড়ে দেখ কোন একটা ওইরকম দ্রুতগামী গাড়ি—অত বড় আনন্দের খোরাক সামনে থাকতেও দেখবে চারিদিকে বুড়োর দল প্যাঁচার মতো মুখ করে আছে বসে ; কেউ খবরের কাগজ হাতে, কেউ বই হাতে, কেউ খালি হাতে গাড়ির ছাদের দিকে চেয়ে, তবু বাইরে চাইবে না। ভুল বুঝ না, 'বুড়ো'র অর্থ—এদের সবাই পাকা-চুল নয়। চব্বিশ বছরের যুবাও আছে তার মধ্যে। মন যেমন নেপথ্যে শৈশবের দিকে ছোটে তেমনি ছোটে বার্ধক্যের দিকেও, অবশ্য কৃত্রিম করে কল্পনায় ; যে-বার্ধক্য একদিন আসবে, কালো চুলেই তার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়। শাদা চুলে ছাঁদনাতলায় গিয়ে দাঁড়ানোর ঠিক উল্টো আর কি।

এ সব রোগের কি দাবাই বল ?

একটু কড়া হয়ে গেল, না ?

হোক, ওদের ওপর আমার একটু রাগ আছে। এদের সামনে বেমানান হবে বলে গাড়িতে রাত বারোটাতেই আমায় জানালা ছেড়ে বিছানায় আশ্রয় করতে হয়। তার মানে, অত খরচ করে যে একটা টিকিট করলাম, তার পনের আনাই লোকসান আমার। এক আনা যা লাভ তা শুধু একটুকু যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়াটা হল।

শৈশবো জয়তু! তার সামনে যৌবনও—ওই তুশ্চ ; তার পরের যা জীবন তার তো কথাই নেই। অবশ্য শৈশবের মধ্যে আমি কৈশোরকেও ধরছি, আসল কথা কৈশোর শৈশবই, শতদলটি শুধু বিকশিত হয়ে উঠেছে।

…একটা মোটর গাড়ি, খুব দামী বলেই মনে হয়, তেমন পুরাতনও নয়, ধিকিয়ে ধিকিয়ে চলছে আমার সামনে শ খানেক গজ দূরে। না, আমার মত উদ্ভট ভ্রমণ-বিলাস নয়, বেচারা কোথায় জখম হয়েছে, চারটি গোরুর-গাড়ির হেফাজতে। দূর থেকে দেখছি একজনকে (ড্রাইভারই নিশ্চয়) স্টিয়ারিংটা ধরে নির্লিপ্তভাবে বসে আছে।

করুণ দৃশ্য, একটা হাতী কাত হয়েছে। আমি কিন্তু সহানুভূতির 'মুড' এ নেই তখন। ওর কৌতুকটাই আমার মনটাকে অভিভূত করে ফেলেছে। কৌতুকের কি আছে ধরা শক্ত, চারখানা গাড়ির চার জোড়া বলদ গলা দুলিয়ে দুলিয়ে নির্বিকার ভাবে চলেছে, মোটরটা সব পেছনের গাড়িটার সঙ্গে একটা মোটা কাছি দিয়ে বাঁধা, চিত্রটুকু এই কিন্তু মনের কোথায় দিচ্ছেই একটু সুড়সুড়ি। আর এর সঙ্গেই একটা সকৌতুক আক্রোশও আছে যেন কোথায়—এরই সগোত্রীয়েরা এই খানিক আগে আমার গাড়ির দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে গিয়েছে বেরিয়ে ?

হাঁটছিলাম একটু জোরেই, সেদিক দিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই নবাবজানের সঙ্গে কখন একটা রফা হয়ে গিয়েছিল, একটু পরেই গাড়িটার পাশে এসে পড়লাম। সেডানবডি বেশ একখানি ভালো মোটর, ব্যবস্থার বাড়তির দিকে এই যে দুটো জানালাতেই কাচের পেছনে গোলাপী সিল্কের কোঁচকানো

কোঁচকানো পর্দা টানা। কৌতুক গিয়ে কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, কোনরকম অ্যাকসিডেণ্ট নাকি মেয়েছেলেসুদ্ধ? সেই কথাই জিগ্যেস করলাম ড্রাইভারকে।....অবশ্য একটু ভেবেচিন্তে জিগ্যেস করা উচিত ছিল।

লোকটা একটু রাশভারী, অন্তত প্রথমটা তাই মনে হয়, নিচের ঠোঁট দিয়ে ওপরেরটা ঠেলে তুলে একটা বিড়ি টানছিল, প্রশ্ন করলে—"সেই রকম মনে হচ্ছে?"

একটু আমতা আমতা করে বললাম—"না, মোটরের কথা বলছি না—তাতে তো ধাকাধুক্কির কিছু দেখছি না—অবিশ্যি যদি ও দিকটায় থাকে কিছু..."

"ঘুরে এসে দেখুন"—চোখের কোণ দিয়ে আমায় আগাপাস্তলা দেখে নিলে একবার।

বেশ একটু অস্বস্তিতে ফেলেছে, বললাম—"না, পর্দা টানা রয়েছে, তাই মনে হল যদি মেয়েছেলে কেউ থাকেন--আহত অবস্থায়...আরে মশাই, আঘাত তো কতরকমভাবে লাগতে পারে, আজকাল যা অবস্থা যাচ্ছে। না হয় ব্যাপারখানাই কি বলুন না, একটা মোটর চারখানা বলদ-গাড়িতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, স্টিয়ারিং ধরে বসে আছেন--কিছু একটা হয়েছে তো নিশ্চয়। এ তো একটা শখ হতে পারে না।"

বলতে বলতে শেষের দিকটা একটু উল্ট চাপই দিলাম, নৈলে দেখছি ধাতে আসবে না। ড্রাইভার হলেও ভদ্রঘরেরই ছেলে, অথচ কথাবার্তা এমন বেয়াড়া!

টসকাল না। বললে,—"শখের আপনি কতরকম জানেন?"

আমি আর উত্তর না দিয়ে পা চালিয়ে দিলাম, স্থানত্যাগেন দুর্জনঃ। মুখ খুলেই ভুল হয়েছিল!

গোরুর গাড়িগুলা প্রায় পেরিয়েছি, গলা বাড়িয়ে ডাকল—"শুনুন...হ্যাঁ, আপনাকেই ডাকছি।"

দাঁড়িয়ে পড়লাম।

"কি?"

"এই গাড়িটা সত্তর মাইল পর্যন্ত দৌড়তে পারে ঘণ্টায়। দেখুন না স্পীডোমিটারটা, এই যে। রাস্তায় ট্রাফিক বেশি, তবুও জায়গায় জায়গায় পঞ্চাশ-ষাট মাইল পর্যন্ত তুলতাম; তার জায়গায় এই—চার জোড়া বলদের ন্যাজ ধরে এইভাবে চলেছি দুপুর একটা থেকে।…এসেছি আড়াই মাইল।… উল্টে আমার ওপরই রাগ করছেন?"

"সামান্য একটা প্রশ্ন—একটা ভালো গাড়িকে এ অবস্থায় দেখলে করেই লোকে—ভদ্রলোক দেখেই করেছি—গাড়োয়ানগুলোকে তো করতে যাইনি …তা আপনি…"

—বেশি নরম হওয়ার দরকার দেখলাম না।

চোখের কোণ দিয়ে চেয়ে দেখছিল, একটু হাসির ভাব ফুটল ঠোঁটে, বললে—"রাগটা এখনও যায়নি…যাবেন কোথায়?"

"এই আমতলার-হাট, ট্রেন ধরব।"

"তা আসুন না, আপত্তি না থাকে তো রোদে পুড়তে পুড়তে যাওয়ার চেয়ে…"

দোরের হ্যাণ্ডেলটায় মোচড় দিলে। বললাম "থাক, এইটুকু তো।"

"একটু গল্প করতে করতে যেতাম, যতটুকু হয়। একলা এই দুর্দশা দেখুন না।"

একটু হেসে বললে,—"গল্প করবার নমুনা দেখে পেছিয়ে যাচ্ছেন?"

ড্রাইভার হিসাবে একটু বোধহয় বেশি ফ্রী মনে হচ্ছে তোমার, নয় কি? একটু খাপছাড়া গোছের বটেই, তবে তুমি যে বেশি ফ্রী মনে করছ, সেটা একটা কথা ভুলে যাচ্ছ বলে—আমি অফিসের পোশাকে নেই, এমনকি বাড়ির সাধারণ পোশাকেও নয়; কি পোশাকে রয়েছি তার তালিকাবদ্ধ বর্ণনা দোব না, তবে এমনই একটা হরবোলা পোশাক, যাতে ভদ্র পরিবেশে বসে যেমন নিতান্ত বেমানান হই না তেমনই বদনের বিড়ি অফার করতেও বাধে না।

ভাবান্তর দেখে আমিও ভাব বদলালাম, একটু হেসেই বললাম, "তা পেছুচ্ছি বইকি একটু।"

"বলেছি—শখের আপনি কত রকম জানেন?" সেই রকম হাসির সঙ্গে বললে কথাটা, শুধু আর একটু স্পষ্ট। ক্রমেই ইণ্টারেস্টিং মনে হচ্ছে লোকটাকে।

আমিও হাসিটাকে আর একটু স্পষ্ট করে বললাম—"তা বললেন বৈকি।"

"তা সত্যিই দেখেছেন কতরকম? আসুন, উঠেই বসুন।" বলে এবার দোরটা খুলেই ধরলে একেবারে।

রসিকতা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল, আর একটু হলে উল্টে রাস্তার ওপর আছড়ে পড়তাম, চাকার নীচেই যে শরীরের খানিকটা সেঁদিয়ে যেত না তা বা কে বলতে পারে?

—গাড়িটা খুব আস্তে চলেছে, তবু চলেছেই তো? পাদানিতে উঠে যেই ভেতরে ঢুকতে যাব, "এ কী কাণ্ড!!"—বলে একেবারে টাল খেয়ে পড়-পড় হতেই ড্রাইভার খপ করে হাতটা ধরে ভেতরে টেনে নিলে, কয়েক সেকেণ্ড আর কথাই কইতে পারলাম না, তারপর বললাম—"এই তো অ্যাকসিডেণ্ট দেখছি—আর আপনি বলছিলেন····আর এইরকম একটা সিরিয়াস কেস্ নিয়ে এইভাবে ধিকুতে ধিকুতে যাওয়া···এত বাস যাচ্ছে, একটাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারতেন তো।"

হাসিতে দুলতে আরম্ভ করেছে লোকটা; তার মধ্যেই সংক্ষেপে বললে —"শখ।"

"শখ!"—বলে আবার আমি পেছনের সীটের দিকে চাইলাম।

প্রায় বছর চল্লিশেক বয়স, থলথলে মোটা শরীর, টকটক করছে গায়ের রং, একটা লোক চিৎপটাং হয়ে পড়ে রয়েছে, কোমর থেকে ওপরটা গদির ওপর, বাকিটা নিচে; শৌখিন ধুতিপাঞ্জাবি, কিন্তু প্রায় অসামাল। অতিরিক্ত বিস্ময়ে আবার ড্রাইভারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলাম—"শখ কি মশায়! আঘাত-টাঘাত নয়?"

সমস্ত গল্পটা হাসির ভেতর থেকে খানিক খানিক করে যা উদ্ধার করা গেল তা এই:

উত্তর কলকাতার একজন নাম-করা জমিদার ঘরের অপোগণ্ড। (নামটাও

বললে, কিন্তু এক-কান থেকে আর দুকান করব না, মাফ কোর)। আরও অনেক দূর এগিয়ে, ডায়মণ্ডহারবার রোডের ওপরই শ্বশুরের বাগান-বাড়ি, কিছুদিন থেকে সবার 'শৈল-বাস' চলেছে। জামাই সেখানেই চলেছে। একটা ছোট স্যুটকেস নিয়ে উঠেছিল, গাড়ি খানিকটা এগুতেই সেটা ড্রাইভারের পাশে রেখে দিয়ে বললে ওটা একেবারে নামবার সময় আমার হাতে দেবে, তার আগে কোনমতেই নয়। ড্রাইভারের একটু খটকা লাগল, কিন্তু আর মাথা ঘামাতে গেল না ও নিয়ে, পাশেই পড়ে রইল স্যুটকেসটা; শ্যামবাজার থেকে ধর্মতলা পযন্ত এল, কোন কথাবার্তা নেই। মনুমেণ্টটা যখন পেরিয়ে গেছে, হুকুম হল—"ড্রাইভার—ইউ।"

অদ্ভুত আওয়াজ শুনে ড্রাইভার ফিরে দেখে সে মানুষই নয়, মাথাটা একটু একটু দুলছে, চোখদুটো গোলাপী, মুখটা থমথম করছে। অতটা আন্দাজ না করতে পেরে জিগ্যেস করলে—"আপনার অসুখ হল নাকি ?"

"ইয়েস, স্যুটকেসে ওষুধ আছে, লে আও।"

ব্যাপারটা তখন বোঝা গেল। আপাতত কিন্তু ঐ পর্যন্তই রইল, কথাটা বলেই গদির পিঠে ঢলে পড়তে ড্রাইভার টানা মাঠের ওপর স্পীডটা বাড়িয়ে দিলে। প্রায় মিনিট কুড়ি পরে, যখন মাঝেরহাটের পুলের ওপর, হঠাৎ পেছন থেকে জামার গলা ধরে এক টান, স্টিয়ারিং নড়ে গিয়ে একটা কাণ্ড হয় আর কি। ড্রাইভার তাড়াতাড়ি থামিয়ে জিগ্যেস করলে—"কি বলছেন ?"

"তোমায় না এক্ষুণি ওষুধটা এগিয়ে দিতে বললাম ?"—কথা আরও এসেছে জড়িয়ে।

ড্রাইভার বললে—"আপনিই তো মানা করেছিলেন ওঠবার সময় ?"

"ড্যাম ইউ ; তখন অসুখ ছিল ? লুক হিয়ার—একশ দশ ডিগ্রি !"

হাতটা বাড়িয়ে দিলে। ড্রাইভার বললে—"ওষুধ খেলে একশ' পনের হয়ে যাবে যে।"

মুখের দিকে একটু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল, হাসি ফুটল, মাতালের হাসি, তারপর 'গুড বয়, গুড বয়' বলে আবার গদির গায়ে ঢলে পড়ল। এর পরের ঝোঁকটা উঠল বেহালার ট্রাম ডিপোর কাছে।

ড্রাইভার বলে—"মশাই, এমন অদ্ভুত মাতাল দেখি নি, বাড়িতে বেরুবার আগেই কতখানি গিলে নিয়েছে, তা যত এগুচ্ছে তত কমে আসবে নেশাটা, না, ততই বে-একতিয়ার হয়ে পড়েছে। ঝাঁ ঝাঁ করছে, দুপুর, রাস্তায় লোক নেই, নইলে ভিড় জমে একটা কাণ্ড হয়ে যেত—ট্রাম ডিপোটার কাছে এসেছি, হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে উঠে বলে,—"এই স্টপ, দাঁড়াও, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমায়? হোয়্যার?"

না ঘুরে বললাম—"শ্বশুরবাড়ি।"

"কার?"

মনটা বেশ খিঁচিয়ে এসেছে, বললাম—"এ অবস্থায় অন্য কার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে গিয়ে তুলব। নিজের শ্বশুরবাড়িতেই খাতিরটা কেমন হয় দেখুন না গিয়ে।"

"আলবত হবে।"

"চলুন তাহলে।"

"কোথায়?"

"শ্বশুরবাড়ি।"

"কার?"

না ঘুরেই কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছি, স্পীডও দিয়েছি বাড়িয়ে, তাড়াতাড়ি গিয়ে ডেলিভারি দিয়ে দিতে পারলে বাঁচি পেয়ারের জামাইকে। ডেফ অ্যাণ্ড ডাম্ব স্কুল পেরিয়ে গেলাম, বঁড়শের তেমাথা দেখা যাচ্ছে, আবার উলসে উঠল, এবার আরও সাংঘাতিক, বলে—"চেঁচাব আমি।"

"কেন মশাই—চেঁচাবার কি হয়েছে?"

"আমায় কিড্‌ন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছ, চুরি করে। ইয়েস কিড্‌ন্যাপ করে—চেঁচাব, আই উইল শাউট—নইলে মাল বের কর—আমায় শ্বশুর-বাড়ি যেতে হবে আমি রায়-বাড়ির জামাই—"

তেমাথায় দোকানপাট, শিখ ড্রাইভারদের আড্ডা, আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম মশাই, মাতালের কাণ্ড, চেঁচালেই হল, তারপর মেরে আমার পস্তা উড়িয়ে দিয়ে পুলিসে হ্যাণ্ড-ওভার করে দিক সবাই জড়ো হয়ে। স্যুটকেসটা নিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, তুলে দিয়ে দিলাম হাতে। মরগে যা।

একটা তোয়ালেতে জড়ানো দুটো বোতল ছিল, আরম্ভ করে দিলে। ভাসা ছাড়িয়ে খানিকটা এদিকে এসেছি, মোটরটাকে একবার থামতে হল। খানদশেক বিচুলির গোরুর গাড়ি কোথাও মাল খালাস দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল, কিভাবে তাদের একটা জট পাকিয়ে গেছে রাস্তার মাঝখানে।

তখন ওর একটা বোতল সাফ হয়ে গেছে; একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল, গাড়িটা থেমে যেতে আবার একটু সোজা হয়ে বসল, বললে "চালাও, রোকা কাহে?"

বললাম—"গাড়িগুলো একপাশে করে নিচ্চে, তারপরেই আবার বেরিয়ে যাব।"

"কোথায় যাবে? হোয়ার?"

"আপনার শ্বশুরবাড়ি।"

"শ্বশুরবাড়ি!" ভয়ানক আশ্চয হয়ে চোখ পিটপিটিয়ে আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল, আব্যর জিগ্যেস করলে "শ্বশুরবাড়ি!" তারপর গলা বাড়িয়ে একটু কি দেখে নিয়ে বললে—"শ্বশুরবাড়ি তো প্রোসেশন কোথায়?"

"প্রোসেশন কি মশাই? মোটরে করে শ্বশুরবাড়ি যাবেন বললেন, ড্রাইভ করে নিয়ে যাচ্ছি, প্রোসেশন কোথা থেকে আসবে? এ তো আর নতুন বিয়ে করতে যাচ্ছেন না।"

বেশ রাগ ধরে গেছে মশাই। গাড়িগুলো ততক্ষণ একপাশে করেছে। স্টার্ট দিয়ে দিলাম। তারই ঝাঁকানিতে বোধ হয় গড়িয়ে পড়েছিল, গাড়িগুলোকে ছাড়িয়ে গেছি, টলতে টলতে উঠে আবার আমার জামার কলার চেপে ধরলে।

"আলবাত প্রোসেশন, রায়বাড়ির জামাই, ব্যাণ্ড চাই, প্রোসেশন চাই।...সেখানে শাঁখ নিয়ে মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

"তা পাব কোথায় ব্যাণ্ড আর প্রোসেশন, এ আঘাটা জায়গায়? চাই না হয় বুঝলাম।"

থামিয়ে ফেলেছিলাম গাড়িটা, আবার স্টার্ট দিতেই গদি ছেড়ে উঠে

পড়ল—"ইউ! আই উইল শাউট—চেঁচাব, আমায় কিড্‌ন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছে। ঘড়িতে আংটিতে আমার গায়ে চার হাজার টাকার মাল....।"

ভয় পেয়েই গেলাম মশাই, অস্বীকার করব না। মাতাল হলেও কিচলেমি জ্ঞানটা টনটনে, লোক দেখলেই ওই ভয় দেখাচ্ছে, যদি চেঁচিয়েই বসে তো তাদের বোঝাবার আগেই একটা কাণ্ড হয়ে যাবে। গরীবের ছেলে, পেটের দায়ে চাকরি করতে শেষে প্রাণটা বিঘোরে খোয়াব? গলার স্বর আরও জড়িয়ে এসেছে, তার ওপর ইংরেজি বুকনি; নয়তো এতক্ষণ বোধ হয় হয়েই যেত কিছু একটা। নরমই হয়ে গেলাম, বললাম—"তা তো বলছি না, রাজবাড়ির ছেলে, প্রোসেশন করে যান আপনি, সেইটিই তো মানান-সই, কিন্তু এখানে তার ব্যবস্থা হয় কি করে।"

"দ্যাটস্ গুড, আমি রায়বাড়ির জামাই বাবা! ইয়েস!" একটু শাসিয়ে কথাটা বলেই কিন্তু ও-ও নরম হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—"কটা গাড়ি আছে?"

বললাম—"গাড়ি তো এই একটি।"

"আবার ল্যাজে খেলছ বাবা?"

বললাম—"আজ্ঞে ও তো গোরুর গাড়ি সব। ওতে তো আর প্রোসেশন হবে না।"

"আলবাত হবে। লুক হিয়ার, সবগুলোকে বায়না দিয়ে দাও, বেহাত না হয়ে যায়।"

পকেট থেকে ব্যাগটা বের করে এদিকে ছুঁড়ে ফেলল···সেই রায়বাড়ির জামাইকে প্রোসেশন করে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাচ্ছি মশাই। সংক্ষেপে ইতিহাসটা বললাম।"

অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, ফিরে দেখলাম জামাতারত্নের দেহটা আরও খানিকটা নিচে নেমে এসেছে; হতভম্ব হয়ে গেছি, কিন্তু একটা বলবার জন্যই বললাম —"আমি মনে করেছিলাম বুঝি গাড়িটা জখম হয়েছে।"

উত্তর করলে—"সেই ভাবেই তো ব্যবস্থাটা করেছি মশাই, একটু বুদ্ধি জুগিয়ে গেল। আগে পাঁচটা পেছনে পাঁচটা গোরুর গাড়ির প্রোসেশন করে

যদি এই চালু রাস্তা দিয়ে যাই, এইরকম একখানা মোটর নিয়ে তো পাগল বলে লোকে ঢিলিয়ে মারবে না? আর ওদেরই বা বলি কি করে? নেমে একটু সরে গিয়ে ডেকে বললাম—মোটরটা বিগড়ে গেছে হঠাৎ, টেনে নিয়ে যেতে হবে। এই চারখানা গাড়ি ঠিক হল, তিনটাকা করে রফা হয়েছে। এসে দেখি ঐ রকম কুপকাত হয়েছে। পর্দাগুলো টেনে এই স্টিয়ারিং ধরে বসে আছি। গেরো আর কাকে বলে?"

জিগ্যেস করলাম—"আর তো সাড়া নেই একেবারেই দেখছি; খুলে নিয়ে বেরিয়ে যান না তাড়াতাড়ি।"

"সাহস হয় না মশাই। ঐ যে মাথার মধ্যে ঢুকে বসে আছে—কিড্ন্যাপ করছি বলে চেঁচাবে—কে জানে ঝাঁকানির চোটে উঠে পড়ে যদি চেঁচিয়েই বসে···তাই ভাবছি এই কটা জায়গা পেরিয়েই যাক—একেবারে সেই সিরাকোল-শিবানীপুর পর্যন্ত, তারপর যা হয় একটা করা যাবে ভেবেচিন্তে। ····ভদ্রলোকের ছেলে মশাই, ভাবলাম ভালো ঘরে পাওয়া গেল চাকরি, তা দেখুন না নিগ্রহ, প্রোসেশন নিয়ে যাচ্ছি।···একটু আগে থাকতেই নেমে যান আপনি। দয়া করে আর ফাঁস করবেন না কথাটা, ভিড় জমে যাবে বাজারের মাঝখানে।"

নামতে নামতে দুঃখিতভাবে হেসে বললাম—"ফাঁস করবার কথা একটা?"

"তবু তো প্রোসেশনের গোড়ার দিকটা দেখেননি—গাড়োয়ানেরা যখন কোরাসে একটা মেঠো গান ধরেছিল···ফিরতির মুখে, হঠাৎ ফোকড়ে তিনটে করে টাকা এসে গেল ট্যাঁকে তো? আমিও এলে দিলাম, তখন মনটা আরও খিঁচড়ে রয়েছে তো, বললাম—তোর ব্যাণ্ড সুদ্ধুই প্রোসেশন চলুক তাহলে, অঙ্গহানি হয় কেন?···আচ্ছা নমস্কার।"

মোটরটা কাটিয়েই দেখি সর্বনাশ—সর্বনাশ! গাড়ি এসে গেছে ওদিকে। পা চালিয়ে দিলাম, তাতে না কুলোতে ছুটলামও, কিন্তু ততক্ষণ গাড়ি আমায় ছাড়িয়ে স্টেশনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, গিয়ে পৌছুবার আগেই ছেড়ে দিল। স্পীডও দিয়ে দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে, তবু উঠতে যাচ্ছিলাম,

স্টেশন মাস্টার মানা করলেন—"থাক্, এর পরের গাড়িটাও এসে পড়ল বলে, এটা অতিরিক্ত লেট যাচ্ছে কিনা আজ।"

প্রশ্ন করলাম—"কতক্ষণে আসছে পরেরটা?"

"চারটে সতেরো মিনিট টাইম।"

পাঞ্জাবির হাতাটা গুটিয়ে দেখলাম প্রায় তিন কোয়ার্টার দেরি।

দেখছি জীবনটা এগিয়ে চলে কনট্রাস্টের মধ্যে দিয়ে। একটু বেশি বাঙলা-বাঙলা বাই হয়েছে তোমাদের এই স্বাধীনতার মুখে, আমি কিন্তু কথাটার ঠিক প্রতিশব্দ হাতড়ে পাচ্ছি না আপাতত। জীবন-শিল্পী যিনি তিনি এই কনট্রাস্টের মধ্যে দিয়ে অনুভূতিগুলোকে বেশি করে ফুটিয়ে তোলেন। অন্তত দেখছি আমার জীবনে এই একটু বেশি—একটানা একভাব নেই; এই যে থিথিয়ে জিরিয়ে বলদ-গাড়ি-টানা মোটরে নিঝুম প্রোসেশনের গল্প শুনতে শুনতে খানিকটা ঝিমিয়ে পড়েছিলাম, এরপর আমায় খানিকটা তড়িঘড়ির মধ্যে ফেলা চাই-ই তার; এ গাড়িও ফেল করতে হল, তার নিদারুণ লজ্জাটুকু তো বোঝার ওপর শাকের আঁটি···ছোটা, নৈরাশ্য, লজ্জা সবটুকু মিলিয়ে বুকটা বেশ ধড়ফড় করছে। স্টেশনে গিয়ে বেঞ্চটায় বসলাম।

এখন একটার পিঠে একটি করে যে এই পঁয়তাল্লিশটি মিনিট, একে কাটানো যায় কি করে? আমাদের ওদিকে স্থানীয় হিন্দিতে একটা প্রবাদ আছে—যার গরম দুধে একেবারে ঠোঁট পুড়ে গেছে, সে ঘোলেও চুমুক দেয় ফুঁ দিয়ে দিয়েই। কতকটা সেইরকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে; বাজার দেখতে যাব কি, স্টেশনের বাইরে পা দিতে সাহস হচ্ছে না।

কিন্তু জীবন তো দোটানার খেলাই; কুষ্ঠিতে যে উগ্র রকম শনির যোগ চলেছে, নইলে এই বোশেখী রোদে বাড়ি থেকে টেনে আনে? মিনিট দুয়েক যেতে না যেতে পা সুড়সুড় করতে লাগল, তারপর পেট বললে আমার খিদে পেয়েছে, গলা বললে আমার তেষ্টা। আসল কথা কি জান? মানুষের নিজের কাছেও একটা চক্ষুলজ্জা আছে, একটা অন্যায়, ভুল বা বেহায়াপনার কাজ করতে হলে মনের কাছে একটা জবাবদিহি দিয়ে একটা

ভদ্রতা রক্ষা করতে হয়।···মন বললে—সত্যি নাকি? খিদে তেষ্টা তুই-ই? আহা, পাবার কথাই তো! তাহলে ওঠ।

ছাড়পত্র আদায় হল। বেরিয়ে পড়লাম স্টেশন থেকে।

বাঁ দিকে হাট, ডান দিকে টানা বাজার, বেশ অনেকগুলি দোকান, ছোটবড় ভালোমন্দয় মেশানো। রোদ একটু পড়ে আসার সঙ্গে চাঞ্চল্য জেগে উঠেছে আস্তে আস্তে। একটা অদ্ভুত ধরনের কৌতুক জেগে উঠছে মনে—একেবারে ষোল আনা বাঙলা দেশের একটা বাজার, পানবিড়িওয়ালা থেকে নিয়ে একেবারে ওপর পর্যন্ত সব বাঙালী, এ দৃশ্যটা প্রায় চোখে পড়ে না। আমাদের দেশে যাওয়া মানে কলকাতায় কটা দিন কাটিয়ে আসা; সেখানে, বোধহয় খাঁটি বিলেত আছে—চৌরঙ্গীতে খাঁটি দিল্লী, যোধপুর আছে বড়বাজার-চিৎপুর; এমনকি খাঁটি ক্যাণ্টনও আছে চীনেপটিতে; কিন্তু খাঁটি বাঙলা নেই কোনখানেই।

থাক, মেলা খাঁটি কথা বলাও নিরাপদ নয়। আসল ব্যাপার ত নয়। একটা জাত আস্তে আস্তে ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, এ দৃশ্য কল্যাণকর নয়, কারুর চোখেই কল্যাণকর বলে প্রতিভাত হওয়া উচিত নয়। জাত না বলে উপজাতিই বলি, কেননা সমগ্র ভারতবাসীই একটা জাত এই ধারণাটাই বড় এবং বলিষ্ঠ; অতীত ইতিহাস যাই বলুক, ভবিষ্যৎ ইতিহাস গড়বার পক্ষে এই ধারণাটাই বেশি অনুকূল, বিশেষ করে বর্তমান জগতে। সুতরাং বাঙালীকে উপজাতিই বলি, কিন্তু উপজাতি বলেই যে তার উবে গেলে ক্ষতি নেই একথাও তো বলা যায় না। বাঙালী সেই উবে যেতে বসেছে। একথাটা ইংরাজীতে বলতে গেলে Too true অর্থাৎ মর্মান্তিকভাবে সত্য এবং এর জন্যে যেমন বাঙলার তেমনি ভারতের অন্য সব উপজাতির চিন্তিত হওয়া উচিত। সেই চিন্তাটাই হচ্ছে আমাদের এক-জাতিত্ববোধের নিরিখ, যে পরিমাণে অন্যসব উপজাতিদের মধ্যে সে চিন্তাটার অভাব আছে, সেই পরিমাণে ঐ গলাভরা কথাটা ভুয়ো এবং সেই পরিমাণেই আমাদের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের এমারত তোলার মধ্যে মেকি মাল ঢুকে বসে থাকবে।

এই ফাঁকিবাজি একচোট হয়ে গেছে। সুতরাং সাবধান হয়ে এগুনো

ভালো। ধর্মের মতো পাকা মশলা—জাতির এমারত গড়তে এপর্যন্ত বোধহয় আর কিছু হয় নি; একসময় এই মশলা দিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষটাকে এক করবার চেষ্টা হয়েছিল, একটা ভাষাও তাতে করেছিল সাহায্য যার মতন ব্যাপক ভাষা ইংরেজীর আগে জগতে আর হয় নি। ভারতের ভৌগোলিক সংস্থানও এমন—ঘোরাঘোরা, আঁটসাঁট, নিরেট যে ষোল আনার ওপর আঠার আনা সফল হওয়ার কথা। কিন্তু হল না কিছুই? কেন?... ভেবে দেখতে হবে।

এবার যা পরীক্ষা তা ধর্মের ওপর নয়। একদিক দিয়ে ভালো, কেননা এবারকার পরীক্ষার যা Bedrock অর্থাৎ ভিত্তিপ্রস্তর সেটা বেশী প্রত্যক্ষ—অর্থাৎ সামষ্টিক স্বার্থ। ভালো কথা—দরকার কি ও মন্ত্র-তন্ত্রের হেঁয়ালীর? কিন্তু একটা কথা মনে রাখা তো দরকার। এই বেড্-রকটিকে খানিকটা করে আত্মত্যাগের আগুনে গলিয়ে গলিয়ে একটা তালে পরিণত করতে হবে, ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের Sedimentary rock না অগ্নি-গালিত একপিণ্ড—একটা Igneous Rock? Sediment অর্থাৎ স্তরের বালাই থাকলেই আবার সর্বনাশের গোড়া রয়ে গেল, চাপ পড়লেই ভেতরে চিড় খেয়ে যাবে। সে যে একের ছদ্মরূপে বহু-ই—খণ্ডিত, চূর্ণিত বহু-ই—

আমার মনে হয়, ভেতরের গলদের জন্যে একসময় বড় জিনিসটাই ফেল করে গেছে অর্থাৎ ধর্ম। সুতরাং হুঁশিয়ার হয়ে এগুনোই ভালো। ধর্মের একটা মস্ত বড় সুবিধা ছিল, তার নিজের ভিত্তিই ত্যাগের ওপর। স্বার্থের সেটা নেই—তা সেটাকে State (রাষ্ট্র), Society (সমাজ) Economy (অর্থনীতি), যে-নামেই অভিহিত কর না কেন।

যাক যা বলছিলাম, তবু এখানে জাতটাকে সমষ্টিগতভাবে দেখা যায় একটু।

কিন্তু কী করুণ দৃশ্য! দুর্বল কাঠামো, তার ওপর প্রায় বেশির ভাগই রোগ-জীর্ণ। কালো, কটা চামড়া তো প্রায় চোখেই পড়ে না, আর খর্ব। এইটে আমার সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। এই খর্বতা, বিশেষ করে নিম্ন-শ্রেণীদের মধ্যে, যাদের গায়ে খেটে খেতে হয়। খানিকটা আরও দক্ষিণে

পর্যন্ত যাওয়া আছে আমার, খর্বতা যেন ক্রমেই মাটির লেভেলে নেমে আসছে সব, এদিককার মাটি যেমন আসছে ক্রমে জলের লেভেলে নেমে। আমার মনে এইটেই অস্বস্তি জাগায় বেশি, সর্বরোগহর স্বরাজ পাওয়ার সঙ্গে না হয় আর সব হবে—স্বাস্থ্য আসবে, শক্তি আসবে, কিন্তু মারাত্মক Specific Gravity অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণের হাত থেকে এদের বাঁচানো যাবে কি করে?

এটা একটা জাতিগত চিন্তার কথা। কিন্তু যা পাচ্ছি সেটুকুও লাগছে বেশ, দোকানের সারির নিচেই যেখানে যেখানে ফাঁক পেয়েছে দিন-বেসাতীদের দল বসে গেছে—মেয়ে-পুরুষ ছোট-বড়, একজায়গায় মেয়ে, একজায়গায় পুরুষ, আবার মেশামেশি করেও,—আম, জাম, শাক, এঁচোড়, বড়ি, দড়ি, চাল, মুড়ি, বিচি, পাঁপড়, ফুলুরি—রকমারি কাণ্ড, রাস্তার দু সারি চলে গেছে, খদ্দের উঠছে আস্তে আস্তে জমে।… "পয়সার দুটো করে · না, তার বেশি হবে নি। জামরুল কি রকম দেখতে হবে তো…তোমাদের গেরামে গোরুতেও খায় না?—তা যাও তাহলে; গোরুর চেয়ে খাটো হতে যাবে কেন গো?" —মেয়ে-ছেলে, বেটাছেলেদের মুখে এত চাঁচাছোলা উত্তর যোগায় না টপ করে। লোকটা চলে যেতে আমি দুপয়সার নিলাম, তেষ্টা পেয়েছে, আর দিব্যি টুলটুলে ফলগুলি, এক-একটি বড় বড় মুক্ত যেন; তবে দর করতে সাহস হল না আর।

মুখের দিকে একবার চাইলে, প্রশ্ন করলে—"বামুন?"

"হ্যাঁ।"

বেশ বড় দেখে বেছে বেছে পাঁচটি তুললে, কপালে ঠেকিয়ে বাড়িয়ে ধরে বললে—"গড় করি, বামুনের হাতে বৌনি, বিকুবেই—তা তোরা যতই বৌনি ভেঙে যা না কেন? যত সব অযাত্রা! বলুন কেন বাবাঠাকুর, এ জামরুল চারটে করে দেওয়া চলে?…ন্যাও, আর একটা বাবাঠাকুর—পায়ের ধূলো দিয়েছ গাদার সামনে…"

"থাক, আর আমার দরকার হবে না, একটু তেষ্টা মেরে নেওয়া শুধু, একলা তো মানুষ।"

"তুমি ন্যাও, হাত তুলেছি বামুনের দিকে। না হয় গোরু-ছাগলের মুখে ফেলে দিও।"

হেসে বললাম—"লোকসান করব কেন? মনে কর, নিলামই, আবার আশীর্বাদ বলে ফিরিয়ে দিলাম।"

"তা যদি বলছ তো থাক্। ও বাবা! বামুনের আশীর্বাদ—শিরোধার্য্য। শিরোধার্য্য।"

—কপালে ফলটি ঠেকিয়ে আলাদা করে রেখে দিল। ক-পা গিয়ে কি মনে হতে ঘুরে দেখি দুটি খদ্দের এসে দাঁড়িয়েছে, এক আঁচলা ফল তুলে ধরেছে মেয়েলোকটি। চোখোচোখি হয়ে গেল, একটি কৃতজ্ঞতার হাসি, ব্রাহ্মণ এসে সদ্য ফল দিয়ে গেল কিনা।

যত ফাঁকিই থাক না, সদ্য সদ্য তখনকার জন্যে ঐটুকু যে তখন একটা পরম সত্য; ওর পক্ষে তো বটেই, আমার মনেও একটা অদ্ভুত ধরনের আত্মচেতনা জেগে উঠেছে,—কে জানে, আমি কলির ব্রাহ্মণ কিছুই না হই, কিন্তু গোত্রপিতা ভরদ্বাজ ঋষি তো কালজয়ীই।

অন্তত মনটি বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। ছোট একটি ঘটনা, কিন্তু হঠাৎ দার্শনিক করে তুলেছে কেমন যেন; ভাবছি—যদি ঠিক এমনিটি হয়ে যেত বরাবর—ভবের হাটে শেষ বেচা-কেনাটুকু সারার সঙ্গে এই প্রীতি, এই রকম একটি কৃতজ্ঞ হাসি নিয়ে যেতে পারতাম সাথে করে!

ভগবান, অন্তত দেওয়ার সঙ্গে যেন থাকে এই রকম একটি প্রণাম, আর তা আশীর্বাদের সঙ্গেই ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়ার এই ক্ষমতাটুকু থাকে যেন অটুট।

জামরুল কটা বড় মিষ্টি, মনে পড়ে না এত মিষ্টি জামরুল খেয়েছি কখনও।

ডানদিকে "রয়াল সেলুনে" চুল ছাঁটা হচ্ছে। একটা লিকলিকে ঘাড়, কান থেকে নিয়ে কান পর্যন্ত নিচের দিকে সমস্তটা ক্ষুর বুলিয়ে দিয়েছে, এবার মিলুবে, কাঁচি হাতে তুলে তুলে তারই পাঁয়তাড়া ভাঁজছে, একবার এদিকে ঝুঁকে দেখে, একবার ওদিকে ঝুঁকে দেখে। মাথায় স্বত্বাধিকারী অসীম ধৈর্যে সামনের দিকে মাথাটা হেঁট করে বসে আছে। একেবারে পনের আনা ছাঁটের ব্যবস্থা। আশ্চর্য হই, কুৎসিত হবার জন্যেও মানুষের কি অনন্ত তপস্যা!

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম—হুঁশ নেই যে দাঁড়িয়ে পড়েছি, এক ছোকরা

দোকানের ভেতর থেকে দরজায় এসে দাঁড়াল; হাতে কাঁচি, খচ-খচ করে দুবার হাওয়ায় চালিয়ে প্রশ্ন করল—"ছাঁটাবেন? আসুন না ভেতরে।"

হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে পড়েছি,—বললাম—"না···এমনি দাঁড়িয়ে আছি।"

"আসুন, খালি আছে একটা চেয়ার।"

বললাম—"না, চুল ছাঁটাবার ইচ্ছে নেই।"

একটু হেসে বললে—"সন্দেহ হচ্ছে? একটা টেরায়েল্ই দিয়ে দেখুন না।"

কি মতিচ্ছন্ন ধরল, ফ্যাশানের ওপর আক্রোশবশেই মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—"ট্রায়েল তো ঐ দেখছিই বাপু চোখের সামনে।"

ফিরে একবার চাঁচা ঘাড়টার দিকে চেয়ে নিয়ে চৌকাঠের এদিকে এসে দাঁড়াল হাসি মুখেই; বললে—"আজ্ঞে, ও তো এই আরম্ভ হল মোটে, ফিনিস্টা দেখে আপনিই ত্যাখন সার্টিফিটি দিয়ে দেবেন, নিজের হাতে; আসুন দয়া করে।····কাদার তাল চটকানো দেখে, পিতিমেটা কি দাড়াবে বলতে পারেন না তো।"—বিজ্ঞভাবে হাসল।

গুটিতিনেক লোক দাঁড়িয়ে গেছে।

বললাম—"না বাপু, ট্রায়েল—ও একটা কথার কথা বলছিলাম—সদর-বাজারে দোকান ফেঁদেছ, খারাপ ছাঁটতে যাবে কেন? তবে আমার ছাঁটবার দরকার নেই, এমনি এসেছিলাম একটু বাজারে—অন্য একটা দরকারে।"

"তা একটা দরকারে এসে কি আর একটা কাজ করে না লোকে? জুতো কিনতে এসে তো পাঁপড়টাও নিয়ে যাচ্ছে হাতে করে।···দিনই না পায়ের ধুলো। নতুন সেলুনটা খুললুম—আপনাদের পাঁচজনের ভরসায়।"

উত্তর না দিয়ে ঘুরে পা বাড়াতে যাব, একটি লোকের সঙ্গে প্রায় ঠোকাঠুকি হবার দাখিল, বাঁ হাতে নিজের চিবুকটা ঘষতে ঘষতে হন্তদন্ত হয়ে আসছে, বললে—"নাও তো, একবার চেঁচে দাও দাড়িটুকুন, দোকান খুলে ছেলেটাকে বস্তে এসেছি, একটু চট করে···

"একটু ঘুরে আসুন দাদা, হাতে খদ্দের, এই যে এই বাবু।"

লোকটা আমার মুখের দিকে চাইলে, তারপর আমার প্রায় সমান করে

ছাঁটা বড় বড় চুলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে—"ও আপনি ছাঁটাবেন ? তা যান। আমি ঘুরে আসছি গো, আর লোক নিউনি।"

আমি তাকেই বললাম—"না তুমি কামিয়ে নাও, আমি চুল কাটাতে আসিনি।"

"খেউরি হবেন ?"

"না।"

"তবে ?"—আমার মুখের দিকেও চাইলে, ছোকরার মুখের দিকেও চাইলে। সে বললে—

"আসছিলেন ছাঁটাতেই, কেমন করে সন্দে। লেগে গেছে আমরা ছাঁটতে জানি না—আনাড়ি, তাই বলছিনু, একবার দেখুনই দয়া করে…"

লোকটা পাতলা ডিগডিগে, মুখটা সরু, আমসির মতো, আমার দিকে চেয়ে একহাত জিভ বের করে মাথাটা দুলিয়ে বললে—"আরে না না, ও কি কথা! এখেনকার লোক নয় বুঝি আপনি ? এস্পাট ছেলে—দুই ভাই-ই নিভ্‌ভরসায় যান আপনি…আমরা জানি কিনা…দিন গেলে এমন বোধ হয় তিরিশখানা মাথা সাবড়ে দিচ্ছে দুই ভেয়ে, নিভ্‌ভরসায় সেঁদিয়ে যান।"

খড়ম পরে এসেছিল, খটখট করতে করতে চলে গেল।

কিছুই নয়, অথচ ব্যাপারটা এমন ঘোরালো হয়ে উঠেছে যে কি করে যে পরিত্রাণ পাব যেন হদিস পাচ্ছি না। স্রোতের মুখে দুটো কুটো একত্র হলেই তার গায়ে আর পাঁচটা এসে লাগে, প্রায় সাত আটজন লোক জমা হয়ে উঠেছে, প্রশ্ন-মন্তব্য আরম্ভ হয়েছে একটু একটু, বেশিভাগই ওদের স্বপক্ষে। একজন তবু আমার হয়ে বললে—"তা ওঁর য্যাখন্ রয়েছে খুঁতখুঁতুনি ত্যাখন যেতে দেও না।"

ছোকরা চৌকাঠে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, খিঁচিয়ে উঠল তার দিকে চেয়ে—"আরে,—'যেতে দেও না'! ওঁকে ধরে রেখেছেটা কে ?…তবে, সচোক্ষে তো দেখলেন একটা খদ্দের হাতছাড়া করলুম ওনার খাতিরে…বলে 'যেতে দাও না !'—কে যেন পাকড়ে রেখেছে !"

তুমি ভাবছ বোধ হয় বেরিয়েই এলাম না কেন, সত্যিই তো কেউ

পাকড়ে রাখে নি। এখন আমিও তাই ভাবি, কিন্তু তখন সত্যিই যেন কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গিয়েছিলাম—ঠিক এ ধরনের অবস্থায় তো পড়া অভ্যেস নেই, তায় বিদেশ বিভূঁই জায়গা, যে ব্যাপারটা অযথাই এতটা জটিল হয়ে উঠল, সেটা আরও কতটা হয়ে যেতে পারে কে জানে?—এখন তো একটা কেসও খাড়া করে ফেলেছে, নিজের স্বপক্ষে—ঢুকছিলাম—সন্দেহের বশে দাঁড়িয়ে গেছি—ওর খদ্দেরও লোকসান করেছি একটা।

আর একটা গেল। চুল ছাঁটাবার খদ্দের, ওই ভাগিয়ে দিলে—বললে—"না, এখানে চুল ছাঁটা হয় না, ভুটো অনাড়ি জোচ্চোর সেলুন ফেঁদে বসেচে। যাও।"—মুখটা থমথমে হয়ে এসেছে।

সেলুনটা লম্বালম্বি ভেতরের দিকে চলে গিয়েছে খানিকটা। যে চুল ছাঁটছিল, সে এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি, এমনকি ফিরেও দেখেনি, নিজের মনে কাজ করে যাচ্ছিল। উদ্দেশ্য হয়তো সেলুনের আভিজাত্য রক্ষা করা—কাজের সময় কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে খেয়াল করে না, কিম্বা হয়তো ফিনিস করেই একটা নমুনা আমার সামনে দাঁড় করাবে, দ্বিতীয় খদ্দেরটা চলে যেতে কিন্তু কাঁচিটা আঙুলে করেই বেরিয়ে এল। এই বড়, মুখটা খুব গম্ভীর, তার মানে প্রত্যেকটি কথা শুনেছে, যখন আর ধৈর্য রাখা সম্ভব হল না, বেরিয়ে এসেছে।

কিন্তু অন্যরকম ভাব, অন্তত বাইরে তো নিশ্চয়। কাঁচিসুদ্ধ হাত তুলে একটা প্রণাম করলে আমায়, প্রশ্ন করলে—"কি দরকার স্যার, বলুন দয়া করে।"

ভাই-ই উত্তর দিলে—"চুল ছাঁটাবেন, তা হঠাৎ সন্দো হতে··"

কষে এক ধমক—"তুই চুপ দে রাস্কেল! খদ্দেরের সঙ্গে কথা কইতে জানিস না। ভদ্র-ইতর চেনবার খ্যামতা নেই, হাটের মাঝে দোকান ফেঁদেছে। তুই যা ভেতরে, ফিনিস দিয়ে দিগে; গেলি?"

একেবারে খাদে গলা নামিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললে—"কি বলুন?" বিপদ একেবারে নবমূর্তিতে, বললাম—"বলবার তো কিছুই নেই ভাই, এই দিক দিয়ে যেতে যেতে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম, তোমার ভাই ভাবলে··"

শেষ করতে না দিয়েই বিনীতভাবে হেসে বললে—"ওটার কথা বাদ দিন।...কি জানেন?—রেধো-মেধো তারা যায় যাক্‌, একজন ভদ্দরলোক যদি এগিয়ে এসে সন্দোর বশে আবার ফিরে যান তো দোকান উটে দিতে হয়। একটা বদনামের কথা হয়ে গেল কিনা। আপনারা হচ্ছেন অ্যাড্‌-ভারটাইজমেন্ট আমাদের—এই তো দেখছেন কি ধরনের খদ্দের সব, পাই কটা আপনাদের মতন সন না।—হপ্তায় দুটো কি তিনটে মাথা· ·আসুন দয়া করে। আমি নিজে ধরছি—ওকে ওদিকে দিয়ে দিলাম, দেখতেই পেলেন।"

এ লোকটিকে আরও ত্যাঁদড় বলে মনে হচ্ছে; বেশ গরম মেজাজটাকে ঠাণ্ডা করে নিয়ে যে রকম গোড়া বেঁধে কাজ করছে; মনে হল ঢুকেই পড়ি। কেমন একটা বিরক্তিও ধরে এসেছে, আর ভালোও লাগে না পথের মাঝ-খানে দাঁড়িয়ে এই জটলা। না হয় বললেই হবে একটু ভদ্রভাবে ছেঁটে দাও!

ঢুকেই পড়তাম, বিঘোরে পড়ে উজবুক সেজে ফিরতেই হত বাড়ি (ও ক্যারদানি ছাড়ত না কোনমতেই, অ্যাডভারটাইজমেন্ট যে!), কিন্তু এই সময় ভেতরে হঠাৎ একটা গোলমাল উঠল—

"তার মানে? সে কখনও হতে দেব না।"

"আলবত দেবে, তোমার কাজ নিয়ে কাজ, ফিনিস খারাপ হয় ত্যাখন বোলো।"

"ত্যাখন বোলো,—আবদার!"

—উঠে এগিয়ে এসেছে খদ্দেরটা; মাথার পেছনটা মেলানো, খানিকটা আভাঙা, সামনেটা একেবারে কাঁচি ছোঁয়ানো হয়নি, চুলগুলো কপাল-কান সব ঢেকে ফেলেছে, ঝাড়নটা বুক-পিঠে ঢেকে গলায় আটকানো, কোমর পর্যন্ত এসেছে নেমে। রোগামানুষ, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বড়টাকে উদ্দেশ্য করে বললে—"আবদার পেয়েছ? এক ভাই ক্ষুর চালাবে, এক ভাই কাঁচি, —নেউকিদের সম্পত্তি ভাগ—খুড়ো নিলে দুধেল গাই, ভাইপো নিলে বাছুর —চলবেনি এ ব্যাবোস্তা—যার সঙ্গে ফুরন হয়েচে, যে মোয়াড়া ধরেচে তাকেই ফিনিস করে দিতে হবে—ও চলবে নি, যে খদ্দেরের সঙ্গে শখ করে বিতণ্ডা নাগাতে গেছে সে নিজে এসে রফা করুক; তুমি এস, ফিনিস করে

দিতে হবে—ঘাড়ে সুড়সুড়ি লেগে ঢুল এয়েচে একটু মশাই!—হঠাৎ খালি কেন?—ওমা, চোখ মেলে দেখি আলাদা এক মূর্তি কাঁচি নে ধিনিকাত্তিকের মতন দাঁইড়ে রয়েছেন, নাও · এস ফিনিস কর ভালো মানুষটির মতন…”

ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম, বড়টা ওপরেই অমনি, ভেতরে রগচটা। শান্ত দৃষ্টিতে একঠায় চেয়ে চেয়ে শুনছিল, হঠাৎ লাফিয়ে ছুটে গিয়ে খদ্দেরের ঘাড়টা ধরে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল—

“নেকালো!—আভি নেকালো আমার সেলুন থেকে—আরাম করে ঢোলবার জায়গা পেয়েছ? এক রদ্দায় সাতপুরুষ পজ্জন্ত ঘুম ছাড়িয়ে দোব —ফুরন দেখাতে এয়েচ!—নেই ফিনিস করেঙ্গা—নেকালো এখান থেকে!”

বেশ ভিড় জমে গেছে। ব্যাপারটা একটু অতর্কিতে বলে খদ্দেরটা বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল, ঠেলে নামিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু থমকে ঘুরে দাঁড়াল, তারপরেই একটা লাফ দিয়েই উঠে পড়ে এক ছুটে গিয়ে হাতল ধরে চেয়ারটায় চেপে বসল।

একটা তুমুল হট্টগোল পড়ে গেল—দুই ভাইয়ে ভেতরে সেঁদিয়ে গেছে—“নেকালো!”

শ্রাদ্ধটা কতদূর গড়াল জানি না। দরজার মুখে চাপ ভিড়, হাঙ্গামাটার গোড়াপত্তনে যারা ছিল, আমায় দেখেছিল, তারা সব ওদিকেই; আমি আর দেরি না করে ছাতাটা আড়াল দিয়ে পা চালিয়ে দিলাম। পাশেই মেছো-হাটার গলিটা; আর সদর রাস্তার দিকে না গিয়ে তার মধ্যেই ঢুকে পড়লাম। মনে হল একটু দেখে নি; কিন্তু আর লোভ করলাম না। একটা সরু রাস্তা ধরে, কারুর ডোবার ধার দিয়ে, কারুর উঠানের ওপর দিয়ে সব শেষে একটা বাঁশের নড়বড়ে পুল পেরিয়ে একেবারে বড় রাস্তায় এসে উঠলাম। আর স্টেশনের দিকেও না, একটা বাস আসছিল ডায়মণ্ডহারবারের দিকের, তাইতে উঠে পড়লাম।

সামান্য একটু অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়ানো—তাতেই কোথা থেকে কি হয়ে গেল! বিচিত্র এই জগতে আত্মসমাহিত আর সাবধান হয়ে থাকতে পারেই বা কতক্ষণ লোকে? মনটা খিঁচড়ে রয়েছে। বেশ খিদেও পেয়েছে ঘোরাঘুরি

করে। যাবার সময় তেমাথার ওপরই ময়রার দোকানে রসগোল্লা তয়ের হচ্ছিল—বড় একটা কড়ায় সাঞ্ঝা দিয়ে রসের মধ্যে চেপে ধরছে, থাকে কখনও?—চারিদিক দিয়ে ঠেলে ঠেলে তুলে তুলে ভেসে উঠছে মাল—শাদা ধরনের ধবধবে, নধরকান্তি—লোভ সংবরণ করে ঠিক করেছিলাম একটু দেখে শুনে বেড়িয়ে আরও খিদেটা চনমনে করে নিয়ে আসি।

আশাতীত চনমনে হয়েছে খিদে—আশাতীত ঘোরাঘুরিও হল তো? —তার ওপর উৎকণ্ঠা; কিন্তু হা রসগোল্লা! তুমি কোথায়?

আসল কথা কি জান?—লোভ সংবরণ করাটাও একটা পাপ অনেক সময়। সেই শেয়ালটার গল্প মনে আছে? মানুষের লাশ, হরিণ, শুয়োর, নিদেন মড় সাপটাই না হয় খেয়ে ফেল, হতভাগা হঠাৎ মিতাচারী আর সংযমী হয়ে ঠিক করলে—অগ্র ভক্ষ্য ধনুর্গুণ। বিঘোরে প্রাণটা দিলে; পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাতে হাতে।

নাড়ি জ্বলছে অনুশোচনায় আরও বেশি করেই,—ধনুকের ছিলেও যদি পাওয়া যায় খানিকটা!

কিন্তু চলা পথে মলা জমতে পায় না। বসে সবে রোমন্থন করলেই আইডিয়াগুলো মনের গাঁটে গাঁটে জমা হয়ে 'রিউম্যাটিজম্' ঘটায় (আমি সে ভদ্রলোকের কথাটা ভুলতে পারছি না)। আমতলাটা পেরিয়ে যেতে রয়াল সেলুনও ঘাড় থেকে আস্তে আস্তে নেমে গেল। আগেই বলেছি বাসটা ছিল ডায়মণ্ডহারবারমুখো, (অবশ্য কলকাতামুখো হলেও আপত্তি ছিল না) এগিয়েই চলেছি। আবার সেই মিষ্টি পথ, দুদিকের নিঃসীম শ্যামলতার গা চিরে। অভদ্র রকমের ভিড় নেই, জানালার ধারে একটি ভালো জায়গা পেয়েছি, পূব দিকটাতেই। আমার সেই কনট্রাস্ট,—বিধাতা একটা উৎকট ঝাঁকানি দিয়ে গায়ে আবার মিষ্টি করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।···রোদের তাত কমে এসেছে, সেই অনুপাতে হাওয়াটাও হয়ে এসেছে মোলায়েম, পালিশ-করা রাস্তার ওপর দিয়ে বাসটা ছুটে চলেছে, একটু দোলা লাগে না গায়ে। আর কিছু দরকার নেই আমার, শুধু এই রকম করে এগিয়ে যেতে দাও—দাও এইরকম একটা যতিহীন সচলতা, তাতেই সব গ্লানি ধুয়ে মুছে যাবে'খন।

কণ্ডাক্টার এসে দাঁড়াল। আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেছি, এবার একটি নিশ্চিন্ত তৃপ্তির মধ্যে, জিগ্যেস করলাম—"কি চাই ?"

অর্থাৎ "বরং ক্রহি !"···আমি যে চাওয়ার বেশি পেয়েছি, তাই মনটা দেওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

পাশের দুটি লোক ফিরে তাকালে আমার মুখের দিকে, ততক্ষণে হুঁশও হয়েছে, জিগ্যেস করলাম—"ও কণ্ডাক্টার বুঝি ?"

—শুধু একটু সামলে নেবার চেষ্টা, কেননা লোকটার কণ্ডাক্টারত্ব সম্বন্ধে এতটুকু কোথাও সন্দেহের অবকাশ নেই।

পকেটে হাতটা দেওয়াই ছিল, একটা আট আনি বের করে বললাম—"সিরাকোল।"

সেটা কতদূর ধারণা নেই। মাঝেরহাটে টাইম টেবিলে চোখ বুলিয়ে যাবার সময় পৈলানের পর ওই নামটাই নতুন ঠেকেছিল—কয়েকবার জড়িয়ে গিয়েছিল জিভে, খপ করে মনে পড়ে গেল।

বিধি এখন সদয়। সিরাকোল সেই স্টেশন যার পরেই কলতা লাইন ডায়মণ্ডহারবার রোড ডিঙিয়ে একেবারে পশ্চিমমুখো হল, তার মানে এ রাস্তার সঙ্গে আর যতটুকু সম্বন্ধ প্রায় ততটুকুরই টিকিট নিয়েছি, স্টেশনের কাছে গিয়ে নেমে পড়লাম।

একটা কথা ছেড়ে গেল, আমতলা হাট থেকে খানিকটা এসেই সেই রায় বাড়ির জামাইয়ের প্রসেশনটা রাস্তায় পড়ল—সেই চারটি নিরুদ্বেগ গরুর গাড়ি, শফার নির্লিপ্তভাবে স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে। বাস আমাদের সসম্ভ্রমে পাশ কাটিয়ে গেল। ঘুরে একটু গলা বাড়িয়ে দেখলাম—জামাইবাবু গদি থেকে আরও যেন খানিকটা ঝুলে পড়েছেন। এক ধরনের তুরীয় অবস্থা।

বড় স্টেশন সিরাকোল ঘোলসাপুরের পরেই। বেশ খানিকটা ইয়ার্ড, লাইনটাও রাস্তা ছেড়ে খানিকটা ভেতর দিকে চলে গেছে; ইঞ্জিন জল নেবে তার জন্যে একটা জলস্তম্ভ। একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, স্টেশন বলে শ্রদ্ধা হয়।

ঘরের মধ্যে গিয়ে মাস্টারমশাইকে প্রশ্ন করলাম, গাড়িটার আর কত দেরি। একটা লম্বা খাতায় টাকা-আনা-পাইয়ের ঠিক দিচ্ছিলেন—বহর দেখে মনে

হোল ষান্মাসিক বা সাল-তামামি। তর্জনীটা একটা সংখ্যার সামনে টিপে রেখে, ঘুরে একটু অন্যমনস্কভাবে বললেন—"বেরিয়ে গেল যে?"

"বেরিয়ে গেছে! কতক্ষণ?"

"এ-ই আপনার গিয়ে—"

ঘড়ির দিকে চেয়ে নিয়ে শেষ করলেন—"মিনি—ট দশ; ঠিক দশ মিনিট হল।"

"এর পরেরটা?"—

না ফিরে বাঁ হাতটা একটু উঁচু করে অপেক্ষা করতে ইশারা করলেন; তর্জনীটা আবার ওপরে উঠে গেছে, আঁকে যেমন চটপটে, নেমে আসতে দেরি হবে। যদি গুলিয়ে যান তো চটতেও পারেন। আমতলা হাটের পর আর অযথা কথা কাটাকাটি করার উৎসাহ নেই; বেরিয়ে এলাম।

এত দমে গেছি হিসেব করে দেখবারও অবকাশ হল না, আস্তে আস্তে গিয়ে বাইরের বেঞ্চটায় বসে পড়লাম। এ যে দেখছি, গাড়ি ফেল করবার মরশুম পড়ে গেছে। এখন করা যায় কি?

করার মধ্যে এটা ঠিক যে, ফলতা আজকের মত বাতিল করতে হল। দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা অন্তর গাড়ি, পরেরটা এখানে এসে পৌঁছতেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

ফেরাই সাব্যস্ত। নিরুদ্দেশের যাত্রা, টিকিট কিনেছি বলেই যে ফলতার হাতে মাথা বিকিয়ে দিয়েছি এমন কথা নয়। বাসে ডায়মণ্ডহারবারের দিকেও খানিকটা চলে যাওয়া যায়, কিন্তু কেমন যেন উৎসাহ পাচ্ছি না। রেলের লাইনটা যেখানে রাস্তার ওপর যুগ্ম রেখা টেনে ডাইনের দিকে ঘুরে গেছে, সেইখানেই আমার আজকের গতিপথেরও পূর্ণচ্ছেদ টানা হয়ে গেছে যেন।

এও এক অদ্ভুত খেয়াল মনের। আগে এক জায়গায় তোমায় বলে থাকব, আমার এই অভিযানের যে মুক্তি তা অন্য ধরনের—বাধা হয়ে যা মনে উদয় হবে, তাকে যে সব সময় কাটিয়েই ওঠবার জন্যে প্রাণপণ করব তা নয়। যখন খুশি তখন করব প্রাণপণ, যখন খুশি, তখন করব না—এই যেমন খুশি তেমনি করার মুক্তিই তো আসল মুক্তি; একটু যদি নিয়মই বেঁধে ফেললাম যে না

ভয়, না মোহ—কোনটার হাতেই আত্মসমর্পণ করব না তো সে নিয়মই তো একটা নিগড়।

আর বৈচিত্র্যও তো এই মুক্তিতেই—যে বৈচিত্র্যের অপর নাম জীবন—Varicty is life· ·মাঝে মাঝে কখনও রাঙা চোখ কষায়িত করে বধুর অশ্রু বের করে আনতে হবে, আবার নিজের অশ্রু দিয়েও শ্রীচরণের রাঙা আলতা দিতে হবে ধুয়ে।

বাধার সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ।

বলবে, তুলনাটা ঠিক হল না,—বধূ তো বাধা নয়।····

নয় কেমন করে?—বন্ধনই তো।

ঐ পূর্ণচ্ছেদটা রূপান্তরে একটা মায়া। মায়া পড়ে গেছে আজ আমার ফলতা রেলের ঐ এক জোড়া লাইনের ওপর। আজ আমার ওর সঙ্গে মন বাঁধা হয়ে গেছে, কেমন করে, ও মুখটা ঘুরিয়ে চলে যাবে ডাইনে, আমি ওকেই অতিক্রম করে বেরিয়ে যাব সোজা, এ চলবে না। এ যেন হবে এক ধরনের—যার পরঘর আমারই আঙিনা দিয়া···বড় নিদারুণ।

আজ ফিরি, আবার একদিন আসা যাবে।

ফিরতে কিন্তু বাস, আর রেল নয়। রেলের বোধ হয় বিলম্ব আছে, তা ভিন্ন রেলে বিলম্বও। বাড়ি ফেরাটা বেড়ানো নয়, সেটা নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া, স্থতরাং তাতে সময়েরও করা চাই সঙ্কোচ; বেড়ানো হচ্ছে নিজেকে প্রসারিত করে দেওয়া, তার সামনে রয়েছে অনন্ত, স্থতরাং সময়েরও একটা অন্ত বেঁধে নিয়ে এগুলে চলে না।

কিন্তু বাসেই যদি ফিরি তো তাড়াতাড়িটা কিসের এখন?—ঘুরে ফিরে জায়গাটা একটু দেখে আসা যাক না। একটা কিছু ঠিক করে ফেলার পর এখন আর সে অবসাদটা নেই।

উঠে বারান্দার ধারে এসে একবার চোখ তুলে চারিদিকটা দেখে নিলাম। জায়গাটা একটু নতুন ধরনের—যা এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি; রাস্তার উল্টো দিকটায় স্টেশন থেকে পোটাক তফাতে একটা নতুন বসতি গড়ে উঠেছে। একেবারে নতুন বলে গাছপালার ভিড় লাগেনি—বড় বা আগাছা, কোনরকমেরই।

সখেরবাজার ঠাকুরপুকুর থেকে আলাদা তো বটেই, উদয়রামপুর—আমতলারহাট থেকেও অন্য ধরনের। অনেকটা আমাদের ওদিককার মতো—খোলা, খটখটে, একটু এগুতে না এগুতেই দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়তে হচ্ছে না, এখান থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত সমস্তটুকু স্বচ্ছ আকাশের নিচে ঝলমল করছে। আকাশের গায়ে একখানি যেন ছবি টাঙানো রয়েছে।

আবার টানছে আমায়, নেমে পড়লাম। আমতলার হাটের 'রয়াল সেলুন' ভুলে গেছে; সারা ছুনিয়া কি 'রয়াল সেলুনেই' থাকবে ভয়াল হয়ে? উজিয়ে যেতে হল খানিকটা; তার পরেই ডাইনে রাস্তাটা গেছে বেরিয়ে।

বেশ চওড়া নতুন রাস্তা, পাকা; বড় রাস্তার মত পিচ নেই, তবে বেশ ভালো করে রোল করা। খানিকটা গিয়েই দুধারে যে দোকানের সারি আরম্ভ হয়েছে, সেটা অনেক দূর পর্যন্ত গেছে চলে, আর রাস্তাটা গেছে সেসব ছাড়িয়ে টানা ওদিক পানে বেরিয়ে, দেখলেই মনে হয়, বহু দূরের পাল্লা।

কেমন একটা নতুন-নতুন ভাব এসেছে জায়গাটার মধ্যে, একটা freshness, যার জন্যে একটু অভিভূত হয়ে পড়েছি। নবজন্মের একটা বিস্ময় আছে, নতুন একটা শিল্পই হোক, নতুন ছবি বা নতুন একটা নগরীই। তার নতুন রূপ নিয়ে ধরাপৃষ্ঠে সে যে একটা রূপান্তর ঘটালে শুধু তাই নয়, তার হয়ে-ওঠা এখনও পূর্ণ হয়নি, সুতরাং তার চারিদিকে কল্পনার থাকে পূর্ণ অবকাশ। দেখতে দেখতে আর সেই দেখার ওপর গড়তে গড়তে এগিয়ে চললাম। আমার অবসরও প্রচুর এখন, এমন নয় যে, উদয়রামপুরের মতো ফলতা মেল হুইসিল মারলেই ছুটতে হবে, কি আমতলার হাটের মতো সেই ফলতা মেল পেছনে আসছে ছুটে—তাড়াতাড়ি গিয়ে হাজির হতে হবে। আধ ঘণ্টা অন্তর বাস, অন্তত ছুটো আধ ঘণ্টা তো অনায়াসেই হাতে রাখা যায়।

যেখানে নতুন রাস্তাটা ডায়মণ্ডহারবার রোড থেকে বেরিয়েছে, সেখানে বাঁদিকে ছোট একটি পুল আর তার পাশেই গুটি তিন-চার দোকান, প্রথমটি মুদিখানা। এখানে এসে আমার গতিটা একটু মন্থর করতে হল। হারমোনিয়াম বাজিয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত হচ্ছে, সেও আবার এ জায়গার পক্ষে একটু নতুন ধরনের: 'খর বায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে'…। রাস্তাটা

যে ভেঙে বেরিয়েছে, ঠিক তার বাঁ কোণটিতে একটা ছোট্ট ঘর, দোতলা। ঘরও বলতে হল, দোতলাও বলতে হল, কিন্তু নিয়মমতো ধরতে গেলে তার কিছুই নয়। নিচের ঘরের সামনের দিকটা রাস্তার সমতলে, বাকি মেঝেটা পিল্লের আর খুঁটির ওপর বসানো, রাস্তাটা যে আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে গেছে, সেইখান থেকে তোলা, মেঝের নিচে ফাঁকা জায়গাটায় আগাছার জঙ্গল। সমস্ত ঘরটিই ওপর পর্যন্ত ইট আর কাঠ-কাঠরা দিয়ে তৈরী।— লম্বে-প্রস্থে চার-পাচ হাত হবে। একটা যেন খেলাঘরই। ওপর-নিচে মিলিয়েও একটা মাপিকসই একতলার মত উঁচু নয়।

নিচেটা বিড়ির দোকান, পাশ দিয়ে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে কাঠের, তাই দিয়ে মাথা নিচু করে দোতলায় গিয়ে পৌছুতে হবে।

সেই দোতলা থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বেরিয়ে আসছে।

নতুন ধরনের এইজন্যে বলছি যে, ঠিক এক গলায় একটানা সঙ্গীত নয়, সঙ্গীতের শিক্ষকতা, একজন বেটাছেলে—গলাটা দিব্যি চাঁচা, ভরাট—একটি ছোট মেয়েকে শেখাচ্ছে।

জিগ্যেস করতে দোকানী বললে—"গানের ইস্কুল, কেন সাইনবোর্ড তো টাঙানো রয়েছে, একটু উদিকপানে গেলেই ঠাওর হবে।"

কাছের গ্রামেরই একটি ছেলে, বাইরে থেকে শিখে এসে স্কুলটি ফেঁদেছে।

বড় অদ্ভুত লাগছে; এখানে মিউজিক স্কুল! সিরাকোল জন্মাল তো একেবারেই আধুনিক হয়ে জন্মাল! আরও একটা কথা, যে জন্যে আমি হয়ে পড়েছি বেশি অভিভূত—এইখানে রাস্তার এই কোণটিতে দুটি বাংলা একটি গানের সেতুতে যেন এক হয়ে গেছে—নোবেল-লরিয়েট রবীন্দ্রনাথের বাংলা কালচারের উত্তুঙ্গ শীর্ষে অধিষ্ঠিত, আর পল্লী মায়ের অঞ্চলাশ্রিত মেঠো বাংলা। এ সমন্বয় স্বপ্নেই আছে, সাহিত্যিক-সাংবাদিক-রাজনীতিকের একটা pious hope—নিয়তই জাতির কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে, প্রচারে হচ্ছে রূপায়িত—তাকে যে এমনভাবে, এমন একটা জায়গায়, এমন একটা সমাবেশের মধ্যে উপলব্ধি করবার সৌভাগ্য হবে আমার, তা কখনও কি ভাবতে পেরেছি?

গান শুনছি বলেই 'রয়াল সেলুনের' পদ্ধতিতে সাকরেদ্ করে নেবার

জন্যে টানাহিঁচড়া লাগাবে এমন ভয় নেই, সুতরাং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষ করা গেল। তারপর এগিয়ে চললাম আবার।

আগে জঠরাগ্নিকে শান্ত করা যাক। একটা ঘর বা জায়গা বনেদী কি ভুঁইফোড় তা টের পাওয়া যায়, সে খায় কিরকম, এই থেকে। সেদিক দিয়ে আমতলারহাটের কাছে সিরাকোলকে মাথা নোয়াতে হয়। জানি না এখন কি রকম হয়েছে, কিন্তু আমার যেদিন শুভাগমন হয়,—সেই প্রায় আজ থেকে বছর সাত আগে, সেদিন সমস্ত বাজারটা ঘুরে এসেও একটা ভালো দোকান পাইনি। শেষে হার মেনে, যেটার দিকে নাক সিঁটকে চলে গিয়েছিলাম সেটারই দ্বারস্থ হতে হল।

মুড়ি আর মেঠাই—দুটো ডিপার্টমেন্ট। মুড়িরটায় মা-লক্ষ্মী যেন উছলে পড়ছেন—মুড়ি, চিড়ে, মুড়কি; মুড়ি আর চিড়ের মোয়া, কাঠিভাজা, ফুলুড়ি, বেগুনি—কি খাবে, কত চাই?

এইটেই বড় রাস্তার ওপর, বাহার দিয়ে।

দোকানের বাঁদিক দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা নেমে গেছে, তাই দিয়ে মিঠাই বিভাগে ঢুকতে হয়, কতকটা যেন আত্মগোপন করে আছে।

"টাটকা কিছু পাওয়া যাবে?"—প্রশ্নটা করবার সময় চক্ষুলজ্জার খাতিরেও উনুনটা থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না, কবে যে আগুন পড়েছিল, ভিয়ান চড়েছিল, সেটা গবেষণার বিষয়।

ডান হাতে পাখা, বাঁ-হাতে হুঁকো নিয়ে দোকানী চৌকির ওপর বসেছিল, নেমে উঠে দাড়াল খাতির করে, একটু সঙ্কোচের সঙ্গে হেসে বললে —"আজ্ঞে, একেবারে যে সদ্য তৈরি, টাটকা তা বলতে পারব না, তবে পানতুয়াটা আপনি দেখতে পারেন, বোধ হয় চলতে পারে...বলেন তো।"

আমতলা হাটের সদ্যজাত রসগোল্লাগুলো রসের কড়ায় হাবুডুবু খাচ্ছে ...একটু বিমর্ষ কণ্ঠে বললাম—"দেখি।"

আলমারিটা বড়, পুরনোও, সেটা খুলে একটা শালপাতায় করে দুটি বের করে নিয়ে এসে সামনে ধরলে। বললাম—"রসগোল্লা?"

"আজ্ঞে, সেটা আর দেখালুম না...."

একটু ম্লান হেসে, ফরমাস মতো গোটা আষ্টেক পানতুয়া একটা পদ্ম-পাতায় করে বের করতে করতে দুঃখের কাহিনী বলতে লাগল—নতুন একটা জায়গা পত্তন হল দেখে গ্রাম থেকে উঠে এসে ফেঁদেছে দোকানটুকু—মিলিটারীরাই রাস্তাটা বের করলে কিনা—একটু ফলাও করে টেবিল-বেঞ্চিও পেতেছে এই, কিন্তু কৈ?—ছানার মালের বিক্রি নেই, ঐ মুড়ি-মোয়া, কাঠিভাজা....

লোকটি ভালো। শেষের দুটো পানতুয়া যে গলার নিচে নামাতে পারলাম না, তার জন্যে আরও কুণ্ঠিত হয়ে উঠল। দামটা নেবার সময় কাঁচুমাচু করে বললে—"না হয় অর্ধেক দামই দিলেন—অবিশ্যি বলতে ভরসা পাচ্ছি নে··"

বড় মিষ্টি লাগল। একটা খারাপ হবে, তবে তো আর একটা হবে ভালো, এই করেই তো জীবনের ভারসাম্য রক্ষা হয়ে চলে; পানতুয়ার রস একটু টকে না গেলে, মনের রসটুকু এত মধুর হয়ে কি বেরিয়ে আসতে পারত?....অবশ্য থাকবে আর ক'দিন?—সদর বাজারে দোকান ফেঁদেছে, নানা স্বার্থের সংঘাতে ও রসটুকু হয়তো যাবেই উবে, তবে আমি যে তার আগেই একদিন পৌঁছে গিয়ে পেলাম আস্বাদ এইটুকুর, আমার কাছে তো সেইটিই বড় কথা।

বললাম—"না, সে কি কথা, তুমি তো তঞ্চকতা করো নি·রসগোল্লা তো বের করলে না—পাতে দেবার মতন নয় বলেই তো?"

জিভ কামড়াল।

"আজ্ঞে, তা কখনও পারি বের করতে?···আবার দেখুন, ঐগুলি তো বিক্রিও করব, দরের দরেই করব বিক্রি, ফেলে দোব না তো।···তাহলেই দেখুন, গলদটা কত দূরে। গ্রামের মধ্যে এ সব চলত না, সমাজ রয়েছে যে; কিন্তু পেট আর চলে না গ্রামে—অমন গ্রাম···শ্মশান হয়ে গেছে আজ্ঞে, দিনের বেলা বাঘ ডাকে···চৌধুরীদের, রায়দের, চাটুজ্জেদের, পালেদের, এক-একখানা যে বাড়ি পড়ে আছে—তাইতে যোগান দিয়েই এক-একটা ময়রার দোকান দাঁড়িয়ে থাকতে পারত—ছেলও তাই, ময়রা পাড়ারই এপারে শাঁখ বাজালে ওপারে আওয়াজ পৌঁছত না। এখন দুটি ঘরে দাঁড়িয়েছে, আজ্ঞে···বলুন।"

কি আর বলব ? কণ্ঠও হয়ে আসে রুদ্ধ।

"ব্রাহ্মণ ?"

"হ্যাঁ।"

"পাতঃপেন্নাম হই। তামাক…?"

"তা একটু হলে মন্দ হত না।"

সামনে যে ছেলেটি খদ্দের সামলাচ্ছিল, তাকে ডেকে তামাকট. সেজে দিতে আদেশ করে বললে—"তা ভেবেছেন আমি আর বেশিদিন এর মধ্যে জড়িয়ে থাকব ? রামোচন্দ্র ! ঐটি নাতি। ওর বাপকে সেখানকার দোকানে বসিয়ে এসে একটু ট্রেনিং দিচ্ছি উটিকে ; একটু সড়গড় হয়ে এলেই তাকে সুদ্দু এনে বাপ-বেটাকে এইখেনে বসিয়ে আমি আমার সাবেক আস্তানায় গিয়ে উঠব আবার। আমার সোজা কথা আজ্ঞে—তোরা এই অথম্মে কালে জন্মেছিস—দুটো মিথ্যে কথা না বললে, তঞ্চকত. না করলে যে-কালে পেট চলে না ; তা তোরা ঐ পাঠশালায় গিয়ে পড়—আমায় নিয়ে টানাটানি করা কেন ?

"আজ্ঞে এই বেলা পড়ে এল তো ?—এর পরেই সন্দ্যে—এদানি নয়, ঐ ওর মতন যখনটা—চাটুজ্জেদের শিবতলায় নিত্যি আড়াই সের করে বাতাসা আর পো তিনেক সন্দেশ সের-বাটখারা সুদ্দ নিয়ে গিয়ে তৌল করে উঠোনা দিতে আসতে হত। বহুকালের কথা…এখন বাতাসা খাবার মতন একটি শিবই আছেন, বাণেশ্বর, বাকি চারটি ইটের গাদার মধ্যে—কোন ব্যবস্থা নেই—চাটুজ্জেরাই লোপাট হয়ে গেল তো তার ব্যবস্থা—তবুও স্বভাবের দোষেই আধ-পোটাক করে বাতাসা—পুরুত মশাইয়ের নেংটে। নাতিটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বাবার মাথায় চড়িয়ে না দিয়ে সোয়াস্তি হত না আজ্ঞে।…সেটুকুও গেছে…এখন কি রকম করে পচা রসগোল্লা আর বাসি মুড়ি খদ্দেরের হাতে গচিয়ে দিতে হবে—তার হক্কের কড়ি আদায় করে নিয়ে, তার টেনিং দিচ্চি।…তা দিচ্চিই, উপায় কি ?…তবে সন্দেশটুকু এগিয়ে আসার সঙ্গে মনটা যে আইঢাই করে উঠতে থাকে—হিসেবে ভুল হয়—কেবলই মনে হয়—ছোঁড়াটা বনের মধ্যে গিয়ে

পোড়ো মন্দিরে পিদিমটুকু জ্বেলে, সেই ছটাকখানেক বাতাসা বাবার সামনে ধরে দিয়ে এলো কি না ·· ”

বেশ বলছিল, হঠাৎ—“কর্তাবাবু, একি সাজা দিলেন তিনি আমায় বুড়ো বয়সে।”—বলে থাটো কোঁচার খুঁটটা চোখে চেপে হুহু করে কেঁদে উঠল।

কিছু না বললে চলে না, মানুষকে ফাঁকা সান্ত্বনা দিতেই তো মানুষের জন্ম, বললাম—“তা আর করছ কি কর্তা? আড়াই সের বাতাসাটা হচ্ছিল —তা তাঁরই যখন ইচ্ছে এই রকমটা হোক, ঐ আধপোয়াটুকুও বন্ধ পড়ুক—তো তুমি আমি করতে পারি কি?”

খানিকটা নীরবে কাটল; আমাকেও ছোঁয়াচ লেগেছে, আর বলতে গেলে সামলাতে পারব না নিজেকে—

মনটা হালকা হলে চোখ দুটো মুছে নিয়ে দোকানী বললে—“আজ্ঞে, আম্মো সেই কথাই বলি, বলি, তাঁরই যখন ইচ্ছে, তখন তুই কি করবি বল মোদকের পো?···তবে উপলক্ষিটা আবার আমাকেই করেছেন কিনা, তাই ···বামুন, কড়ি-বাঁধাটা।”

ছেলেটি তামাক সেজে এনেছিল, আদেশ মতন হুঁকোটা পালটে নিয়ে এসে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতটা স্পর্শ করে এগিয়ে ধরলে। এতক্ষণ ঐ দিকে ছিল, ভালো করে দেখা হয় নি, সামনে এসে দাঁড়াতে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। একেবারে এই রকম ষোল আনা একটি বাঙালীর ছেলে কতদিন যে দেখা হয় নি!—চোখ যেন ফেরাতে পারা যাচ্ছে না। বছর পনর-ষোল বয়স, এদিককার হিসাবে একটু লম্বা, কালো, নধর-কান্তি; চোখদুটি ঢুল-ঢুলে, বুদ্ধির দীপ্তিতে একটা অন্য ধরনের বাহার এসে পড়েছে তারই মধ্যে; এদিকে একটু সলজ্জ। মাথায় একমাথা কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল। এইরূপটা কেমন করে যেন আমার বাঙলাদেশের ধ্যান-মূর্তির সঙ্গে বহুদিন থেকে রয়েছে জড়িয়ে। প্রতিপদেই এর ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু আমার মনে হয় এই যেন আদর্শ, এই যেন হওয়া উচিত, এই মায়ের এ-ই যেন সন্তান।

‘ষোল আনা’ বলেছি অন্য কারণে। বাঙলার বাইরে কোথায় কি ফ্যাশন উঠছে—কেশে, বেশে, তার একটি আঁচড় এসে লাগেনি গায়ে। একটি লালপেড়ে

আধময়লা ধুতি, আলগা কোমর বেঁধে পরা, কাঁধে একটা রাঙা গামছা, হাত মোছবার জন্যে, ডান ওপর হাতে সোনার তারে একটা সোনার তাবিজ বাঁধা ; ব্যাস, শেষ ; গায়ে একটা গেঞ্জি পর্যন্ত নেই যে ষোল আনা থেকে এক পাই পয়সাও কম পড়বে !

চুলে এতটুকু ইতর-বিশেষ নেই ঘাড় আর কপালের মধ্যে। বুঝেছি, তুমি সন্তুষ্ট হতে পারছ না, এই অর্ধনগ্ন প্রকৃতি-শাবকটিকে জগৎ-সভায় কি করে দাঁড় করাবে? তার জন্যে আমার কিন্তু কোন মাথাব্যথাই নেই ; আপাতত এইটুকুই মনে হচ্ছে যে জগৎ একবার উঠে এসে তার নয়ন দুটো সার্থক করে যাক।

আমরা তো এর কাঁধেই এই একটা পীত-ধড়া তুলে দিয়ে রূপের চরমোৎকর্ষ —একেবারে মদন-মোহন রূপের স্বপ্ন দেখে এসেছি।

দোকানী চুপ করে কি একটা যেন লক্ষ্য করছিল, হঠাৎ একটু উষ্ণ হয়ে উঠল—"ঐ দেখুন, সাধ করে কি বলছিলাম এ-কাল আর সেকাল? শুনলি বামুন, তা পায়ের ধুলো নিতে হবে না?—সেটুকুও বলে দিতে হবে?"

কাল "প্রবাসী"-অফিসে যথেচ্ছ তর্কের যে এলোমেলো ঝড়টা উঠেছিল তাতে এটাও ছিল—এই জলপাত, ব্রাহ্মণ-হরিজন। আমিই ছিলাম বলতে গেলে বিপক্ষের নেতা। মলিন শতগ্রন্থি একগাছা পৈতা শরীরের কোথায় পড়ে আছে—ঢোঁড়াসাপ—সে নিয়ে আর দাপট কেন?···বিষ থাকলেও যে এক সময় করেছিলাম দাপট তারই তো পরিণতি—বিষের অক্ষরে ঐ লেখা রয়েছে পূর্ববঙ্গে, মাদ্রাজে, কোথায়ই বা নয়?—হাজার বছরের গ্লানির ইতিহাসের পাতায় পাতায় একেবারে····

—আমার তর্ক ; chapter-verse উদ্ধার করে করে দেখিয়ে দিয়েছি কাল ; শুধু মুখের কথা নয়, অন্তরের বিশ্বাসও। তবু আজ কি হয়েছে—কোন্ প্রবাস থেকে যেন ঘরে ফিরে এসেছি, সেখানে তর্ক নেই, নেই দ্বন্দ্ব। সহজ অধিকারে আমি ব্রাহ্মণ, আমার প্রতি কারুর নেই ঈর্ষা, কারুর প্রতি আমার নেই অবজ্ঞা···আমার ডাক পড়েছে গরীব মেয়েটির জামরুলের

দোকানের শুভযাত্রা করে দিতে হবে, এখানে বৃদ্ধের নাতির জীবনেরও জয়যাত্রার দুটো মন্ত্র চাই।···কী সে সৌভাগ্য! কী করে যে হারাল! কেন যে!···নতুন যুগের নতুন তথ্য—প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আত্ম-জিজ্ঞাসার। ব্রাহ্মণ বলেই আমি যেন সবচেয়ে বড় ত্যাগটা করে যেতে পারি, সবচেয়ে বড় স্বার্থটাকে জগতের কল্যাণ-যজ্ঞে আহুতি দিয়ে যেতে পারি হে ভগবান···

আবার গিয়ে তর্কে মাতব, কাগজে লিখব, সাহিত্যে করব প্রচার,—কেন আর এই তিন গাছা সুতো নিয়ে এত মাতামাতি!

তার আগে কিন্তু আজকের এই দিনটাকে পেয়ে নিই ভালো করে। কবেকার একটি হারানো দিন আচম্বিতে পথভুলে এসে যখন পড়েছেই।

আর পায়ের ধুলো কাউকে নিতে দিই না, ধুলোই তো, অপমানই তো। আজ কিন্তু আর ছন্দপতন হতে দিলাম না, পা দুটো বের করে নিয়ে জুতোর ওপর রাখলাম। মাথায় হাতটা চেপে ব্রাহ্মণেরই ভাষায় ব্রাহ্মণের সৃষ্ট মন্ত্রে আশীর্বাদ করলাম—"কল্যাণমস্তু"।

আশা রইল শক্তিতে না কাজ হোক, অপচয়িত শক্তির যে অনুতাপ তাতেও যদি ফল হয় একটু।

পারছ পড়ে যেতে?—আমার অভিযানে সৌধ নেই, শিখর নেই, ঝরনা নেই, সমাধি নেই, স্মৃতিস্তম্ভ নেই। কি করব? এই খুঁটে খুঁটে বেড়াই, রোদে বর্ষায়, সকালে, সন্ধ্যায়; চিঠিতেও তাই এই দিচ্ছি, ধরেছে কি মনে তোমার?

Eureka! প্রাপ্তোস্মি! সেই কথাই এবার বলি তোমায়:—

দোকানের বাঁয়েই কাঁচা রাস্তা, তারপরেই একটা খাল, আগে বলেছি তোমায় সেকথা।

খালটা হাতচারেক চওড়া, আশপাশের সমতল থেকে বেশি নিচেও নয় যে বেশ খানিকটা নেমে গিয়ে তবে জল পাওয়া যাবে। বেশ একটি খেলাঘর-খেলাঘর ভাব আছে, যা—বোধহয় আগেই বলেছি—এ প্রান্তের অনেক জিনিসের মধ্যেই পাওয়া যায়, আর যার জন্যে মনে হয় ফলতা মেলে চড়ে ঠিক এই রকমই একটি দেশে এসে পড়বার কথা। এই খেলাঘরের খালে

দিব্যি নৌকা চলাচলও আছে। নৌকাগুলিও নতুন ধরনের কতকটা, এদিককার নৌকো যেমন মোচার খোলার আকারে গড়া তেমন নয়।

বোধহয় হাত দুয়েক চওড়া হবে, তাও কেঁদে-কঁকিয়ে; বরাবর এক রকমই, লম্বায় শুধু বোধ হয় একটু বেশি কিংবা হয়তো সরু আর একভাব বলে মনে হয় বেশি লম্বা।

একটা বড় যানবাহন এদিককার; মানুষও যাচ্ছে, মালও যাচ্ছে; বিচালির আমদানি-রপ্তানিই দেখেছি বেশি।

আমি যখন আসি একটিতে জন দুয়েক লোক চুপটি করে বসে ছিল, নৌকো বোধ হয় আরও লোক নিয়ে ছাড়বে। একজন তার মধ্যে ছোকরা, বেশ ফিটফাট, শ্বশুর-বাড়ি যাচ্ছে কল্পনা করতে করতে আমি দোকানে ঢুকেছিলাম মনে আছে। দোকান থেকে দেখা যায় খালটা, তবে অতটা খেয়াল করিনি, একবার ঘুরে দেখি নৌকোটা নেই, কখন ছেড়ে দিয়েছে।

তবে আমার দেখতাই আর একটা নৌকো এসে ঘাটে লাগল ওদিক থেকে। তামাকটা শেষ করে এনেছি, দুজনে হাত ফের করে, উঠতে যাব, দোকানী বললে—"আজ্ঞে আর একটু বসে যান—ক্ষেতি হবে?"

"ক্ষেতি···মানে, যেতে হবে অনেকটা, সেই হাওড়া-শিবপুর, জান কিনা বলতে পারি না······"

ততক্ষণে নৌকোর যাত্রী দুজন উঠে এসেছে—দোকানের দিকেই পা, দুজনের মধ্যে একজন আবার স্ত্রীলোক, তায় যুবতীই দেখে আমি উঠে পড়ে বললাম—"তোমারই খদ্দের, মেয়েছেলে রয়েছে, আমি উঠিই না হয়।"

দোকানীর হাতেই হুঁকোটা, মুখে লাগিয়ে একটু চোখ টিপে গোঁফ আর ধুঁয়ার মাঝে অল্প একটু হেসে বললে—"একটু বসেই যান না, রহস্য আছে।"

পুরুষটির বয়স···পঞ্চাশ হলেও, আশ্চর্য হব না; তবে দিব্যি বলিষ্ঠ আর muscular। দুজনের বয়সের তারতম্য দেখে দোকানীর মুখে "রহস্য" কথাটা বড় খাপছাড়া লাগল কানে; বেশ একটু কটুও—এখনি যার মুখে অমনি একটি পবিত্র, ভক্তি-অশ্রু-পূত কাহিনী শুনে আমার নিজের চোখও সজল হয়ে আসছিল।

তা যাই বলুক ও, দুজনের মুখে বেশ একটি সরলতা কিন্তু। সময় থাকলে ঐ ছাপটুকুই মনে নিয়ে উঠে পড়তাম দোকানের মিষ্টি অভিজ্ঞতাটুকুকে আর তেতো হতে না দিয়ে, কিন্তু তার আগেই দুজনে রাস্তায় এসে উঠেছে। পুরুষটির হাতে একটা মোটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ; নৌকোর ছইয়ের মধ্যে ছিল, কড়া রোদের জন্যেই বোধ হয় দুজনে মাথাটা একটু নিচু করে আসছিল, দোকানের ছেঁচের নিচে এসে মুখ তুলতেই আমায় দেখে যেন একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনেই। দোকানী বললে—"চলে এস ভেতরে; উনি আমাদের মুখুজ্জে মশাই—তোমার গিয়ে ঘরের মানুষই এক রকম বলতে গেলে।"

পাড়াগাঁয়ে এই রকম পরিচয়েই চলে; একজনের ঘরের মানুষ তো সবারই ঘরের মানুষ; এক রকম সামাজিক জ্যামিতির নিয়মেই; বেশ সপ্রতিভভাবেই উঠে এল দুজনে। মেয়েটিই বেশি যেন একটু। এসে দাঁড়িয়েছে, আড়ে পুরুষটির পানে অল্প একটু তিরস্কারের দৃষ্টি হেনে খুব সূক্ষ্মভাবে আমার পায়ের দিকে চেয়ে ভ্রূ দুটো একটু চেপে দিয়ে; সে তাড়াতাড়ি ব্যাগটা ভুঁয়ে রেখে একটু সলজ্জভাবে হেসে বলল—"মুখুজ্জে মশাই?—বামুন—তাহলে তো পায়ের ধুলো পাব একটু।"

ওর হয়ে গেলে মেয়েটি ধীরে সুস্থে বেশ করে গলায় আঁচল জড়িয়ে হাতটা পায়ের নিচে পর্যন্ত চালিয়ে যা পাওয়া গেল সত্যি ধূলোই নিলে একটু।

কেমন যেন গুরু-চণ্ডালি দোষ হয়ে যাচ্ছে, প্রণামের মধ্যে ঘটা রয়েছে, কিন্তু দোকানী ঐ যে পোড়া এক 'রহস্য'র কথা গেয়ে রেখেছে, তেমন অন্তর ঢেলে আশীর্বাদটুকু বের হল না মুখ দিয়ে এবার।

টেবিলের দুদিকেই বেঞ্চ, দোকানী বললে—"তা বোসো গুপী ওদিক পানটায়, দাঁড়িয়ে কতক্ষণ থাকবে?....গাঁয়ের খবর বল, আমাদের গাঁয়েরও।"

গুপী বেঞ্চটায় বসল, আমার জন্যে বোধ হয় একটু সঙ্কুচিতভাবেই; বললে—"গেঁয়ের খবর···তা এক রকম ভালোই···তোমাদের উদিকেও হয়েছিল যাবার বরাত একটু—ছেলের সঙ্গে চণ্ডীতলায় দেখা···ভালোই সব।"

"ভালো হলেই ভালো—যা করে কাটচে মানুষের। তা, নাতনীও বোস্। এই দেখ!"

মেয়েটি একটি খুঁটি ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, নিচের ঠোঁট দিয়ে ওপরেরটা একটু ঠেলে অস্পষ্টস্বরে বললে—"বেশ আচি।"

"তা থাকবিনি কেন? আমি বলছিলাম পাশাপাশি বসলে পরে একটু যুগলরূপটুকু দেখতাম কদ্দিন পরে,—এই আর কি।"

—আমার পানে চেয়ে একটু হেসে টীকা করলে—"আজ্ঞে, নাতনী।"

মেয়েটি আবার ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট তুলে দৃষ্টিতে একটু হাসি আর রাগ ফুটিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিলে।

ঠোঁট থেকেই করি বর্ণনা: একটু পুরু, কপালটি উঁচু, নাকটি একটু চাপা; তাহলেও বেশ একটা শ্রী আছে, তার অনেকখানিই অবশ্য বয়স আর অনবদ্য স্বাস্থ্যের জন্যেই। পুরুষটার কথা বলেছি। পরিচ্ছদটা দুজনেরই শাদামাটা, বেশ সম্পন্ন কৃষক-পরিবার মনে হয়।

আমার বুকের কোথায় যেন একটা চাপা নিশ্বাস আটকে ছিল, দোকানীর ঠাট্টাটুকুতে আর নাতনী বলে পরিচয়ে সেটা বেরিয়ে বুকটাকে হালকা আর পরিষ্কার করে দিলে।

অসমবিবাহ সমাজের একটা উৎকট ব্যাধি। পাণিগ্রহণ,—কিন্তু পঞ্চাশ আর আঠার—বয়সের এই দীর্ঘ ব্যবধান ডিঙিয়ে কি করে ধরবে হাত? কি করে হবে মিল?

আজ কিন্তু আমি ক্ষমা করতে পারছি গুপীকে।

আসল কথা ওই দৃষ্টিকোণ, যা অনেকখানিই নির্ভর করে অবস্থা আর পরিবেশের ওপর।

যদি মনস্তত্ত্বের দিক দিয়েও এগোও তো বলতে হয় ঐ যে 'রহস্য'র একটা কুৎসিত ইঙ্গিত ছিল—তাই হতে চিত্তের একটা গ্লানি, সেটা থেকে মুক্ত হয়ে আমার মনটা একটা স্বস্তির দৃষ্টিতে সমস্তটুকুকে পাচ্ছে দেখতে—ইংরাজীতে যাকে বলা হবে একটা রিলিফ।

বেশ সহজমনেই ক্ষমা করতে পারছি আমি গুপীকে—সুস্থ সবল পুরুষ,

সে যদি কাম্য এক কামিনীকে চায় তো এর মধ্যে দোষটাই বা কোথায় অশোভনটাই বা কি? বিকৃতি তো বয়সের জন্যে নয় সব সময়, বিকৃতি অযোগ্যতায় আর বিকৃতি ব্যভিচারে। আমার বেশ লাগছে এই অসম-দম্পতি, এর মধ্যে চমৎকার একটা কাব্য আছে—সাকী র পাশে জীবন্ত ওমরখৈয়াম—শ্বেত শ্মশ্রুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কুন্তল।··· আমরা যে ভুল করি দেখবারই—কেনই বা জোর দেব শুধু কামনার দিকটাতেই —এর মধ্যে যে রয়েছে নারী-সুষমার একটা মস্ত বড় অভিনন্দন অসুন্দর পুরুষের দিক থেকে—পুরুষ বলেই যে অসুন্দর।

দোহাই, তুমি আর তর্ক এনে ফেল না এর মধ্যে। সিরাকোলের এই মধুর অপরাহ্ন। এই দোকান, এই দোকানী, এই করায়ত্তভর্তৃ ষোড়শী, এই মুগ্ধবিমূঢ়-প্রৌঢ়ভর্তা—এসব থেকে যখন দূরে—তোমার ড্রয়িং-রুমে—তখন আবার নিজমূর্তি ধরব—আজ গুপীকেষ্টকে ক্ষমা করলাম বলে উগ্রমূর্তিই ধরব'খন তখন পৃথিবীর যত গুপীকৃষ্টদের ওপর।

এখন কিন্তু করই ক্ষমা আমাকে। কি করব? হঠাৎ কে কি অঞ্জন বুলিয়ে দিলে চোখে, সরমে-পরিহাসে, শোভনে-অশোভনে, বেদনায়-তৃপ্তিতে —সবই যে এখন আমার কাছে মধুরং মধুরে মধুরং···

ঘরের লোক হয়ে গেছি। একটি ক্ষণরচিত পরিবার, একজন দোকানে বিকিকিনি করতে করতে একটু মুখ ঘুরিয়ে রয়েছে, একজন কি করে সুদূর বেহার থেকে এসে জুটে গেছে, দুজন কোথা থেকে নৌকো বেয়ে এল উঠে। এখনই আবার যাবে সংসার ভেঙে, যতটুকু পারি টেনে নিই রস।

নাতি তামাক দিয়ে গেল সেজে আবার। চেনা-লোক, এক গ্রামের, এক বয়সী, হয়তো সাথীও অনেক খেলার,—মেয়েটি সরে গেল ছেলেটার হাত ধরে বড় আলমারিটার একটু ওধারে। জমে উঠল গল্প—"অনেকদিন যাস্ নি গাঁয়ে—কেন র‍্যা?···হ্যাঁঃ দোকান! তাই বলে গাঁ ছেড়ে বসে থাকবে লোকে! আর এই তো দোকানের ছিরি!···হ্যাঁ, তাও বুঝতুম শরীলে-দেহে ভালো আছিস····আর আমায় দেখ···ওমা, হই নি মোটা!

কী যে বলে !···বিয়ের জল ?····তা তুইও না হয় করগে যানা বিয়ে একটা, হিংসে কিসের ?···বলগে না ঠাকুর্দাকে”···খিল-খিল খিল-খিল—সবকথা হাসিতে তরল হয়ে উঠল। নিচু গলায়ই গল্প, কিন্তু যথেষ্ট নিচু হচ্ছে কিনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই বিশেষ।

এদিকে আমাদেরও জমে উঠেছে ; কলকেটা তিনটে হুঁকোর মাথায় টহল দিয়ে ফিরছে।

“তা এবার আবার কোথায়, হ্যাঁ সামন্ত ? ··কাঁচপোকাটি যে আরস্থলোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে·· তা যাচ্ছেটা কোথায় শুনতে বাধা আছে নাকি ?”

রহস্যটার একটু একটু যেন পাচ্ছি আঁচ ; বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা।····প্রশ্ন করে পরিষ্কার করে নোব নাকি ? কি ভেবে লোভটা সংবরণ করে হুঁকোই টানতে লাগলাম ফুড়ুক ফুড়ুক করে ; তবে আঁচ যে পাচ্ছি তার একটু চটুল হাসি লেগেই রয়েছে ঠোঁটে।

“যাচ্ছি—তোমার গিয়ে···”

—একটা টান দিয়ে না শেষ করেই সামন্ত দোকানীর মুখের ওপর চোখ তুলে একটু সলজ্জভাবে হাসলে।

“বায়স্কোপ, না, ঠিয়েটার এবার ?···কোন্ দিক পানের দৌড়—কলকাতা, না, দক্ষিণে ?”

“ন্যাও ! বাস্কোপ-ঠিয়েটারই দেখছে লোকে রোজ রোজ ?”

“বলেই ফেল না, নজ্জাটা কিসের ? মুকুজ্জে মশাইয়ের কাছে ?··· তাহলে, যার আসল লজ্জার কথা তার কাছ থেকেই যে আদায় করতে পারি আমি। হুঁকোটা একটু কাত করবেন মুকুজ্জে মশাই ?”

কি একটু চাপা কথার পর ওদিকে একটা হাসি উঠল—সেই খিল-খিল-খিল-খিল···

দোকানীর ultimatum-এ সামন্ত হেসে একটু নড়েচড়ে বসল—আর যখন উপায়ই নেই ; বললে—“উঃ, নজ্জায় তো কুলোকামিনী নাতনী তোমার, ঐ শোন না।····তা মুকুজ্জে মশাইয়ের কাছে বলব তা ভয়টাই বা কি

আর ইয়েটাই বা কি ?—কন্ কেন মুকুজ্জে মশাই ?…বুড়ো বয়সে য্যাখন ঘাড়ে চেপে বসেইচে ত্যাখন ভোগাবেনি একটু ?"

ওদিকে গল্পটা হঠাৎ থেমে গেছে, তারপরেই শিউরে-ওঠা চাপা গলায়—"শোন্ কথা ! শুনলি ?—নাকি ঘাড়ে চেপে বসেচি !…"

হাসিটা আরও কলকলিয়ে উঠে আলমারির ও-কোণটায় সরে গেল।

নেমে পড়লাম, ডেকেই যখন নামালে তখন আর দোষটা কি ? আর… দোষ বলে একটা জিনিসও আছে নাকি সিরাকোলের ওদিকে কোথায় ?… বললাম—"না সায় দিতে পারলাম না তো সামন্ত, চেপে বসা কি বলচগো ? ঘাড়ে তুলে নেবার জিনিস যে আমাদের নাতনী…আর ভোগান্তি—তা মোদক মশাইয়ের বুড়ো বয়সেও যদি অমনধারা ভোগান্তি হত তো বর্তে যেতেন…আর তুমি সে জায়গায় তো…"

তিনজনের প্রাণখোলা হাসিতে দোকানটা গমগম করে উঠল। ওদিক থেকে অর্ধস্ফুট বিস্মিত মন্তব্য—"দেখ্, দেখলি ? কেউ কসুর নয় !…কে র্যা উনি ?"

সামন্ত কলকেটা তুলে নিয়ে বললে…"না, ওসব নয়। ছেরকালই কি ওসবের থাকে শখ ? কেটেচে। এবার তোমার গিয়ে গঙ্গাস্নান—ঝোঁক হয়েচে।"

ওদিকে আবার একটা হাসি উঠে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। দোকানী গলা তুলে প্রশ্ন করলে—"নাতনী হঠাৎ হেসে উঠলি কেন গো কথাটার ওপর ? খটকা লাগিয়ে দিলি যে !…বলি হ্যাঁ সামন্ত, আবার সেই রকম গঙ্গাস্নান নয়তো—নাতনী যেবারে প্রথম গেল—সেই গঙ্গাস্নান,—কালীঘাট—তারপর ….ওঃ, পালগিন্নীর মুখে যে শোনাতে পারলাম না গল্পটা মুকুজ্জে মশাইকে…"

দোকানী হেসে লুটিয়ে পড়ল, কিন্তু কতকটা একাই এবার। সামন্ত যোগ দিলে, কিন্তু একটু অপ্রতিভভাবেই। আলমারির ওদিকটায় শুধু খিক-খিক করে চাপা আওয়াজ একটু, আর—"করে দিলে বুঝি ফাঁস্ রে বুড়ো !"

—আমি একটু কাছে, আছিও কান পেতে, এরা অনেকটা এদিকে ; শুনতে বোধ হয় আমি একলাই পেলাম।

দোকানী বললে—"তা বড় নাতনী এল না যে ? আর সবাইও তো আসে অন্য অন্য বার।"

"তার বাত।"

"নাও! বড় গিন্নীর বাত, ছোট গিন্নীর তিথি—দুজনে মিলে এবার সামন্তের যৈবনটাকে আর দিলে না বজায় থাকতে।"

সামন্ত আবার উলসে উঠল "সে কি কও! তেমন দেখি তো তার—ছোট গিন্নি কাড়ব না তাহলে আমি আবার!"

আবার তিনজনের হাসি উচ্চকিত হয়ে উঠল।

ওদিক থেকে একটু হাসির শেষেই আবার চাপা মন্তব্য—"শুনে রাখিস্, বুকের পাটাটা একবার দেখে থো!···বলে আর একটা গিন্নি কাড়বে,—আমি ইদিকে জলজ্যান্ত বেঁচে!"

উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না; কিন্তু ফিরতে যখন হবেই তখন তো সময়ের সীমানা বাঁধা, হাওড়া স্টেশনের শেষ ট্রাম সাড়ে দশটায় শেষ বাস এগারটায়।

বললাম—"এবার যে আমায় উঠতে হয় মোদক মশাই।"

হঠাৎ রসভঙ্গে দোকানী বলে উঠল—"সেকি! ইরি মধ্যেই?"

"তোমায় তো বললামই, অনেক দূর এখান থেকে···"

"তাও তো বটে! তা একটু অপেক্ষা করতে হবেই।···আমার ঘরে আজ নাতনী-নাতজামাই···যদি পেলাম আপনা হেন একজন মানুষকে ··কেউ তো ডেকেও সুদোয় না একবার···অমন গিন্নিবান্নি নাতনী আমার আর আপনি কিনা····বলি ও নারাণী, ভাই-বোনের মস্কারাই চলবে?—আর ইদিকে মুকুজ্জে মশাই যে গোটাকতক পচা পানতুয়া পেটে পুরে শাপমন্যি দিতে দিতে···"

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে হাতটা চেপে বললাম—"এই তো নয় মোদক মশাই·—সব ঠিক রেখে শেষরক্ষাটুকু করতে পারছ না।···তা বসছি, আমারই লোভ নেই নাতনীর হাতে সেবার? তবে তাড়াতাড়ি—যত শীগগীর পার ছেড়ে দিতে।"

নাতনীর হাতের অমৃত হালুয়া খেয়ে যখন বেরুলাম তখন ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা। প্রায় মিনিট চল্লিশেক কাটল; এও অমৃত চল্লিশটি মিনিট, আমার জীবনে এর মৃত্যু নেই।

কাজের মেয়ে নারাণী। আলমারির ওদিক থেকে বেরিয়ে এসে কাজের

মধ্যে ওর পূর্ণ সত্তাটি বিকশিত হয়ে উঠল। দাদু, স্বামী, সাথী—কারুর কাছেই সঙ্কোচের বালাই নেই, তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছি আমিও মুকুজ্জে-দাদু। আয়োজনের মধ্যে সাবলীল চলা-ফেরা, কথাবার্তা—একটা জিনিস তো ভালো করেই বুঝিয়ে দিলে নারাণী—ওরাই জীবনের কেন্দ্র—ওরাই চৈতন্য ··

"আমাদের ওখানে একবার আসতে হবে মুকুজ্জে-দাদু, নিশ্চয়ই···তুমি একবার বল না গো—চেরকালই হাঁদা রয়ে গেলেন! মিথ্যে বলচি ময়রা-দাদু?"

একটা হাসি ওঠে উৎকট; সামন্ত বলে—"তা তোরা আর হতে দিলি কই চালাক? কামেখ্যার ডাইন সব ··ভেড়া করে রাখবার মন্তরই তো খালি শিকেচিস।"

আবার ওঠে হাসি।

বিদায়ে সেই রকম ঘটা করে প্রণাম। "সত্যি আবার আসতে হবে মুকুজ্জে-দাদু· ·আমরা গরীব চাষা-ভূষা বলে···"

চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠেছে। একটু রহস্য করে না বললে আমিও আর সামলাতে পারি না নিজেকে। বললাম—"আসব না!···যা হালুয়ার লোভ লাগিয়ে দিলি তুই (তুই-ই বেরুল, বড় মিষ্টি)···আর গরীব হোক শত্রুতে—ওই হালুয়ারই হাত যা তুই দেখালি···"

সামন্ত হেসে বললে—"তা হলেই আর এসেচেন দা'ঠাকুর—ও যা হালুয়া তা পরের ধনে পোদ্দারি বলেই····"

হাসিমুখে বিদায় দেবার যশটুকু সামন্তই নিলে। হোক ম্লান, তবু সবার মুখেই একটু হাসি দেখে বেরুলাম, নারাণীর হাসি তার জলটুকু দিয়েছে ঝরিয়ে।

পিছু-টান, পা উঠতে চাইছে না যেন; সেইজন্যই জোর করে পা দুটাকে তাড়াতাড়ি চালিয়ে মায়ার এলাকাটুকু খানিকটা ছাড়িয়ে এসে গতি মন্থর করে দিয়েছি, হঠাৎ ডান দিকে টানা হুইসিল-এর শব্দ। খান-চার দোকানের

আড়াল কাটিয়ে এসে দেখি সত্যি একখানা গাড়ি। অনেকটা দূরে, মাল গাড়িও তো হতে পারে, তারপর খেয়াল হল এ লাইনে সবকিছুই তো সম্ভব; তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলাম।

না, পাসেঞ্জার গাড়িই, আমি স্টেশনে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে সেও গেল পৌছে। জানতে পারা গেল আমতলার হাটে আমার যে গাড়িটা ধরবার কথা সেটাই এটা। হিসাব করে দেখা গেল তাই তো হবে। রয়াল সেলুনের কাঁচির ভয়ে আমি অন্তত মিনিট পঁচিশ আগে ওখান থেকে সরে পড়েছি, তারপর দ্রুত বাস, পনর মিনিটের বেশিই বরং বাঁচিয়েছে একটা স্টেশনে আসতে—এই প্রায় চল্লিশ মিনিট। স্টেশন মাস্টার যদি তখন আঁকে ডুবে না থাকে অমন করে, কিম্বা আমি আর তখন যদি একটু স্থির হয়ে ভেবে জিগ্যেস করি —বেরিয়ে যে গেল সেটা কোন্ গাড়ি, তাহলে আর এ নিগ্রহটুকু হয় না—

কিন্তু নিগ্রহই কি?—তাও আবার ভাবি, আর বঞ্চনার মধ্যে দিয়েও যাঁর দান নামে সহস্র ধারায় তাঁকে মনে মনে করি প্রণাম। একটু যে বিরক্তি, একটু যে ভুল, যার জন্যে হল না ভালো করে জিগ্যেস করা, ওইটুকুই যে নৈরাশ্য; ওর মধ্যে দিয়েই তো আমার আজকের পরম প্রাপ্তিটুকুর পথ হচ্ছিল রচিত।

আবার ঐ নগদ যা পেলাম তার অতিরিক্তও গেছি পেয়ে। তাই তখন বলছিলাম—ইউরেকা! প্রাপ্তোস্মি!

—একটি চমৎকার গল্পের প্লট যা আরম্ভ হয়েছিল 'পৈলান' নামটা থেকে, পালবৌ যার মধ্যে আবছা এসে দাঁড়িয়েছিল, গোপী-নারায়ণী যেন সেটাকে পূর্ণ করে তুলেছে। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছি—সৃষ্টির আনন্দে আমার অন্তর উঠছে কেঁপে কেঁপে—দোকানী যেটুকু রহস্যে ঢেকে ছেড়েছিল আমি সেইটুকু নিই তুলে—বেশ স্কোপ আছে···সেই যে বললে—"সেই রকম গঙ্গাস্তান নয়তো?—নাতনী যেবার প্রেথম গেল—সেই গঙ্গাস্তান—কালীঘাট—তার-পর···"

তারপর কি?···কোন্ পালগিন্নি?—তা যে পালগিন্নিই হোক, আমার পালবৌই সে; সিরাকোলও তো 'পৈলান' নয়।

টিকিট নিয়েছি থার্ডক্লাসেরই, কিন্তু দেখছি ভুল হয়ে গেছে। গাড়িতে বেশ ভিড় তাতে মোটামুটি খসড়াটা এক রকম দাঁড়ালেও প্লট আমার সংলাপে —পরিস্থিতিতে বেশ দানা বাঁধাতে পাচ্ছে না। একটু নিরিবিলি হলেই ভালো হত, কিন্তু শেষ গাড়ি, নেমে টিকিট বদলাতে যেতে সাহস হচ্ছে না।—বিশেষ করে স্টেশনমাস্টারের যা লম্বা হিসাবের নমুনা পেয়েছি। যাক, বিধি অনুকূল, টিকিট চেকার এসে উপস্থিত। আর ইণ্টারও নয়, যতটা নিরিবিলি পাওয়া যায়, থার্ডটা একেবারেই সেকেণ্ডে বদল করে নিয়ে নেমে গেলাম।

সিরাকোলে ইঞ্জিন জল নেয়, আমার গল্প আরম্ভ হয়ে গেছে এদিকে —সম্বন্ধটুকু যা দাঁড়িয়েছিল তার সঙ্গে খাপ খাইয়েই চলেছে গল্প, নাতনী আমার নাকে দড়ি দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গুপীকে। শুনেই যাও না— এই রকম দাঁড়াল—

লড়াইয়ের বাজারে গুপী সামন্ত, যাকে বলে ফেঁপে উঠেছে। উপরে-উপরি কটা বছর যেমন ধান হল, তেমনই পাট, বিক্রিও হল সোনার দরে, চলতি বলে ফেঁপে ওঠা কথাটাই ব্যবহার করছি, আসলে গোপী নিরেট হয়ে ফুলে উঠেছে।

একটা পুকুর খোঁড়ালে, গ্রামের দুটো পুকুর নিজের টাকায় ঝালিয়ে দিলে, বারোয়ারিতলায় একটা নলকূপ গলিয়ে দিলে, আটচালার ওপরেও টিন বসিয়ে দিলে। এইভাবে আগে খানিকটা পুণ্য সঞ্চয় করে নিয়ে কাশীনাথের ছোটমেয়ে নারাণীকে বিয়ে করে ঘরে তুললে।

কাশীনাথের মেয়েগুলি হয় ভালো। গুপীর ইচ্ছে ছিল বড়টিকেই নেয়। সেটি গেলে মেজটির ওপর নজর পড়ে, কিন্তু টানাটানির সময় কাশীনাথের খাঁইও বেশি, কথাটা যে তুলবে সে হেম্মত পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি। অনেকদিন থেকে ওই একটা সাধ, চারশ টাকা নগদ গুনে দিয়ে নারায়ণীকে ঘরে আনলে গুপী। ডাগোর ডাগোরটি আছে, কাশী বলে বয়স কিছু কম, আঠার বছর। গুপীর আন্দাজ, বেশিই হবে।

গুপীর নিজের বয়স এখন আড়াই কুড়ি হয়ে এক বছর চলেছে।

এই নারাণী এখন আবদার ধরেছে তাকে কলকাতা শহর দেখাতে হবে। গুপী বলছে—"তা দেখবি, এ আর বড় কথা কি?"

কলকাতার ফ্যাসাদটা আসলে ভুল করে গুপীই তুলেছে। ভুল করে বলাও চলে আবার শখ করে বলাও চলে। কলকাতা শহর যে কি বস্তু, গুপী এই সেদিন পর্যন্ত নিজেও জানত না। তারপর দাঁয়েদের কাছ থেকে পনর বিঘে চাকলাটা উদ্ধার করতে যেয়ে হাইকোর্ট পর্যন্ত যে দৌড়ুতে হল, তাইতেই কলকাতার অভিজ্ঞতা গুপীর। এই মামলাটা জেতার পরই নারায়ণীকে ঘরে নিয়ে এল। বয়সকালে সাবেক বৌ রতনের-মার সঙ্গে যে সব আলাপ হত, সে সব ঠিক জোগায় না মুখে, মানায়ও না, গুপী কলকাতার গল্প দিয়েই নূতন বৌয়ের মন আকর্ষণ করতে লাগল—

"দাঁয়েদের বালাখানা দেখেছিস?—এক হাইকোর্টের মধ্যে তার লাখো-খানা এঁটে গিয়ে একটা গোটা ধান মাড়াইয়ের উঠোন থাকবে পড়ে। এই রকম এই রকম কোটা অলিতে গলিতে। রাস্তা দেখলে তোর মনে হবে বিছানা ছেড়ে আঁচল বিছিয়ে রাস্তাতেই পড়ে থাকি—যেমন কালো পাথরের মতন রং তেমন পালিশ। দেখলে যা মনে হবে তাই বললুম, ইদিকে আবার যে একটু পা দেবে নোকে তার জো নেই—যেমন মোটর, তেমনই টেরাম, টেরাম বুঝলি?"

নারাণী বললে—"কই না তো।"

"ইঞ্জিন নেই, দুখানা রেল গাড়ি, রাস্তার মধ্যি দিয়ে বনবন করে ছুটেচে; সর, চাই, কাটা পড়।"

বধূর বিস্ময়-বিমূঢ় মুখের দিকে চেয়ে অল্প হাসির সঙ্গে মাথা দোলাতে লাগল। নারাণী প্রশ্ন করলে—"তবে চলে কি করে—হ্যাঁ গা?"

গুপীর হাসি একটু স্তিমিত হয়ে গেল, কেননা চলার রহস্যটা তার আয়ত্ত নেই,—"চলে···এতবড় রাজত্বটা চলচে কি করে সরকার বাহাদুরের?··· তারপর গঙ্গার পুল দেখ্, চিড়িয়াখানা দেখ্, মরা সোসাইটি দেখ্—দেখে কি মানুষ কুলুতে পারে? আজব শহর কলকাতা—কথাটা যে চলে আসছে সেই মান্ধাতার আমল থেকে তা মিথ্যে?···একবার নয়, কবার দেখলুম,

লোকে একেবার দেখলেই বলে জীবন সাথক হল—তা একবার নয়, কবার দেখলুম।"

ছেলেমানুষ, গল্প শুনে শুনে ঔৎসুক্যটা বেড়েই চলেছে; এদিকে আবার আদর পেয়ে পেয়ে আবদারেরও অন্ত নেই, নারাণী একদিন ধরে বসল তাকেও দেখাতে হবে কলকাতা। গল্প করে নিজের গুরুত্বটাই বাড়ানো উদ্দেশ্য ছিল গুপীর, মেয়েছেলে হয়ে এমন অসম্ভব আবদারটা যে করে বসবে নারাণী, বিশেষ করে কনে-বৌ হয়ে—এটা ভাবতে পারে নি। উল্টো গাইতে আরম্ভ করে দিলে দুদিন—জায়গা অবশ্য বড়ই কলকাতা, তবে সেখানে ভদ্রলোকের মেয়েছেলেরা থাকে? যারা আছে কোন রকমে নাক-কান বুজে আছে। বাড়ি থেকে এক পা বার হবার জো নেই, হলেই হয় ট্রামে চাপা পড়, না হয় গুণ্ডার হাতে, না হয় মিলিটারি। মেয়েদের মধ্যে খালি মেমসায়েব, না ঘোমটার বালাই, না কাপড়ের বালাই, ঠ্যাং-ঠেঙে ঘাঘরা পরে ধিঙ্গি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'ধিঙ্গি' কথাটার ওপর একটু জোর দিয়েই বললে গুপী, ফিরে ফিরে কয়েকবার ঐ কথাটার ওপর এসে পড়ল, যদিই একটু সাড় হয় নারাণীর। কি হল বোঝা গেল না, তবে নারাণীর কথা হঠাৎ অল্প হয়ে গেল, পরদিন আরও অল্প, তারপর দিন একেবারে চুপচাপ।

গুপী মুশকিলে পড়ল। একা নারাণী নয়তো, তার জলজ্যান্ত সংসার, সাবেক বৌ রতনের-মা, চার ছেলে, তিন পুত্রবধূ, তিনটি নাতি, চারটি নাতনী। বড় মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে, সঙ্গে দুটি ছেলে। এদের মধ্যে থেকে একা নারাণীকে নিয়ে গেলে তো চলবে না। রতনের মা ওপরে ওপরে কিছু বলে না, নতুন বৌয়ের আদরযত্নেরও কোন ঘাটতি নেই তার কাছে, তবু মেয়েছেলেরই মন তো, বরং ওপরে ওপরে নারাণীর চেয়ে তাকেই খাতির দেখাতে হয় বেশি আজকাল গুপীকে। ছেলে, পুত্রবধূ, মেয়ে এদের মুখও একটু ভারই থাকে, চলে এ অবস্থায় শুধু নতুন বৌটিকে নিয়ে কলকাতা দেখাতে যাওয়া?

চলে না তো, কিন্তু তার চেয়েও অচল অবস্থা যে এদিকে। অবশ্য

কলকাতা যাবার কথা থেকেই যে এভাবে নারাণী তা বলে না, কাজের অছিলায় গা-ঝাড়া দেয়, ঘুমের অছিলায় মুখ ফিরিয়ে নেয়; কিছু না বলেও মনের কথাটা বেশ স্পষ্ট করে দেয়।

তৃতীয় দিন গুপী বললে—"কই, তুই কলকাতা যাবি বলছিলি, আর শুনি না যে সে-কথা?"

"আমি তো মেমসায়েব লয়।"

"ন্যাও ঠ্যালা। মেমসায়েব ভেন্ন কেউ আর কলকাতা যাবে না?"

"গেরস্তের বৌয়েরা তো সবাই মটোর—টেরাম চাপা যাচ্ছে, গুণ্ডোর হাতে পড়চে।"

"না পড়চে যে এমন লয়, তা তুই থাকবি আমার সেথে। গুপী সামন্ত পাশে আর গুণ্ডো এসে গুণ্ডোমি করবে, এমন গুণ্ডোকে একেবারে দেখতে পেলে হত যে!"

"একলা তো যাওয়া যায় না গো, আক্কেল আছে তো মানুষের? দিদি আচে, ছেলেরা আচে, বোয়েরা আচে, মেয়ে এল শ্বশুর-বাড়ি থেকে, এক-কাঁড়ি ট্যাকা...।"

"তুই আমায় টাকার খোঁটা দিসনে নারাণী, করকরে চারটিশো ট্যাকা গুনে দিয়ে তোকে ঘরে নেলুম। তুই যখন বের করছিস মুখ দিয়ে—যাবে সবাই। তার খরচের ভয়টা কি দেখাস গুপী সামন্তকে?"

পরের দিন সাবেক বৌ রতনের-মাকে বললে—"কালীঘাট কালীঘাট করিস, একবার না হয় চল সবাই, এখন একটু ফুরসত রয়েচে..."

ঘাঘি মেয়েছেলে, সবই খোঁজ রাখে, সবই বোঝে, ঠোঁটের কোণে হাসি চেপে রেখে মুখটা ঘুরিয়ে রতনের-মা বললে—"তা চল না নিয়ে, আর তো বুড়োও হয়ে এনু, মানষের কত সাধ মেটে, আমার না হয় একটাও মিটুক জীবনে।"

ঠিক হল পাল-বৌকেও যেতে অনুরোধ করা হবে। পাল-বৌ বিধবা, নেড়া, বয়স প্রায় সামন্তরই মতন। এদিকে খুব ডাঁটো, অনেক দেখেছে, অনেক ঘুরেছে, মেয়েদের অথরিটি, পুরুষদের তোয়াক্কা রাখে না।

কি রকম লাগছে? তেরস্পর্শ তো ঘটানো গেল—গুপী, নারাণী, আর পাল-বৌকে নিয়ে।

ইঞ্জিনের জল নেওয়া হয়ে গেছে; ছেড়েও দিয়েছে। হণ্টন আর মোটর বাসের পর পরিবর্তনটুকু আরও লাগছে ভালো। রাস্তার ধারের ডান দিকে একটি ঝুরিনামা মাঝারি গোছের বটগাছের নিচে গ্রাম্য দেবতা—মনে হল যেন শীতলা। গাড়ি এগিয়ে গেলেও মনটা রইল আটকে। এই ঠাকুরটিকে দেখলেই আমার মন কাছ-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ে একটু। কারণ আছে—ইনিই আমাদের চাতরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কিন্তু কারণটা শুধু তাই নয়, শীতলা আমার ছেলেবেলার একটা অংশের সঙ্গে আছেন ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে—আমার তখন মাত্র এক ঠাকুরমার অভিভাবকত্বে মুক্ত জীবন—কোথাও শীতলামূর্তি দেখলেই সেই সব দিনগুলি ভিড় করে এসে পড়ে তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে—পূজা, বলিদান, রাস্তায় কে দণ্ডী কাটতে কাটতে গঙ্গা থেকে নেয়ে আসছে—কে অজাত বলে থামের আড়াল থেকে মূর্তির দিকে করুণ নয়নে আছে চেয়ে। যাত্রা হবে, আসর সাজাতে রঙিন কাগজের শেকল তুলে ধরছি—শেষ রাত্রে ভাড়াটে বৌয়েদের জনশূন্য ভুতুড়ে বাড়িটার পাশ দিয়ে একা শিশু যাত্রা দেখে ফিরছি বাড়ি···আমি জীবনে বাঙলাকে নিবিড় ভাবে পেয়েছি সেই একবার; এই যে আজ ঘর ছেড়ে বেড়াচ্ছি ঘুরে—সে তাকেই আবার পাবার জন্যে; কিন্তু মনের সে মুক্তি কোথায়? কোথায় দৃষ্টির সে স্বপ্ন?

যাক্, দুঃখ করে হবে কি? যা করছিলাম করা যাক।

তিন নম্বর হণ্ট গেল বেরিয়ে, তারপর গাড়ি এখন শিবানীপুরে। গল্প বোনা একটু স্থগিত রইল; এ নামটিও বেশ, নয়? জায়গাটা একটু যেন পুরনো বলে বোধ হচ্ছে; অনেকগুলি যাত্রী নামল এখানে। স্টেশনের পরেই একটু নিচু জমি, শুকনো খালই বোধহয়, তার মধ্যে নেমে আবার উঠে লোকেরা চলেছে, জলস্রোতে যেন একটা ঢেউয়ের দোলা। জায়গাটার একদিকে ডায়মণ্ডহারবার রোড, একদিকে এই রেলের লাইন, সেইজন্যে বেশ জমজমাট মনে হচ্ছে; অন্তত এখন মনে হচ্ছে, যখন ওদিকেও ছুটে চলেছে

লরি-বাস, এদিকেও স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে, আর তাই থেকে সদ্য নেমেছে যাত্রীর স্রোত। ছোট জায়গা হলেও অনেকগুলি ভালো ভালো বাড়ি স্টেশন থেকে চোখে পড়ে। বাঁ দিকে একটানা লম্বা ওটা বোধ হয় ইস্কুল। তিন নম্বর হল্ট থেকে খানিকটা বেরিয়ে একটু এসেই একটা অর্ধচন্দ্রাকার বাঁকের মধ্যে গাড়িটা ডায়মণ্ডহারবার রোড পার হয়ে এল, তারপর একটু ফাঁকা মাঠ ভেঙেই এই শিবানীপুর। এপাড়া, ওপাড়া—শিবানীপুরে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়লে তিন নম্বর হল্ট থেকে উত্তর পাওয়া যায়। এ লাইনে এটাও বেশ লাগে। লাইনের যা দৌড়—মোট মাইল পঁচিশেক, তার সঙ্গে বেশ মানানসই করে স্টেশনগুলি কাছে কাছে বসানো। খেলাঘরই তো।

একটা শাখা বেরুল আবার ডায়মণ্ডহারবার রোড থেকে; নতুন হয়েছে মনে হয়, সম্ভবত ফলতা পর্যন্তই গেছে কিম্বা যাবে। চলেছে রেলের সামন্তরালেই, তবে খানিকটা তফাতে থেকে। এরপর একদিন ওর ওপর দিয়েও বাস যাবে, লরি যাবে; তার মানে ফলতা রেলের শনিগ্রহ এদিকেও নতুন পথ কেটে ঢুকল।

গাড়ি ছাড়ল, ভগবানকে ধন্যবাদ; কেউ লোক উঠে নি, আমি একটু নিরিবিলিই চাই।

অথ পুনঃ 'গুপী-নারাণী-পালবধূ কথা ঃ'

রাত তিনটের সময় গোরুর গাড়িতে চেপে বেলা দশটার সময় সবাই ফলতা-কালীঘাট রেলের পৈলান স্টেশনে পৌছাল। প্রায় সকলেই এসেছে, বাড়িতে আছে বড় ছেলে, মেজ ছেলে, বড় বৌ আর নিতান্ত যে কয়টি কুঁচোকাঁচা ছেলেমেয়ে। ওরা তিনজন এরপরে একদিন আসবে। ছেলে দুটির কলকাতা দেখা আছে, আরও কম বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে। বড় বৌয়ের বাড়ি ডায়মণ্ডহারবারের কাছে, কলকাতা না দেখুক, শহর কাকে বলে জানা আছে বলে একটু দেমাক আছে, এবারে বাড়ি আগলাবার জন্য রইল।

গুপী আর পাল-বৌয়ের কথা বাদ দিলে এক শুধু রতনের মা রেলগাড়ি

কি তা জানে, একবার এমনি দেখেছে, দুবার চেপেছেও; বাকি সবাই একেবারে খাজা: কৌতূহলে, উল্লাসে, মন্তব্যে, আবার কতকটা ভয়েও নিজেদের কামরাটা সরগরম করে তুললে। চাষা-ভূষো মানুষ, চাপা গলায় কথা কইবার শিক্ষা কারও নেই, অল্প সময়ের মধ্যেই একটা তামাসার ব্যাপার হয়ে উঠল। সবাইকে তোলবার মধ্যেই গাড়িটা ছেড়ে দেওয়ায় গুপীকে কামরাটার শেষ দিকে উঠতে হল ; সেখান থেকেই প্রশ্ন-মন্তব্য চলতে লাগল— "সবাই উঠল ?—গুনে মিলিয়ে ;—বলি ও রতনের মা ?"

ছোট ছেলে জবাব দিলে—"উঠল সব। ছোট মা জিগুচ্চে তাঁর বোঁচকাটা হাতে ঠিক আচে তো তোমার ?·· মা জিগোচ্চে, লাগল নাকি তোমার তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে ?"

পাল-বৌ বাইরের দিকে মুখ করে বসেছিল, কি ভেবে একটু মুচকে হাসল।

গোটা দুই স্টেশন গিয়ে গাড়ি প্রায় খালি হয়ে এল। কি ভেবে ছেলেগুলো সব উঠে গুপীর কাছে চলে গেল। খানিকক্ষণ উত্তর-প্রত্যুত্তরটা·নাতনীদের মধ্যস্থতায় চলল, তারপর রতনের-মার গলা একটু একটু করে খুলল, আর মধ্যস্থতার দরকার রইল না। সকলে যখন শাড়ি আর কাপড়ের খুঁট ধরাধরি করে মাঝের হাট স্টেশনে নামল, তখন নারাণীর গলাও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। গ্রামের মেয়ে, লজ্জার ভাগটা কখনই বেশী ছিল না, যেটুকু বা ছিল, আহ্লাদের চোটে, চারিদিকের বাক্যস্রোতের তোড়ে সেটুকুও ভেসে গেল। দলের একটা হুল্লোড় আছে তো ?

তা ভিন্ন সে না বাড়ির গিন্নী---রতনের মায়ের পরই ? তার না রতনের মতন সমর্থ ছেলে, অনঙ্গর মত মেয়ে, তিলির মতন সমর্থ নাতনী ?

শেকলের মতন হয়েই সকলে ট্রামে উঠল। খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, তার পরই মুখর হয়ে ওঠে, কর্তা হিসাবে গুপী ধমকায়, ভয় দেখায়, বোঝায়। কথা কয় না শুধু পাল-বৌ, সে যেন শক্তিসঞ্চয় করছে—একেবারে চরম প্রয়োজন না হলে মুখ খুলবে না। এইভাবেই কালীঘাটের ট্রাম বদলি হয়ে শেষে ট্রাম-ডিপোয় এসে নামল।

সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডার হাতে পড়ল, আদি গঙ্গায় স্নান হল, দর্শন হল, আহার হল, তারপর গুপীকে একটু আড়ালে পেয়ে নারাণী বললে—"এইবার আসল, যার জন্যে আসা, তার ব্যবস্থা কর।"

গুপী জিভ কেটে, যাতে কথাটা মন্দির পর্যন্ত না পৌছয়, এইভাবে বললে—"ও কথাটা আর এখানে দাঁড়িয়ে বলিস নে। আসলে তো এই তিথ্‌থি করতেই আসা, তিথ্‌থির চেয়ে আর বড় কি আচে এই ছাই সংসারে?"

—একবার মন্দিরের দিকে আড়ে চেয়ে দৃষ্টিটা টেনে নিলে।

মা-কালীর এলাকার মধ্যে নারাণী আর প্রতিবাদ করলে না বটে, কিন্তু আসলে কথা তো তা নয়; এমনকি, শুধু কলকাতা দেখানো নয়, কলকাতার মধ্যে যেটুকু আসল কথার অংশ ছিল, সেটুকুও উবে এসেছে এর মধ্যে—ভিড়ে, চেঁচামেচিতে, নানান রকম গাড়ির হিড়িকে প্রতিপদেই মোড় ফিরতে ফিরতে!....একেবারে আসল কথা বায়স্কোপ। সে নাকি এক আজব জিনিস, কলকাতা শহরের চেয়ে আরও আজব—ছবির লোকেরা হাসে, কাঁদে, নাচে, গান গায়, গাড়ি হাঁকায়, দাড়ি কামায়—হেন জিনিস নেই, যা করে না। বাড়ির মধ্যে দেখেছে এক গুপী, বড়ছেলে আর মেজছেলে। বড়বৌও বলে দেখেছে, শহরের কাছের মেয়ে কিনা, কিন্তু ওর দেমাকের জন্য ওর কথা বিশ্বাস করতে হচ্ছে করে না কারুর।

জিনিসটা সেদিন এসেছিল মীরগঞ্জে দাঁয়েদের বড়কর্তার মেয়ের বিয়েতে, তা সামন্তদের সঙ্গে তো ওদের জমি নিয়ে ঝগড়া তখন, কারও দেখা হয়নি।

কলকাতা দেখার কথাটা পাকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারাণী বায়স্কোপের কথাটাও পাকা করে নিয়েছিল; শেষে আলোচনায় আলোচনায় ঐটেই আসল কথা দাঁড়িয়েছে। নারাণী বলে—"শুনতেই সামন্তের পরিবার—অনেকের আবার চোখ টাটায়, বলে আদুরী, তা আদর তো কত! তুশ্চু একটা বায়স্কোপ নিয়ে মীরগঞ্জের এতটুকু মেয়ে পর্যন্ত য্যাখন বড়াই করে, লজ্জায় মাথা তুলতে পারি নে; বড়বৌয়ের দেমাকের কথা বাদই দিনু।"

গুপী ভাবে, না হয় আর একটা আবদার, বায়স্কোপের ওপর তো আর

উঠবে না, এই তো শেষ, বলে—"তা এবার তুইও বলবি—একেবারে কলকাতার বায়স্কোপের কথা; মীরগঞ্জের কে তোর সামনে দাঁড়ায় দেখিস না!"

কিছু কেনাকাটা করে, চিড়িয়াখানাটা সেরে সন্ধ্যার একটু পরে সামন্ত পরিবার ভবানীপুরের একটা সিনেমার সামনে ট্রাম থেকে নামল। গুপী থেকে আরম্ভ করে ছোট নাতিটি পর্যন্ত তেরজন। বেটাছেলেদের গায়ে একটা করে পিরান, কাপড়-জামার খুব বেশি মিল নেই, হাতে একজোড়া করে নতুন জুতো, সেজ ছেলেটি পায়ে দিয়ে মুখ কুঁচকে খোঁড়াচ্ছে। গুপীর গায়ে একটা নতুন ফতুয়া, এখানেই রাস্তার ধারে কিনলে। পরনে ক্ষারে-কাচা কাপড়। বাড়ি থেকে পুরনো জুতোটাই পরে এসেছিল, অনেক জায়গায় তালি পড়েছে বলে কালীঘাটের বাসাতেই চাবি বন্ধ করে এসেছে; ঠিক করেছিল একজোড়া কিনবে, তা পায়ের মাপে পাওয়াই গেল না কটা দোকান ঘুরে। খালি পায়েই আছে।

বৌ আর মেয়েদের পরনে নীল, সবুজ বা ময়ূরকণ্ঠি সিল্কের শাড়ি, বোধ হয় বেশি তোলা থাকার জন্যে একটু রং-চটা, গায়ে মোটা মোটা রুপোর গয়না, ক্বচিৎ ছোটখাট এক-আধটা সোনার। ভ্রূর মাঝখান থেকে মাথার ব্রহ্মতল পর্যন্ত টানা তেলে-গোলা সিঁদুর। নারাণীর চাকচিক্যটা ওরই মধ্যে একটু বেশি।

সিনেমা আরম্ভ হয়ে গেছে, টিকিট-ঘরে ভিড় না থাকলেও কিছু লোক আছে। কয়েকজন পরের শো'র টিকিট কিনছে, কয়েকজন এমনি ঘুরে-ফিরে দেয়ালের ছবিগুলো দেখে বেড়াচ্ছে।

সেই রকম-শাড়ি-ধুতির খুঁট-ধরাধরি করে সকলে টিকিট-ঘরের একপাশে গিয়ে দাঁড়াল। যা দেখে, তাই নতুন, উৎসুক প্রশ্ন মন্তব্যে ছোটদের মধ্যে একটু সোরগোল পড়ে গেল। রতনের-মা প্রভৃতি সঙ্কুচিত হয়ে রইল, তবে পাল-বৌ সবাইকে ধমকে, শহর জায়গায় কি করে চলতে হয় উপদেশ দিয়ে গোলমালটা আরও বাড়িয়ে তুললে। কলকাতায় পা দেওয়ার পর থেকে তার মুখ খুলেছে।

গুপী কাউণ্টারে গিয়ে বললে—"টিকিট দেন বাবু—তেরজনের।"

ঘুরে মোটা গলায় জিজ্ঞেস করলে—"তেরজনই তো বটে গা? আর একবার গুনে দেখবিনে, বলি ও পাল-বৌ?"

পাল-বৌ ঘরের ও-প্রান্ত থেকে সেই রকম গলাতেই উত্তর দিলে—"বালাই, ষাট, থেকে থেকে মানুষ গোনে কখনও? যত অলুক্ষ্ণে কাণ্ড তোমাদের বাপু! বলি গাড়িতে কখানা টিকিট নেছলে?

সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল, পাশের ভদ্রলোকটি গুপীকে বললে—"একটু সরে দাঁড়াও, একি এ!"

কারুর কাছে নিচু হওয়া গুপীর ধাতে নেই, তার ওপর আবার নারাণী রয়েছে কাছে, সমস্যায় ফেলে পাল-বৌও মনটা দিয়েছে খিঁচড়ে; ঘুরে বললে —"সরে দাঁড়াব কেন মশাই? আপনিও পয়সা দে টিকিস কিনচ, আমিও পয়সা দে...."

বুকিংক্লার্কের এতক্ষণে বাকস্ফূর্তি হল, বললে—"কিন্তু টিকিস যে আর নেই হে কর্তা।"

গুপী ঘুরে হাঁকলে—"বলি ও পাল-বৌ, টিকিসবাবু যে কয় আর টিকিস নেই, সব ফুইয়ে গেল, তার কি করচ?"

বুকিংক্লার্ক একটু তামাসা দেখবার জন্যেই বললে—"পাল-বৌকে বল নিচু ক্লাসের টিকিস ফুরিয়ে গেছে, উঁচু ক্লাসের আছে—একেবারে উঁচু ক্লাসের।"

গুপী ঘুরে শুনে নিয়ে হাঁকলে—"বলি, শুনলে কি কয় টিকিসবাবু— কয়— নিচু কেলাসের টিকিস ফুইরে গেচে, একেবারে উঁচু কেলাসের আচে। রতনের-মা কি কয়? একবার লোতুন বৌকেও সুদোবেনি?"

কাউকেও সুধানো পাল-বৌয়ের কোষ্ঠীতে লেখা নেই; সঙ্গে সঙ্গে সেই রকম গলায় ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে উত্তর দিলে—"বলি, নিচের ডালে ফল না পেলে মগডালের ফলটা তুলে নেবেনি?"

গুপী একটু অপ্রতিভ হয়ে বললে—"তা নোবনি? এ কেমনধারা কথা বলতেচ? নিচের ডালে না পেলে মগডালের ফলটা নিতে হবে বৈকি।"

রে বললে—"তবে দেন বাবু, উঁচু কেলাসের টিকিসই দেন।"

কৌতুকের সঙ্গে অবাক হয়ে যাবার ভাবটা চারিদিকেই বেড়ে গেছে, বুকিংক্লার্ক একটু হেসে বললে—"কিন্তু এদিকে সিনেমা আরম্ভ হয়ে গেছে বাপু পাল-বৌ, নতুন-বৌ সবাইকে জিগ্যেস করে দেখ একবার বরং।"

গুপী আবার ঘুরল—"বলি, অ-পাল-বৌ, বাবু যে কয় উদিকে শুরু হয়ে গেচে, তার কি করচ ?"

পাল-বৌ এবার একটু রেগেই বললে—"তোমরা শহর জায়গায় এসব ফ্যাসাদ ঘাড়ে করে এসে আর নোক হাসিওনি বাপু। বলি, নেমন্তন্নটা শুরু হয়ে গেলে ফিরে এস, না…"

"তা কি ফিরে এসি ? বলি, তা কি ফিরে এসি ?"—বলে অপ্রতিভভাবে আবার ঘুরে গুপী বললে—"তাহলে দেন, ঐ শুনলেন তো ?"

জটলা বেশ জমেছে ! মন্তব্যও শুরু হয়ে গেছে নানা রকম · "পাটের টাকা মশাই ! দিন কত উঁচু ক্লাসের আছে আপনার, কত্তাকে মটকায় বসিয়ে দিন একেবারে।…বাড়িটাই কিনে নাও না হে কর্তা, টিকিট কেনবার ল্যাটাই চুকে যাক।….গোটা কতক বাক্স গছিয়ে দিন না, আছে খালি ? পাল-বৌয়ের সিমিলি-মেটাফোরগুনো কেমন জোরালো দেখছ ! আর হাঁ করতে দিলে না কত্তাকে।"

সামন্তের ভ্রূক্ষেপ নেই।

বুকিংক্লার্ক সেই রকম অল্প হাসতে হাসতেই বললে—"তাহলে ঠিক করে গুনে বল কতগুনো দিতে হবে; আন্দাজে তো আর দেওয়া যায় না।"

গুপীর বোধহয় সাহস কমে আসছিল পাল-বৌকে ঘাঁটাতে, তবু নিরুপায় হয়ে জিগ্যেস করলে—"ঐ শুনলে টিকিস-বাবু কি জিগ্যেস করচেন তোমায়, বলি অ-পাল-বৌ ? একবার গুনলে চলবে না যে, তার কি করচ ?"

গুপীর সেজ ছেলে ভগীরথ খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল, বললে—"আমি গুনে দেব বাবা ?"

"তোদের ঠানদিদিকে সুদো।"

পাল-বৌ বললে—"তবে এক গোরু, দু গোরু করে গোন ; খবরদার 'জন'

বলবি নি। জানি নে বাপু, যেমন বড় মুখ করে নিয়ে এনু, তেমনি ভালয় ভালয় ফিরিয়ে নে যেতে পারি সবগুনোকে, তবেই....”

প্রবেশ-পর্ব আরম্ভ হল।

এদিকটা, অর্থাৎ শিবানীপুরের পর থেকে আবার অন্য রকম। হোক অল্পটুকু, তার মধ্যে কিন্তু ফলতা লাইনের দৃশ্য-বৈচিত্র্য আছে; ঘোলসাপুর-ঠাকুরপুকুর অর্থাৎ বেহালা-বঁড়শের খিড়কি দিয়ে যেখানে পথ কেটে এসেছে সেখানটা জঙ্গুলে,—সবুজের সঙ্গে যেন মাথামাখি করতে করতে বেরিয়ে এল গাড়িটা; তার পরেই ডায়মণ্ডহারবার রোডের মুক্ত প্রাঙ্গণ, নবীন এসে এই সবে নব উৎসাহে পা ফেলেছে,—বাড়ি-বাগান-শহর উঠেছে গড়ে, গাঁয়ের বৌ সেজেগুজে যেন চলেছে কলকাতায়! শিবানীপুর থেকে ভাবটা বদলাল। ডান দিকটা প্রায় ফাঁকা, বাঁ দিকে দূরে কাছে একটার পর একটা গ্রাম। একটা বাঙলার পুরনো গ্রাম, ভদ্রপল্লী, বড় বড় নানারকম গাছ, ডোবা, মজা পুকুর, ইটের পুরনো বাড়ি—দোতলাও আছে তার মধ্যে, ঘন গাছপালার মধ্যে খানিকটা আত্মগোপন করে—পতিত অভিজাত কোঁচার ভাঁজে ছেঁড়া লুকুবার চেষ্টা করছে।

গ্রামের বাইরে একটা ইটের পাঁজা, জীর্ণ হয়ে গলে গলে পড়েছে জায়গায় জায়গায়। মাথায় একটা অশত্থ, নিতান্ত ছোট নয়।...একটা আনন্দ-মুখর গৃহ গড়ে ওঠবার কথা ছিল কোন্ দূর অতীতে; তারপর পায়নি গড়ে উঠতে; কে জানে কত আশা-নিরাশার কাহিনী সে।

পুরনো বাঙলার গ্রাম ইতিহাসের ছেঁড়া বই, একটু ইঙ্গিত দিয়ে খেই হারিয়ে চলেছে...তাই তো আরও টানে—আলো-আঁধারিতে আলেয়া, ক্রমাগতই খুঁজে চল, ক্রমাগতই খুঁজে চল!

স্টেশন এল দীঘিরপাড়। এই আবার আলেয়ার আলো ঝলকে উঠেছে। কার দীঘি? কি তার কাহিনী? খুঁজে দেখ—কোথায় হাজা দীঘির দামের নিচে, পাড়ের জঙ্গলে পুরনো বাঙলার রূপ-কথা আছে চাপা দেওয়া —রায়েদের প্রতাপ, মুর্শিদাবাদের অর্ধসুপ্ত নবাবের হুঙ্কারের এক-আধটা

আওয়াজ এসে পৌঁছুচ্ছে মাঝে মাঝে, ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের এক-আধটা কাহিনীর টুকরা।···বহু দূরে ঐ যে টানা নাবাল জমিটা এঁকেবেঁকে বেরিয়ে গেছে হয়তো ছিল গঙ্গার শাখাই, ওলন্দাজ-পর্তুগীজদের বোম্বেটে ওরই ওপর দিয়ে এসে দিত হানা, ক্বচিৎ আরাকানী মগ, দীঘিরপাড়ের রায়েদের ছিপ থাকত অতন্দ্র প্রহরায় তাদের জন্যে ওত পেতে···

জীবন্ত বাঙলার রোম্যান্স,—তার কায়া নেই, আছে ছায়া। মন্দ কি?—ছায়াতে মায়া জাগায় আরও বেশি করে, তারই টানে আসে বঙ্কিমের দল—মাটির রোম্যান্সকে বইয়ের পাতায় অমরত্ব দেয়—দুর্গেশনন্দিনী—সীতারাম এই রোম্যান্সই রূপান্তরিত হয়ে ওঠে নববেদ-এ—আনন্দমঠের নব-সূক্ত 'বন্দে মাতরম্': রবাহূত হয়ে জেগে ওঠে অরবিন্দ-সুভাষেরা··· বটমূলদীর্ণ-বাঙলার পল্লীগুনোকে অবহেলার চোখে দেখ না।

এক ধরনের মৌন বেদনায় মনটা আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে, দিনের আলোটাও আসছে আস্তে আস্তে মলিন হয়ে। নাঃ, এ সময় পুরনো বাঙলার পূরবীকে প্রশ্রয় দিলে আমার অমন গল্পটাকে আর মাথা তুলতে দেবে না। থাক্ এখন, গুপী-নারাণীদের টিকিস কেনা হয়ে গেছে ওদিকে, আমার মাথার মধ্যে কোথায় সিনেমার দরজার সামনে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে দাঁড়িয়ে—

বলছিলাম—প্রবেশপর্ব আরম্ভ হল। প্রথমে সবার হাতে হাতে টিকিট থাকবে কি একটা সামন্তের হাতেই থাকবে সেই নিয়ে একটা সমস্যা উঠল। সেটা পাল-বৌয়ের একটা উপমায় সমাহিত হয়ে গেলে সবাই দরজার গোড়ায় গিয়ে জমা হল। গুপী টিকিটগুনো নিয়ে একপা ভেতরে সাঁদ করিয়েই সঙ্গে বের হয়ে এল। পূর্বে যে দুবার গেছে, আলোয় আলোয় গেছে, মুখটা অন্ধকার করে বললে—"ভেতরে যে অমাবস্তের আঁধার, তার কি করচ, বলি হ্যাঁ পাল-বৌ?"

টিকিট-চেকার বুকিংক্লার্কের পানে চেয়ে একটু ঘাড়টা নাড়লে—অর্থাৎ বাধিয়েছেন ভ্যালা এক ফ্যাসাদ! গুপীকে বললে—"কিছু ভাবনা নেই গো কর্তা, ভেতরে আলো দেখিয়ে নিয়ে যাবে, চেঁচামেচি কোরো না কিন্তু। এস, এক একজন করে ঢোক।"

ভেতরের গাইডকে বলে দিলে—"একটু কেয়ারফুলি নিয়ে যান।"

পাল-বৌ লাইনটা ঠিক করে দিলে। প্রথমে থাকবে সামন্ত, তারপর নিচের দিক থেকে বয়স হিসাবে ছেলেরা, তারপর বয়স হিসাবে ছোট মেয়েরা, তারপর নারাণী, অনঙ্গ, রতনের মা; সবশেষে পাল-বৌ পাকা রক্ষী হিসাবে। খুব সাবধান করে দিলে—"কেউ কাউকে ছাড়বি নি, খবরদার! এ মীরগঞ্জের কার্তিক পুজোর মেলা নয়।"

টর্চ জেলে গাইড সামনে চলেছে। জনচারেক যখন ভেতরে গিয়েছে গুপী সাড়া পাবার জন্যে হাঁক দিলে—"ভগা আছিস? তিলি আচিস? লক্ষ্মী আচিস? ন্যাংটা আচিস?"

"সাইলেন্স! সাইলেন্স! চুপ করুন! চুপ কর!"—করে সমস্ত ঘরের মধ্যে একটা কলরব উঠল। এদিকে ভয়ে কচি ছেলেমেয়েগুলো গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দিয়েছে, এক মুহূর্তেই অন্ধকার ঘরটা আবার উৎকট হয়ে উঠল। একে অন্ধকার, তায় এই ব্যাপার, সামন্ত ঘাবড়ে গিয়ে আরও গলা তুলে হাঁকল…"পাল-বৌ আছ?—বলি অ পাল-বৌ, লোতুন-বৌ আচে?— বলি রতনের-মা…?"

কলরব উঠল যেন ছাদ ভেঙে পড়বে—"চুপ কর!…ঘাড় ধরে বের করে দাও!…স্টপ, স্টপ!…বন্ধ করে দাও!….আলো জ্বাল।…লাইট! লাইট…!"

সবার ওপর পাল-বৌয়ের কণ্ঠস্বরের ভগ্নাংশ শোনা গেল—"ঠিক আচি, আমার জন্যে ভেব নি…!"

এমন সময় আলো জ্বলে উঠল। এরা সবাই ততক্ষণে ভেতরে এসে গেছে, আর কোঁচার খুঁট না ছেড়ে গুপীর চারিদিকে মাঝখানে রাস্তাটার ওপর জটলা করে দাঁড়িয়েছে। ছেলেমেয়েগুনোর কান্না গেছে থেমে, সবাই হাঁ করে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে, মুখে কারও প্রশ্ন-মন্তব্য কিছু নেই, সবাই হতভম্ব হয়ে গেছে।

এদিকে প্রায় হাজারখানেক লোকের প্রত্যেকের দৃষ্টি তাদের ওপর নিবদ্ধ। নির্বাক, একটা স্থচ ফেললে তার আওয়াজটি যায় শোনা। কিন্তু

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, তারপরই আবার কলরবটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, যেন আরও উগ্ররূপে। "বের করে দাও!...থার্ডক্লাসের দিকে নিয়ে যাও! কে ওদের ঢুকতে দিলে?....ম্যানেজার কোথায়? গেট আউট!"

প্রায় সব গাইডগুলোই একত্র হয়ে টানাছেঁড়া করবার উদ্যোগ করেছে —"এদিকে, এদিকে এস...না, ওদের থার্ডক্লাসে আসতে দিন...টিকিট আছে তোমাদের?...কি করে ঢুকে পড়ল দলবল সুদ্ধ্য?—চল বাইরে!..."

চারিদিক থেকে থাবা খেয়ে সামন্ত একেবারে মরিয়া হয়ে উঠল। দলের সবাইকে ঠেলে সামনে এসে গলাটা একটু বাড়িয়ে মুখ খিঁচয়ে বললে— "বাইরে যেতে হবে! গুনে দু-কুড়ি নোট দিয়ে টিকিস কিনেচি, তার আধখানা এখনও এই মুঠোর মধ্যে রয়েছে!...বলে, কি করে ঢুকলে—বাইরে চল!—ভারি আমার বাইরে নে'যাবার গোসাইরে!"

ঘাড় ফিরিয়ে বললে—"একবার আহ্লাদের কথাটা শুনে থুয়ো পাল-বৌ, —বলে বাইরে যাও!"

পাল-বৌ থতমত খেয়ে গিয়েছিল, কি রাগ জমাচ্ছিল, বলা যায় না, সামন্তর কথায় কোমরে দুটো হাত দিয়ে সামন্তের চেয়েও একপা এগিয়ে একটু ঝুঁকে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে—"কী আমার সাতপুরুষের কুটুমরে, ওনার কথায় বাইরে যেতে হবে। হাইকোট কলকেতা দেখাতে এসেচে! আইন নেই? আদালত নেই? হাইকোট নেই? এই পাল-বৌ এসে সামনে দাঁড়াল, দেখি একবার অবলা মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে কে...."

এমন সময় ম্যানেজার এসে উপস্থিত হল। এতক্ষণ টিকিট-ঘরে, গেটে, আদ্যোপান্ত তথ্য সংগ্রহ করছিল, সম্ভবত এ অবস্থায় জবরদস্তি বাইরে বের করে দেওয়া চলে কিনা সে সন্ধানও নিচ্ছিল। শান্ত কণ্ঠে বললে—"ওগো বাছা থাম। বের করতে যাবে কেন? তার দরকারই বা কি? চল দিকিন, তোমাদের জন্যে আলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছি, যাও এবার নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে বসো। তাড়াবার কথা কি আছে?"

একজন গাইডকে বললে—'যাও, কত্তাকে, পালবৌকে আর সবাইকে যত্ন করে নিজের নিজের জায়গা দেখিয়ে দাও।"

এতক্ষণ দর্শকদের সবাই নির্বাক ছিল একেবারে, এরা এগুতেই প্রথম শ্রেণীর যারা একেবারে কাছের তাদের মধ্যে অতি-শৌখীনগোছের কয়েক-জন প্রবল আপত্তি করে উঠল—"এখানে নয়!…এদিকে নয়!….নিচের দিকে নিয়ে যাও…!"

কিন্তু পাল-বৌয়ের অবলা-নারীত্ব তখন সম্পূর্ণ জেগে উঠেছে। "মেনী-মুখোদের কম্ম নয়, তুমি পেছনে যাও।"—বলে সামন্তকে ঠেলে তার জায়গায় দাড়িয়ে আবার এগুতে এগুতে দুলে দুলে আরম্ভ করলে—"উঁচুর টাকা গুনে দিয়ে নিচুতে গিয়ে না বসলে সুখ হবে কেন বাবুদের! ইস্, বাবু! নিফাইন্ ধুতি-চাদর! ফুরফুরে গন্ধ!…এই আমি বসনু, তোরাও সব বোস্ গ্যাট্ হয়ে, বোন্ বাবু ওটায় দেখি ভালো করে…"

ম্যানেজার চলে গিয়েছিল, আলো নিভে আবার সিনেমা শুরু হয়ে গেল।

গল্পটা আমার এখানেই একরকম শেষ হল। কিন্তু নারাণী এখনও মনটা দখল করে রয়েছে। নাতনীকে যে ভালোবেসে ফেলেছি শুধু তাই নয়, মনে যা ছাপ রেখে গেছে তাতে কেমন একটা অস্বস্তি লেগে রয়েছে যে গল্পের নায়িকা হিসেবে বেশ ভালোভাবে ফোটে নি এখনও—কি যেন বাকি রয়েছে—ও যা মেয়ে, এত সহজে সামন্তকে রেহাই দেবার পাত্রী নয়।… বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেছি, তারপর ওদের দুজনের সাজগোজের কথা মনে পড়ে গেল…গল্পটা আরও একটু টেনে নিয়ে গিয়ে সামন্তকে আরও একটু নাকাল করিয়ে ছাড়া গেল। বাঃ, মাত্র চারটি শ' টাকা দিয়ে খালাস হবে, —নারাণী আমাদের এতই খেলো নাকি?

বেশ খানিকটা হিড়িক গেল। টাকাও একচোট বের হয়ে গেছে জলের মতনই পুরুষানুবিক্রমে। তা যাক, সামন্তের বিশেষ খেদ নেই, আবদারের হাত থেকে রক্ষা পাবে অন্তত। একটু সুখ হয়েছে, বুড়ো বয়সে শখ করে একটা বিবাহ করলে, তা আবদারে-অভিমানে একেবারে যেন অতিষ্ঠ করে

তুলেছিল। আর কি, রেলগাড়ি হল, টেরাম হল, বাস হল, কালীঘাট হল, সিনেমা হল—সারা কলকাতাটাই গেল হয়ে, বাকিটা কি রইল ?

প্রথম দেখাতেই কিন্তু আবার সেই মুখভার, কথা-বন্ধ। গুপী প্রথমটা তো হাঁ করেই রইল, কথা বের হবার মতো অবস্থা হলে বললে—"ব্যাপারখানা কি রে নারাণী? সবই তো হল—ট্যাকাকে তো ট্যাকাই বললুম নি।"

"ট্যাকা নিয়েই থাক গিয়ে।"

"না হয় বলই কথাটা কি ?"

অনেক সাধাসাধির পর নারাণী মুখ খুললে—"একখানা বনলতা শাড়ি আর এক জোড়া বনলতা ঝুমকো..."

"সে আবার কি ? বাপের কালে তো নামও শুনিনি।"

"ঐ যে বায়স্কোপে মেয়েটা পরেছিল—এই রকম নাক, টানাটানা চোখ, বাজারে ঐ নাম বললে পাওয়া যায়, অবিশ্যি কলকাতার বাজারে..."

"তুই নাম টের পেলি কার কাছে তাই সুদোই। ঝগড়ায় আর অন্ধকারেই তো কেটে গেল !"

মাসখানেক পরে অনেক চেষ্টায় এবং প্রচুর ব্যয়ে হল সংগ্রহ। খুব গোপনে সরবরাহ করে সামন্ত বললে—"তেমনি কোন কিছু হলে পরবি, লুকিয়ে থো। এবার হল তো ?"

দুটো দিন কিছু নয়, আবার তৃতীয় দিনে মুখভার, অভিমান, কথা-বন্ধ। আবার খানিকটা হাঁ করে থাকবার পর যখন কথা কইবার একটু সামর্থ্য হল, সামন্ত প্রশ্ন করলে—"আবার কি হল রে নারাণী? সব দিলুম তো এনে, ট্যাকাকে তো খোলামকুঁচি করে থুলুম।"

"ট্যাকা নিয়ে থাক তুমি।"

"না হয় শুনিই ভিতরের কথা কি ?"

"তুমি অমন হেঁটু-পজ্জন্ত কাপড় পরে, ময়লা গামছা নিয়ে আর বেইরো নি।"

"তবে? চাষার ছেলে, এই করেই তো পুরুষানুবিক্রমে চলে এল রে নারাণী; বলি, তবে?"

"তবে কি? একটা পিরান তোয়ের করাও। গলার এখানটা বন্ধ, এই রকম বেঁকা পটির ওপর বোতাম, কনুইয়ের কাছটা খোলা, কব্জির ওপর কড়াক্কর করে চাপা, হেঁট-পজ্জন্ত ঝুল। বায়স্কোপে সেই যে ফর্সা ছেলেটার গায়ে ছেল, মেয়েটার বরের। পিরু দরজির কম্ম নয়, সেই কলকাতা থেকে আনতে হবে। কে জানে, বিরুয়া পাঞ্জাবি না কি একটা নাম শুনন্থ যেন···কত মনে করে রাখবে লোকে? বলে নিজের ভাবনাতেই মরচি!··"

এবার যা হাঁ হল সামন্তের, সহজে আর বন্ধ হল না।

সমাপ্ত।

গল্প সমাপ্ত হলেও নারাণী কিন্তু সমাপ্ত হতে চাইছে না। একটি অনির্বচনীয় মাধুর্যে মনটা যেন আচ্ছন্ন করে আছে। এ যেন সেতারে মিশ্রতারের ঝঙ্কারটা থেমে যাওয়ার পর একটা তারের রনরনানি আর যেতে চাইছে না।

ভাবছি কেন এমনটা হয়। নারাণী তো একলা ছিল না, আরও যারা ছিল—দোকানী, গুপী, দোকানীর নাতি, কেউ তো নিজের নিজের জায়গায় কম মধুর ছিল না, বিশেষ করে ঐ কিশোরটি—যদি মাধুর্য আর কমনীয়তার কথাই ধরা যায় তো নারাণী তো ওর কড়ে আঙুলের কাছেও লাগে না। তবু সবাইকে ছায়ায় ঠেলে নারাণীই রইল উজ্জ্বল হয়ে; কেন?

Sex? ··গোড়াতেই বলে রাখি Freud নিয়ে তোমাদের অত বাড়াবাড়িতে আমার মন সায় দেয় না। কোন কোন তত্ত্ব, গড়ে ওঠবার মুখেই তাদের অভিনবত্বে ফ্যাশান হয়ে ওঠে, তাইতে তাদের পরিণতি আপাতত যায় রুদ্ধ হয়ে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বেরও হয়েছে তাই। আমার মনে হয় এ ঝোঁকটা কেটে গেলে তখন ওর যথার্থ বিশ্লেষণ হবে আরম্ভ, তখনই সত্যের সত্যতর রূপের পাওয়া যাবে সন্ধান, Libido-র এ একচ্ছত্রত্ব আর থাকবে না।

যাক সে কথা আমার চিন্তাটা ঠিক তত্ত্বের পথ ধরে যাচ্ছেও না। আমি ভাবছি একটা অদ্ভুত কথা—প্রশ্নগুলা অনেক সময় অদ্ভুত আকারেই ওঠে আমার মনে,—ধর এই যে দ্বৈত ব্যবস্থা, স্ত্রী আর পুরুষ, তার পাটই নেই

স্বষ্টিতে—শুধু পুরুষ আছে; কি রকম হয় সেটা? সন্তান-কোলে নতদৃষ্টিতে মা নেই বসে, স্ত্রী নেই স্বামীর পথ চেয়ে, সেবা-স্বন্দর হাতে বোন নেই ভায়ের পাশে, দেহমনে উদ্গত প্রেমের অর্ঘ্য সাজিয়ে তরুণী নেই তরুণের জন্যে বরমাল্য হাতে করে।...আকাশ রুক্ষ, তাতে বিরহের হা হুতাশের বাষ্প জমে ওঠে না, মিলনের আনন্দ ওঠে না নক্ষত্র হয়ে ফুটে। বর্ষা ব্যর্থ, বসন্ত নিষ্প্রয়োজন। ফুলের নেই কম-অঙ্গের উপমা হয়ে ফুটে ওঠবার সার্থকতা, কুঁড়ির নেই না-ফুটে ওঠবার গৌরব। সীতা নেই, দ্রৌপদী নেই, তাই বাল্মীকি নেই, ব্যাস নেই; হেলেন নেই, তাই হোমর নেই, বিয়াত্রিচে নেই, তাই দান্তে নেই; জননী-মেরী নেই, তাই জন্মাল না র‍্যাফেল, মমতাজ নেই, তাই স্বচ্ছ মর্মর পর্বত-কারাতেই রয়ে গেল চিরমৃত্যুর কোলে, কালের কপোলে দুই বিন্দু অশ্রুর অমরত্বলাভ করতে পারলে না।

বৃন্দাবনে রাধাহীন শ্রীকৃষ্ণ, গাঙ্গিনীর তীরে কার রূপ নিয়ে ঐশীশক্তি হবেন আবির্ভাব যাতে পাটনীর কাঠের সেঁউতি যাবে সোনা হয়ে?

ওরাই কেন্দ্র, ওরাই নানারূপ স্বষ্টির সংহতি, ওরাই স্বষ্টির শ্রী। এক নারীই পারে গৃহ হতে দূরে, পথপ্রান্তের একটি বিপণিতে মাত্র একটি ঘণ্টার অবসরে এমন করে সেবা-শ্রী ও-স্নেহ-প্রেমে পূর্ণাঙ্গ একটি সংসার গড়ে তুলতে —একাধারে সখী, ভগ্না, জননী, কন্যা, প্রেয়সী। একই শক্তি দশভুজা. প্রহরণ নয়, প্রসাদময়ী।

হরিণডাঙ্গায় গাড়ি বদল করলাম। একলা একলা আর ভালো লাগছে না, তবে একদিকে যেমন সঙ্গীর অভাব অনুভব করছি অন্য দিকে তেমনি আবার ভিড়ের আইডিয়াতেও মনটা সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে। অবস্থার মধ্যে যতটুকু সাধ্য অভিনবত্ব স্বষ্টি করে চলতেই আমার ভালো লাগে—তাতে ভালোও আছে মন্দও আছে, কিম্বা ভালো-মন্দের প্রভেদই নেই।

আমার মনে হয় অভিনবত্ব দিয়ে এই অল্পদিনের আয়ুটাকে অনেকখানি বাড়িয়ে নেওয়া যায়, মহাকালকে দেওয়া যায় ফাঁকি। সময়ের দীর্ঘতার দিক দিয়ে আয়ুর পক্ষপাতী নই আমি মোটেই, একটা ভদ্রগোছের মাপিকসই আয়ু

পেলেই সন্তুষ্ট থাকব—অর্থাৎ যতদিন পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের—এই আজন্ম পাঁচটা সঙ্গীর আয়ু আছে অটুট। তারপরেও যে বেঁচে থাকা (থাকার আকাঙ্ক্ষা বলাই ভালো) সেটাকে হ্যাংলামি ছাড়া অন্য আখ্যা দেওয়া যায় না। অবশ্য প্রকৃতির চক্রান্ত, উপায় নেই, তবে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই হ্যাংলামির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার বের করেছিলেন একটা উপায়,- পঞ্চাশের পর বাণপ্রস্থ, তদূর্ধ্বে যতি। যারা ষোড়শোপচারে জীবনটাকে ভোগ করতে পারছে, তাদের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে আর কি হবে? মানসম্ভ্রম নিয়ে সরে পড়; বরং একটু নিরিবিলিতে বসে দেখ, এই বিরাট বঞ্চনার কিছু রহস্য ভেদ করতে পার কিনা। মহামায়ার মুখোসটা পার কিনা টেনে নামিয়ে ফেলতে।

যা বলছিলাম,—নিত্য অভিনবত্ব। সময় জিনিসটাকে বাড়ানো যায় না, এক ঘণ্টাটাকে দু ঘণ্টা করা যায় না, একটা দিনকে দুটো দিন নয়, কিন্তু কালের স্থিতিস্থাপকতা রবারের চেয়েও সহস্রগুণ বেশি, একটা দিনের থলিতে কত বৈচিত্র্য যে তুমি ভরে দিতে পার তার লেখা-জোখা নেই, আর যত বৈচিত্র্য ততই নিজেকে পেয়ে নেওয়া বেশি করে। আয়ু আর কাকে বলবে?—তার তো দুটো লেজ নেই, এই জিনিসই। আমার এই আজকের দিনটাই দেখ না, কতখানি বেঁচে, কতখানি এগিয়ে গেছি আর ছ মাস ধরে সেই যে ছটায় ওঠা, আটটায় স্নান, নটায় খাওয়া, দশটায় অফিস; আবার দিনগত সবরকম পাপক্ষয় সেরে রাত এগারটার শয্যাবলম্বন—এটাকে কি মাত্র একটি দিনেরই পুনরাবৃত্তি বলব না—অনন্ত ১ × ১-এর গুণে টেনে যাওয়া, যা চিরকালই থেকে যাবে সেই ১-ই; ৫ বা ৫-র বহুত্ব-বৈচিত্র্যের কখনই পাবে না নাগাল।

আমার লেখার ঘরটা মন্দ নয়, আলো-বাতাস প্রচুর, খানিকটা শ্রী-ও আছে, কিন্তু বরাবর তার মধ্যে বসে লিখতে পারি না, বাগানে গিয়ে বসতে হয়। বলবে সে তো আরও ভালো—'শান্তিনিকেতন'; তাহলে যাত্রার ভাষায় একটু 'প্রকাশ করে' বলি—ফুলের বাগান ছেড়ে বেগুনের ক্ষেতের ধারেও বসি মাঝে মাঝে, খালি গ্যারাজেও কখনও কখনও।

রাজসিংহাসনে বসিয়ে আমার মাথায় মুকুট দিয়ে ঘেরেঘুরে বসে থাকবার

যদি কারুর অভিসন্ধি থাকে তো বলে দিও প্রথম পুরস্কার তারা যা পাবে রাজার কাছ থেকে তার নাম শূল-দণ্ড। বাঃ, ওরাও আমায় আয়ুহীন করছে যে, আমার একটা দিনকে মাত্র একটা দিনের গণ্ডীতেই আটকে রেখে।

নির্জনতাও লাগছে না ভালো, ভিড়েরও ভয়—মাঝামাঝি একটা রফা করে ইণ্টারে গিয়ে উঠলাম। সঙ্গী পরিবর্তনও হবে একটু। 'ইণ্টার' কথাটিও বেশ, মধ্যম, অর্থাৎ মাঝামাঝি।

দেখলাম বঞ্চিত হয়েছি; আমি যখন গুপী-নারাণী-পালবৌদের নিয়ে, ততক্ষণ এখানে চমৎকার খোশগল্প চলেছে। একটি বেশ মোটাসোটা গোছের ভদ্রলোক, কাঁচা-পাকা দাড়ি, তবে পাকাই বেশি, আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছেন; তাঁকে ঘিরে পাঁচ-ছজন, মনে হল যেন ডেলি প্যাসেঞ্জারই।

মজলিসী লোক আসর জমিয়ে বসে গল্প বলছে—এ দৃশ্য একেবারেই বিরল আজকাল। তার ভগ্নাংশ কখনও কখনও লোক্যাল প্যাসেঞ্জারগুলোয় নজরে পড়ে—যেখানে ঘর আর অফিসের মাঝখানে এই নিরাতঙ্ক কয়েকটি মুহূর্ত থেকে কেরানিবৃন্দ একটু নিশ্চিন্ততার রস নেয় নিঙড়ে—নেবার চেষ্টা করে অন্তত। তাও আবার লোক পাওয়া চাই তো,—সেরকম মজলিসী গোল্পে আর কোথায়? কোলোযুগ,—এখন গল্প পড় ছাপার পাতায়, গান শোন গ্রামফোন-রেডিওয়, নাচ দেখ সিনেমায়, টেলিভিশনও এসে পড়ল বলে; লেকচার শুনবে তাও মাইক,—মিনমিনে গলাকে বজ্র-নির্ঘোষে পরিণত করার ফাঁকিবাজি।

আফসোস হচ্ছে। কটা হয়ে গেল কে জানে, আবার যেটার মধ্যে এসে বসলাম সেটারও মুড়োটা বাদই আমার ভাগ্যে! তবে সেটাও আমারই দোষে, একটা চান্স পেয়েছিলাম, কিন্তু একটু সপ্রতিভ হয়ে যে সেটা কাজে লাগাব তা আর হয়ে উঠল না।

আমি যে সেকেণ্ড ক্লাসে ছিলাম, সেখান থেকেই নেমে এসেছি, এটা অনেকেই জানে। ভদ্রলোক বোধহয় গল্পে কিছু এলাকাড়ি দিয়ে থাকবেন—মাঝে মাঝে তাগাদা আদায় করাও একটা মজলিসী স্টাইল—আমি আসতেই একটি যুবা বললে—"ঐ দেখুন, উনি সেকেণ্ড ক্লাস থেকে উঠে এলেন আপনার গল্প শুনতে।"

ভদ্রলোক আমার পানে চেয়ে একটু হাসলেন, যেটাকে প্রশ্নে রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায়—"তাই নাকি ?"

—সবাই একটু দরের শ্রোতা চায় তো ?

তাদের মাথায় বলে দিলেই হয়—"আজ্ঞে হ্যাঁ এলাম বৈ কি, গোড়া থেকেই আরম্ভ করুন, একটু শোনা যাক্।" সে-সব কিছু না বলে আমিও সামান্য একটু হেসে একটা জায়গায় বসে পড়লাম। এটাকে উত্তরে রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায়—"শোনেন কেন ছেলেমানুষদের কথা।"

তার মানে আমিই গেছি রূপান্তরিত হয়ে—সেই বদনের বন্ধু কি নবাবজানের সাথী আমি আর নেই, আমার সেকেণ্ড ক্লাসের ছোঁয়াচ লেগেছে, যুবকটির মুখে উল্লেখটুকুর জন্যে আরও বেশি করেই।···আমি লোকটা হব খোশগল্প শোনবার জন্যে লালায়িত ?—সেকেণ্ড ক্লাসে করি যাতায়াত !···

আমরা কি রকম বহুরূপী দেখ, আর অন্তরে বাইরে কত গরমিল রেখে চলাফেরা আমাদের।

এগুনোও জীবনের বৈচিত্র্য, তা বলে এগুনোকে আয়ুবৃদ্ধির সঙ্গে গোলমাল কোরো না যেন। এগুনো ঠিক উল্ট ; এগুনো হচ্ছে জীবনের অপমৃত্যু।

মজলিসী গোল্পে রাজাকেও বাদ দেয় না, সেকেণ্ড ক্লাস তো কোন ছার ; একটু ফাঁক পাওয়া দরকার! সেটুকু আমি তো দিয়েছিই আমার হঠাৎ আভিজাত্যের দেমাকে।····কথাটা হচ্ছে—এলাম যে ওপর থেকে নেমে, তার একটা কারণ থাকা চাই তো।

"বাগের ভয় ?···সন্ধ্যে হয়ে এল কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি, মাফ করবেন।"

—সঙ্গে সঙ্গে 'উঃ।' করে উঠে ঘ্যাসঘ্যাস করে নিজের পিঠটা চুলকাতে আরম্ভ করে দিলেন।

বুঝতেই পাচ্ছ, বাগ—Bug-ছারপোকা। কাঠ রসিকতাই, কিন্তু জমাট আড্ডায় কাজ হয়। ছারপোকা যাঁদের কাঁদাচ্ছে না, তাঁদের হাসায়ই ; ভদ্রতা রক্ষার চেষ্টার মধ্যেও 'খুক্-খুক্' করে সবার মুখে একটু হাসি উঠল। বোধ হয় আমার নিজের আচরণে মনের সায় ছিল না বলেই মুখ দিয়ে একটা ভালোরকম উত্তরও বেরুল না, একটু অপ্রস্তুতভাবেই মুখটা ঘুরিয়ে খাঁটি

ইণ্টার-ক্লাসেরটি হয়েই বসলাম। মিনিট খানেকের মধ্যেই পাপ আর প্রায়শ্চিত্ত—দুই-ই হয়ে গেল। যাক, মুড়ো-কাটা গল্পটা যা শুনলাম—

"দমকলওয়ালারা না এলে লোকটা বেঁচে যায়, কিন্তু কপালের লেখন, তা আর হতে পেল কৈ? পাড়ার মধ্যে দিনদুপুরে পোড়ো বাড়ির দোতলার একটা ঘর থেকে একটু ধোঁয়া বেরুচ্ছে—ব্যাপারটা কি জানবার হাজার রকম উপায় ছিল, কিন্তু তাহলে নিবারণ আচার্যি মিউনিসিপ্যালিটি কমিশনার হয়েছে কি করতে, আর খরচ করে দমকলটা আনানোই বা হয়েছে কেন মিউনিসিপ্যালিটি থেকে? তার ওপর আবার সামনেই ইলেকশন, ভোটের জন্য বাড়ি বাড়ি ছুটতে হবে নিবারণকে, একটা চিঠি লিখে মিউনিসিপ্যাল আফিস থেকে ফায়ার ব্রিগেড তলব করে পাঠালে। আর্জেণ্ট একেবারে।....মানে, ঐ তো একছিটে ধোঁয়া, ওটুকুও মিলিয়ে গেলে নিবারণের ইলেকশনের চান্স একটা নষ্ট হয়ে যায় কিনা। আগুন যদি আপনিই নিভে যাবে, কমিশনার হয়ে তাহলে ও করছিল কি?

ঠিক কুড়িটি মিনিট লাগল, কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে ফায়ারব্রিগেড এসে পৌঁছুল; ওরা সাজগোজ করে "লাগুক—লাগুক" জপ করতে থাকে কিনা। ওদের শাস্ত্রও আলাদা; যেমন পুড়ে কাউকে মরতে দেবে না, তেমনি আবার পারতপক্ষে এদিকে যারা না-পোড়া তাদের বাঁচতেও দেবে না কাউকে, পথের মাঝখানে একবার পেলে হল। গোটা পাঁচেক ছাগলকে সাবড়ে, একদা-উচ্ছুগ্যু-করা ষাঁড়কে ঘায়েল করে, একটা সাইকেলওলাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে গনগন করে এসে পৌঁছুল। পোড়ো-বাড়িতে ধোঁয়ার হল্লা শুনে যারা আসেনি দমকলের কারসাজি দেখবার জন্যে ছুটে এল। রীতিমতো একটা মেলা লেগে গেল।

আসার সঙ্গে সঙ্গে ওরা কুচকাওয়াজ শুরু করে দিলে। একবার ঘুরেঘারে বাড়ির চারিদিকটা দেখে এল। মরচেধরা তালাটা ভেঙে কাউকে ওপরে একবার উঠিয়ে দিলে ব্যাপারখানা পরিষ্কার হয়ে যায় কিসের আগুন, কি বৃত্তান্ত—কমিশনার নিবারণ আচার্যি না থাকলে পাড়ার লোকেরা করতও তাই—কিন্তু তাহলে আর ওরা ফায়ার ব্রিগেড হয়ে জন্ম নিয়েছে কেন? বাড়ির সদরটা রাস্তার উল্টো দিকে, এদিকে দোতলাটা রাস্তার পাশ থেকেই

খাড়া উঠে গেছে, মায় চিলের-ছাত পর্যন্ত ; সিঁড়িতে সিঁড়িতে মুড়ে, একবারে ওপরটা আবার যেখানটা কাঠের সিঁড়িতে কুলুল না সেখানটা দড়ির সিঁড়ি লাগিয়ে একজন একজন করে ওপরে উঠে গেল জানালা পর্যন্ত।

একটি ছোকরা আর সবার চেয়ে বেশি হাঁ করে শুনছিল, জিজ্ঞেস করে উঠল—"আগুন ঠাকুর্দা······ততক্ষণে···?"

আরে আগুনের কথা ভাবছে কে তখন? ফায়ার ব্রিগেডের কারসাজি দেখে তাক লেগে গেছে।···আর আগুন ছিল কোথায় তোমার? ধোঁয়া যেটুকু ছিল সেটুকুও পাতলা হয়ে এসেছে।···লোকটা জানালার গরাদ ধরে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভেতরটা দেখে নিয়ে নিচুপানে চেয়ে বললে—"একঠো আদমি হ্যায়।"

লোকে নায়ক-নায়িকার একটা সর্বাঙ্গসুন্দর কাহিনীই চায়, নৈলে জুত হয় না; নিচে থেকে একসঙ্গে জন কুড়ি চেঁচিয়ে উঠল—"আর আওরত নেই হ্যায়?"

ততক্ষণে ভেতরের লোকটা জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যোদো-পাগলা। কোনও দিক দিয়ে উঠে গিয়ে একটা মকাই ঝলসে খাবার ব্যবস্থা করছিল, সেটা হাতে নিয়েই উঠে এসেছে, জষ্ঠি মাসেও গায়ে খানদুয়েক ছেঁড়া কম্বল, এদিকে হাতপা নেড়ে নেড়ে কাঁপছে; মকাইয়ে একটা কামড় দিয়ে নিচের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে দার্জিলিঙের নিচে এত ভিড়টা কিসের?

পাগল বলে টের পেতেই বিগ্রেডের সেপাইটা ভয়ে তরতর করে হাত চারেক নেমে এসেছে, নিবারণ আচার্যি নিচু থেকে বললে—"যদু যে, তুই ওখানে করছিস কি?"

"চেঞ্জে এসেছি।"

"আগুন লাগাবি যে বাড়িটায়।"

"বরফ, লাগবে না।"

উগ্র পাগল নয়, ঠাণ্ডাই, একটু সুরে সুর মিলিয়ে বলতে পারলেই কাজ হয়, নিবারণ আচার্যি বললে—"তা আছিস কবে থেকে দার্জিলিঙে?"

"আজ ভোর থেকে।"

"তোর ওয়েট যেন বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে, নেমে এসে একবার সিভিল সার্জনকে দেখিয়ে নে ; বলে, আবার যাবি, শীতে কষ্ট পাচ্ছিস মিছিমিছি।"

যদু মকাইয়ে তাড়াতাড়ি ডুটো কামড় দিয়ে কম্বল দুটো ভালো করে সাপটে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে—"মন্দ বলনি, তাহলে খানাটা শেষ করে নিই। সিঁড়ি কিসের ?"

একটা ছোকরা নিচে থেকে চেঁচিয়ে বললে—"সিঁড়ি নয়, দার্জিলিঙের রেললাইন যদু !"

যদু গরাদে কপালটা চেপে নিচু পর্যন্ত দেখে নিলে, তারপর মাথাটা দুলিয়ে বললে—"ঠিক ; দাঁড়াও, খেয়ে নিই।"

সিঁড়ি নামিয়ে নিলেই হত ; ঐ রকম সুরে সুর মিলিয়ে বললে যদু পাকা সিঁড়ি বেয়েই দিব্যি নেমে আসত ; কিন্তু ফায়ার ব্রিগেড শহরে এসে পর্যন্ত কিছু পায়নি, ঝুটো হোক, সাচ্চা হোক একটা কেস পেয়ে আর ছাড়তে চাইলে না—ওরা ওদের পদ্ধতিমতোই নামিয়ে আনবে।

লোকগুলোরও একটা ইয়ে ছিল ফায়ার ব্রিগেড কি জিনিস বলে, তার ওপর নিবারণ আচার্যিরও সামনেই ইলেকশন, মিউনিসিপ্যালিটিকে কি দাঁড় করিয়েছে একবার পরখ করিয়ে দেখাতেই চায়—কেউ আর বাধা দিলে না, সোজাপথ ছেড়ে অযথা বাঁকা পথ ধরা হচ্ছে বলে। জানালার গরাদগুলো জং ধরে ক্ষয়েই এসেছে, লোকটা ওপরে যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়ে কেটে কুটে খানিকটা জায়গা করে নিয়ে ভেতরে চলে গেল। যদুর মকাই ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে, ধোঁয়াটাও মিনিট দশেক দমকলের তোড় দিয়ে ভালো করে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে ; লোকটা যদুকে ওদের শাস্ত্রমতো ভালো করে দড়ি দিয়ে নিজের পিঠের সঙ্গে বেঁধে বেরিয়ে এল। যদুও গাড়ি চড়ার শখেই হোক বা কালে ধরার জন্যেই হোক, আপত্তি করলে না…"

হাঁ-করা ছেলেটি বলে উঠল—"কালে ধরা মানে !—মরে গেল যদু ?"

"তা আড়াই তলা থেকে একেবার লাফিয়েই দেখ না।"

"আর লোকটা…ব্রিগেডের সেপাইটা ?"

"তার বালাই মরুক। সে হাড়গোড়ভাঙা একটা মানুষের নরম তালের ওপর

নেমে এসে বসেছে, কি দায়টা পড়ে গেছে তার মরবার ? আর সে মরলে অমন ভালো কাজের জন্যে তকমা ঝোলাবে কার গলায় মুনিসিপ্যালিটি ?”

কেসটা তখন অন্য হাতে গিয়ে পড়ল ; দমকলওলারা ফিরে যেতে না যেতে পুলিস এসে হাজির হল। বললে—“পোস্টমর্টেম করতে হবে।”

কতকগুলো গাঁজাখোরে মিলে পাড়ায় শ্মশান-বন্ধু বলে একটা দল খাড়া করেছিল, সৎকার করবার লোক নেই এমন কেউ মলে কিছু চাঁদাটাদা তুলে নেশার ব্যবস্থাটা মাঝখান থেকে করে নিত। তাদেরও কয়েকজন জুটেছিল, তারপর যোদোকে পপাত ধরণীতলে হতে দেখে ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গিয়েছিল। বাঁশ, খড়, দড়ি, কলসী সব জোগাড় করে দলের আর সবাইকে ডেকে নিয়ে এসে দেখে পুলিস লাস আগলে দাড়িয়ে রয়েছে। ব্যাপার কি, না, মড়া ময়না করা হবে।

শ্যাম ঘটক ওদের সর্দার গোছের, এগিয়ে গিয়ে দারোগাকেই বললে—“হুজুর, শুনেছি যোদো পাগলকে নাকি পোস্টমর্টেম করবার হুকুম হয়েছে ?”

“হ্যাঁ, হয়েছে, আপত্তি আছে তোমার ?”

শ্যাম ঘটক জিভ কামড়ে কানে হাত দিলে, বললে—“কি যে বলেন হুজুর ! হুজুর হচ্ছেন জেলার মালিক, হুজুরের হুকুমের ওপর কার কথা বলবার এক্তিয়ার, মেলার তাবৎ লোকগুলোকে ধরে পোস্টমর্টেম করিয়ে দিতে পারেন এক্ষুণি। তবে অভয় দেন তো একটা কথা বলি !”

দারোগা গোঁফের একটা দিক পাকাতে পাকাতে কানের দিকে তুলে দিয়ে বললে—“ফেলই বলে।”

“আজ্ঞে কথাটা হচ্ছে, পোস্টমর্টেম করা কিসে মল সেইটে দেখবার জন্যে, তা যোদো পাগলা সে সন্দেহ তো একেবারে মিটিয়েই মরেছে হুজুর। শরীরের মধ্যে একখানি হাড় আস্ত থাকতে দেয় নি, তার ওপর চোখের সামনে ঐ তেতলা, ভাঙা জানালা, আর ফায়ার ব্রিগেডের দলও হুজুরের চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল যোদোকে তালগোল পাকিয়ে রেখে। আর হুজুর সন্দেহটা থাকতে পেলে কৈ যে যোদো আছাড় খেয়ে মরেছে ?”

"পুড়ে মরেনি যে তাই বা কে বলবে? এখানে তো একটা অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেছে।"

"আজ বছর পাঁচ-সাতের মধ্যে নয় হুজুর; ঐ তো বাড়িটা জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে। সিগ্রেটের ধোঁয়ার চেয়েও একটা হালকা ধোঁয়া, হুজুর, চোখেও পড়ে না, যোদোর কপালের নেকন, তাইতেই কাল হল, নয়তো সে বলতে গেলে তো শহরের ঘরে ঘরে অগ্নিকাণ্ড চলছে—অন্তত একটা করে চুলোও তো জ্বলছে বাড়িপিছু, একবারটি ভেবে দেখুন না হুজুর। এ যা কাল ফায়ার ব্রিগেড এসেছে শহরে হুজুর, লোকের বিড়িতে আগুন দিতে হাত কাঁপবে এবার থেকে।"

"যাও, আইন ওসব বোঝে না! পোস্টমর্টেম করতেই হবে।"

"আইন তো হুজুরই। বলছিলাম বামনের ছেলে, জীবনটা তো বেচারির এইভাবে কাটল, এখন মিত্যুর পরও যদি একটু শুদ্ধ ভাবে সংকারটা হত···"

এই সময় অ্যাম্বুলেন্সের গাড়িটা এসে লাসটা সামলে সুমলে তুলে নিয়ে গেল। এদিককার গোলমালটা গেল মিটে একটু একটু করে।

যোদো পাগলা যতই কেউকেটা হোক, কেসটা নিয়ে শহরে বেশ একটা গুলতান উঠে গেল, কি রকম দাঁড়াবে, কে কে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়বে, অ্যাকসিডেণ্ট, না মার্ডার, না আত্মহত্যা; আগুনে পুড়ে মরা, না ছাত থেকে পড়ে—যতই সময় যেতে লাগল ততই আসল ব্যাপারটা থেকে নানারকম ফিকড়ি বেরুতে লাগল, বার লাইব্রেরিতে খুব ঘোঁট চলল, ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব সিভিল সার্জেনকে ফোন করলেন—যেমন শোনা যাচ্ছে, ব্যাপারটা খুবই সন্দেহজনক, পোস্টমর্টেমটা যেন খুব কেয়ারফুলি করা হয়। সিভিল সার্জেন উত্তর দিলেন—অন্যের হাতে না দিয়ে আমি নিজেই করবখন। আরও দর বেড়ে গেল যোদোর কেসের!

সেদিন ফুরসত হল না সিভিল সার্জেনের; তার পরদিন ভোরেই চিরে-ফেড়ে তিনি রিপোর্ট দিলেন—"পয়েজনিং কেস্। যোদো পাগলা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।"

যারা শুনছিল, একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—"সে কি ঠাকুর্দা, বিষ খেলে কখন ?...পুড়ে মরাও নয় !"

আমিও বাইরের দিকে মুখ করে শুনছিলাম, চকিত হয়েই ফিরে চাইলাম। ভদ্রলোক আমায় সাক্ষী মেনেই হেসে বললেন—"এই দেখুন এদের আবদার ! সে একটা সিভিল সার্জেন, তার লাল মুখ, কে বলেছে যোদো পড়ে মরেছে বলে তাকে সে কথা মেনে নিতে হবে ? তার নিজের একটা শাস্ত্র আছে, তাইতে কি বলছে না বলছে সেইটে বিশ্বাস না করে সে যদি গুজবের ওপরেই নিজের রায় দেয় তাহলে তার অত কষ্ট করে শাস্ত্র পড়াই বা কেন আর মেহনত করে নিজের হাতে ছুরি ধরতে যাওয়াই বা কেন ? আর এও একটা ভেবে দেখবার কথা—যেমন ফায়ার ব্রিগেড আলাদা, তেমনি গভর্নমেণ্টেরও পুলিস বিভাগ আলাদা, হাসপাতাল আলাদা, দেওয়ানী আলাদা, ফৌজদারী আলাদা ; পুলিস যা বললে তা যদি হাসপাতালকে মেনে নিতে হয়, হাসপাতাল যা বললে তা যদি দেওয়ানীকে মেনে নিতে হয়, তাহলে এত খরচ করে, অত বখেরা করে এতগুলো ডিপার্টমেণ্ট রাখবার দরকার গভর্নমেণ্টের ? পোস্টাফিসের মতন মাঝখানে একটা পঞ্চমুখ অফিসার বসিয়ে পাঁচটা জানালা খুলে তাতে পাঁচটা লোক মোতায়েন করে রাখলেই পারত—তোমার গিয়ে মনিঅর্ডার, স্ট্যাম্প, রেজেস্টারি, সেভিংস ব্যাঙ্ক, টেলিগ্রাফ...কি বলেন মশাই, খেলাপ বলছি ?"

হেসে বললাম—"কিছুমাত্র না ; রইল আলাদা আলাদা এমারত নিয়ে, অথচ একে যা বলছে অন্যে তাইতে সায় দিলে, তাহলে সে রকম আলাদা থাকার মানে ? টাকা তো কামড়াচ্ছে না গভর্নমেণ্টের।"

"ঐ শোন, সমঝদার লোকে কি বলেন।...সব তালগোল পাকিয়ে গেছে, কোথায় নাড়ি, কোথায় স্টমাক, কোথায় হার্ট, কোথায় লাংস—কিচ্ছু বোঝবার জো নেই, কিন্তু ওস্তাদের হাতে ছুরি, লুকিয়ে যাবে কোথায় ? সিভিল সার্জেন রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলে—পিওর পয়েজনিং কেস্।"

সবাই আবার গোলমাল করে কি বলতে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক ডান হাতটা তুলে তাদের থামিয়ে নির্বিকারভাবে বললেন—"পিওর পয়েজনিং। অন্য কিচ্ছু নয়।'

শহরের গুলতানটা দশগুণ বেড়ে গেল, চায়ের দোকান, পানের দোকান, গলির মোড়, সদরের রক—যেখানেই পাঁচজন জমা হয়েছে, যোদোর পয়েজ-নিংয়ের গল্প। পাঁচজন থেকে দশজন, দশজন থেকে বিশ জনে দাঁড়াচ্ছে, বিশ রকম আন্দাজে, বিশটা মতে হাতাহাতি হবার উপক্রম হচ্ছে, বিশটা বাড়ির কেচ্ছা বেরিয়ে পড়ছে।

এর ওপর, এতদিনে গুলতানটা এদিকেই ছিল, সিভিল সার্জেন রিপোর্ট দেবার পর থেকে ইউরোপীয়ান ক্লাবেও একটা সাড়া পড়ে গেল—কী মারাত্মক জাত এই ইণ্ডিয়ানরা—সবার চোখের নিচে, দিনদুপুরে হয়কে নয় করে দিচ্ছিল, কি করে চালানো যায় অ্যাড্‌মিন্‌সট্রেশন !

পুলিস সুপার ডেকে পাঠালেন টাউন দারোগাকে।

"এই শহরের মাঝখানে একজন বিশিষ্ট বড় লোকের বাড়িতে সম্প্রতি একটা সেনসেশন্যাল পয়েজনিং কেস্‌ হয়ে গেছে, জান বোধ হয়।"

"আজ্ঞে জানি হুজুর।"

"কবে ?"

"পরশু।"

"পরশু ; তাহলে জান দেখছি, নেহাৎ নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে না। ওটাকে যে অগ্নিকাণ্ড, কি ছাত থেকে পড়ে অপঘাত মৃত্যু বলে চালিয়ে দেবার অপচেষ্টা হচ্ছিল, এটা তোমার জানা আছে কি ?"

"হ্যাঁ-হুজুর, সিভিল সার্জেন নিজে এর মধ্যে না পড়লে হয়তো..."

পুলিস সুপার গর্জন করে উঠলেন—"সিভিল সার্জেন না পড়লে ! তুমি কোথায় ছিলে ? তোমায় সাহায্য করা সিভিল সার্জনের ডিউটি, কি সিভিল সার্জনকে সাহায্য করা তোমার ডিউটি ? ওঁর রিপোর্টের আগে তুমি কি করেছিলে ?"

দারোগার পা কাঁপতে আরম্ভ হয়েছিল, টেবিলের আড়ালে বলে তাড়াতাড়ি সামনে নিলে।

"ইন্‌ভেসটিগেট করছিলাম হুজুর..."

"কি পেলে ?"

"ঐ পয়েজনিং-ই হুজুর—সিভিল সার্জেনের রিপোর্টে যা কনফারম্‌ড্‌ হল।"

একটু ঠাণ্ডা হলেন পুলিস সুপার।

"পয়েজনিং। আত্মহত্যা—স্বইচ্ছায়, কি অন্যে খাইয়েছে বিষ?"

যে-রকম আবার ফেটে পড়বার জন্যে মুখের দিকে চেয়ে আছে, স্ব-ইচ্ছায় আত্মহত্যা বলে আর কেসটাকে হাল্কা করবার সাহস হল না দারোগার। বললে—"না, মেরে ফেলবার জন্যে বিষ দেওয়া হয়েছিল হুজুর।"

"কজন ছিল এর মধ্যে?"

ফার্স্ট বয়ের মতন এসবের উত্তর জিভের ডগায় রাখতে হয় ভালো ভালো দারোগাদের, উত্তর করলে—"আপাতত একজনকে পাওয়া গেছে হুজুর, যে আসল; ফারদার ইনভেসটিগেশন চলছে। কেসটা জটিল।"

"তাকে হাজতে দেওয়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ হুজুর, তখুনি।"

রাঙা মুখের রংটা খুব চড়ে গিয়েছিল, খানিকটা নামল। বললেন—"দেখুন, শহরের পুলিস অ্যাডমিনস্ট্রেশন অত্যন্ত ঢিলে হয়ে গেছে, এ কেস যদি খারাপ হয় তো দায়িত্ব আপনার। এর মানেটা নিশ্চয় বোঝেন; যান।"

ওদিকে ম্যাজিস্ট্রেট সরকারী উকিলকে ডেকে পাঠালেন, প্রায় উপরো-উপরি কয়েকটা প্রসিকিউশন ফেল করে শহরে অপরাধের সংখ্যা বড্ড বেশি বেড়ে গেছে। এই সেন্‌সেশন্যাল পয়েজনিং কেসটা যদি না দাঁড়ায় তো তাঁকে সরকারী উকিল বদলাবার কথা চিন্তা করতে হবে।

পুলিস সুপারের কাছে ব্যাপারটা আপাতত কোন রকমে সামলে টাউন-দারোগা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরছিল, আসল লোকটাকে ধরে হাজতে পুরেছে তো বলে এল সাহেবকে, এখন করা যায় কি? বেটা কিছু বললে না, কিন্তু সন্ধ্যের পর ক্লাবে যাবার মুখে যদি একবার হাজতে ঢুঁ মেরে যাওয়ার খেয়াল হয়, তাহলেই তো চিত্তির।

মোটরবাইকটা খুব আস্তে আস্তে চালিয়ে ভাবতে ভাবতে আসছিল, এমন সময় পুরনো মিডল্‌ স্কুলের সামনে এসে তাকে বাইকটা রুকে দিতে হল। জায়গাটা শহরের একটু বাইরের দিকে, স্কুলটা এখান থেকে অনেক দিন সরে

গেছে, কাঁচা ইটের বাড়িটাও গেছে প্রায় পড়ে, শুধু একদিকে একটা ঘর কোনরকমে আছে দাঁড়িয়ে।

পোড়ো বাড়ির দিকে দারোগার নজর কেমন যেন সহজেই গিয়ে পড়ে, তাইতেই দেখলে ঘরটার মধ্যে একটা মানুষ যেন পায়চারি করতে করতেই উল্ট দিকে মুখ করে থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘাড়টা হেঁট-করা, হাত দুটো বুকে জড়ানো, খুব যেন চিন্তিত; মোটরটা একটা শব্দ করে দাঁড়িয়ে পড়তে একবার ঘুরে চাইলে, তারপর আবার সেইভাবেই রইল দাঁড়িয়ে। খুন হোক আর নাই হোক, খুনী যে এত শীগগির আর এত সহজে হাতের মধ্যে এসে পড়বে এটা আশাই করতে পারে নি দারোগা, একটু ভেবে নিলে, তারপরেই বাইক থেকে নেমে পড়ে সেটা স্ট্যাণ্ডে দাঁড় করিয়ে স্কুলটার পানে এগুল।

চারিদিকে আগাছা জন্মে গেছে বলে একটু ঘুরে যেতে হল; ঘরের সামনে পৌঁছে কিন্তু দেখে লোকটা তখনও সেই রকমভাবে দাঁড়িয়ে। দূর থেকে আবছায়ার মধ্যে দেখা, কাছে এসে এবার ভালো করে দেখলে, লোকটাও দারোগাকে দেখে ঘুরে এগিয়ে এসেছে,—একটা ছেঁড়া প্যাণ্ট পরা, গায়ে একটা ছেঁড়া ঢিলে কোট, মুখে এক মুখ দাড়ি-গোঁপ, কিন্তু দেখামাত্রই বুঝতে পারা গেল সেটা আসল নয়, পরচুলো। বেশ ভালো করে আঁটাও নয়, আর আশ্চর্যের বিষয় লোকটার খেয়ালও নেই সেদিকে, একটু চেয়ে দেখলে, তারপর বেশ হুকুমের টোনেই ইংরেজীতে বললে—"কাম্ ইন্।"

পলাতক আসামী! এমন খাঁটি কেস পাওয়া যায় না সচরাচর; ছদ্মবেশ, তার ওপর পাগলামির ভান, দারোগা মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, বললে—"এখানে কি হচ্ছে? বেরিয়ে এস।"

একেবারে বেরিয়ে এল না, দুপা এগিয়ে বললে—"আমি হেডমাস্টার এ স্কুলের, ছেলের অ্যাডমিশন নেবেন? কোথায় সে, নিয়ে আসুন।"

দারোগা বার দু-তিন মাথা নাড়লে—অর্থাৎ বুঝেছি, আর বুজরুকিতে কাজ নেই, বললে—"আমিও একজন হেডমাস্টার, আগে আমাকে স্কুলে ভর্তি হবে চল তো?"

এক কথায় হল না। লোকটা প্রথমে চোখ রাঙিয়ে ভেংচি কেটেই উঠল

—"চল তো !—আপনি কথা কইতেই জানেন না, একটা হেডমাস্টার, তাকে 'চল তো।'...আপনার ছেলেকে অ্যাডমিট করতে পারি না আমি, আপনি যেতে পারেন।"

পাগলামি—বিশেষ করে ভান-করা পাগলামি বরদাস্ত করবার মতন মনের অবস্থা ছিল না দারোগার, তবু অনেক চেষ্টা করে সয়েই গেল,—বললে "অপরাধ হয়েছে, আপনাকে সসম্মানেই নিয়ে যাওয়া হবে, আর রাখাও হবে জামাইয়ের আদরে, দয়া করে চলুন।"

"কার জামাই ?"

"রাজার জামাই...নি-খরচায় খাওয়া-দাওয়া, পোশাক, বিছানা, মায় ডাক্তার পর্যন্ত।"

লোকটা একবার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে বাঁ হাতের আঙুল কটা আস্তে আস্তে চালিয়ে নিলে—পাগলের পার্টটা বেশ ভালোভাবেই করছে—হেডমাস্টারি আর রাজার জামাইগিরির মধ্যে কোন্‌টা বেছে নেবে যেন তৌল করে দেখছে, তারপর ঘরটার চারিদিকে একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে—"ঠিক তো ?"

"একেবারে ঠিক।"

"তাহলে চল।"

রাজার জামাই আগে আগে, পেছনে দারোগা, চামড়ার কেস থেকে রিভলভারটা বের করে, নিয়েছে, পালাবার চেষ্টা করলেই জামাতা-বাবাজীকে খোঁড়া করবে ; মোটর-বাইকটার একটা সাইড-কার ছিলই, তাইতে বসিয়ে একেবারে সোজা হাজতে।

শহরে যে গুলতান চলছিল, তার পরদিন একেবারে দশগুণ গেল বেড়ে—হেঁসেল থেকে নিয়ে বার-লাইব্রেরি পর্যন্ত আর অন্য কোন কথাই নেই। ষোদো পাগলকে যে বিষ দিয়ে মেরেছে, সে ধরা পড়েছে—স্যুট, পরচুলো-পরে একেবারে ভোল ফিরিয়ে পুরনো মিডল্ স্কুলটার মধ্যে লুকিয়েছিল, পুলিসের কাছে ফটো ছিলই, দারোগার নজরে পড়ে যায়, কাছে রিভলভার ছিল, প্রথমে দারোগাকে ঘায়েল করবার চেষ্টা করে, তারপর ধরা পড়ে

পাগলের ভান করে, তারপর ঠাণ্ডি-গারদে ফেলে চাপা দিতে এখন নাকি আবার স্বীকারও করেছে যে সে-ই যোদো পাগলকে বিষ দিয়েছিল—এর মধ্যে স্ত্রী-ঘটিত ব্যাপারও আছে—যোদো পাগল নাকি যথার্থই পাগল ছিল না—পাগলামির অজুহাতে এসব দোষও নাকি ছিল ভেতরে ভেতরে··· ।

এইরকম আর এইরকম ধরনের বহু মুখরোচক গল্প মুখে মুখে তোয়ের হয়ে সারা শহরটায় এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে, কখন যে সেই একটু ধোঁয়া দেখা গিয়েছিল বাড়িটার মধ্যে সেসব কথা একেবারে কাহিনী হয়ে গেল।

পুলিস সুপার, ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, সিভিল সার্জেন, সরকারী উকিল একে একে সবাই এসে আসামীকে হাজতে দেখে গেলেন। তবে ঐ পর্যন্তই, সেনসেশন্যাল কেস্—বাজে লোক কাউকে ঘেঁষতে দেওয়া হল না। একেবারেই বেলাল্লা, তাতে আবার নিজের মুখেই দোষ স্বীকার করছে, ডিফেন্সে নিতান্তই নেম রক্ষা করবার জন্যে একজন জুনিয়ার উকিল দাঁড়াল, যথারীতি কেস উঠল আদালতে।·“দাঁড়া, বিড়িতে দুটো টান দিয়ে নি।”

ভদ্রলোক বিড়িটা ধরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে টানতে লাগলেন, সবাই মুখের পানে চেয়ে হাঁ করে রয়েছে, কখন্ আবার আরম্ভ করবেন। তাদের উৎকণ্ঠাটা আরও বাড়িয়ে তুলেছে ওঁর মুখের ভাবে, আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়ছেন আর তার সঙ্গে একটা মিঠে মিঠে দুষ্ট হাসি, যাতে অন্তত আমার মনে হল, গল্পটা সত্যসত্যই তোয়ের করে যাচ্ছেন, আর ক্লাইমেক্সটা যাতে একেবারে মোক্ষমভাবে এই গল্পেরই ক্লাইমেক্স হয়ে ওঠে, এমন ধরনের কিছু একটা যেন উঁকি মারছে মাথার মধ্যে।

একটু পরে বিড়িটা ফেলে দিয়ে বললেন,—“ফাঁসির দিন সমস্ত শহরটা ভেঙে পড়ল···”

“ফাঁসিও হয়ে গেল!”—হৈ-হৈ করে উঠল সবাই এক সঙ্গে।

ভদ্রলোক একবার হাসি-হাসি চোখ দুটো সবার ওপর বুলিয়ে নিলেন, যেন কত অবুঝদের গল্প শোনাচ্ছেন, তারপর আবার আমায় সাক্ষী মানলেন —“শুনুন মশাই, এদের আবদারের কথা। সিভিলসার্জেন নিজে ময়না করেছে, ম্যাজিস্ট্রেট, জজ মাথায় হাত দিয়ে বসেছে,—অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বুঝি রইল

না, দারোগার যায় বুঝি চাকরি, সরকারী-উকিল হয় বরখাস্ত—এমন অষ্টবজ্র সম্মেলনেও ওর যদি ফাঁসি না হয় তো বিচারটা কি শুধু একটা ফার্স?…তোরা কি ভাবছিস, সত্যিই তাকে রাজার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে ধরে নিয়ে এসেছিল ?

শুধু এমনি ফাঁসি নয়, জেলের দোর বন্ধ করে। পাবলিক হ্যাঙিং (public hanging)—সবাই দেখুক—এ-পাপের সাজা 'কি—একটা এক্সেমপ্লারি পানিশমেণ্ট (Exemplary punishment)। জেলের বাইরে বড় ময়দানটার মাঝখানে ফাঁসিকাঠ দাঁড় করানো হল—দরকার ছিল না, তবুও ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব ঢ্যাঁঢড়াটাও পিটিয়ে দেওয়ালেন—বিচার আর এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জয়-জয়কার তো, সবাই এসে দেখুক—যারা দেখতে চায়। শহর যাকে বলে একেবারে ভেঙে পড়ল।

পাঁচটা আটে সূর্যোদয়, সেই সময় ফাঁসি; আসামীকে জেল থেকে বের করে নিয়ে আসা হল। আগে-পেছনে চারটে চারটে করে পুলিস, ডোম ব্যাটা ওদিকে মঞ্চের ওপর অ্যাটেনশন হয়ে যমদূতের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটার কিন্তু বিশেষ ভ্রূক্ষেপ নেই, খাড়া চেহারা, লম্বা লম্বা পা ফেলে চলেছে, যেন সে-ই পুলিসটাকে নিয়ে চলেছে ফাঁসি দিতে; পাগলামির ঠাটটা বজায় রেখে যাচ্ছে আর কি শেষ পর্যন্ত। তার আর একটা লক্ষণ, মুখে তখনও সেই মিথ্যে দাড়ি-গোঁফের বোঝা—ওকে নাকি জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ওর শেষ ইচ্ছা যদি কিছু থাকে তো জানাতে, তাতে বলেছিল ওর দাড়ি-গোঁফ যেন শেষ পর্যন্ত খুলে নেওয়া না হয়, ভোরের পাতলা অন্ধকারে একমুখ মিথ্যে দাড়ি-গোঁফ সুদ্ধ গটগট করে গিয়ে মঞ্চের ওপর উঠল। বোধ হয় আট-দশ হাজার লোকের মেলা, কিন্তু একটা ছুঁচ ফেল, শুনতে পাওয়া যাবে।… তোদের শুনতেই এই অবস্থা, আর তারা চাক্ষুষ দেখছে, বুঝে দেখ না।

দুমিনিট…এক মিনিট…আর কয়েকটা সেকেণ্ড, ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিলেন —রেডি! ডোম দড়িটা পরাবার আগে কালো কাপড়ের ঢাকনাটা গলিয়ে দিতে যাবে, আসামী হঠাৎ হাত দুটো তুলে বললে—'থাম!'

একটু যেই ডোমটা থতমত খেয়ে গেল তার মধ্যেই দুহাতে একসঙ্গে

দাড়ি-গোঁফ ফেলে দিয়ে গলাটা লোকগুলোর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে "আমি কে !!" বলে এক চীৎকার, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই পেটেণ্ট হাসি…

"আরে যোদো পাগলা !—যোদো পাগলা !!"—সেই দশ হাজার লোকের গলার আওয়াজে আকাশ যেন ফেটে চৌচির হয়ে যায়—"নামিয়ে আন !—নামিয়ে আন !—কিন্তু নামায় কে তখন যোদোকে ?—ফাঁসির কাঠ জড়িয়ে ধরে তার সেই হাসি—"আমি নিজেকে মেরে ফাঁসি যাচ্ছি !—আমি নিজেকে মেরে ফাঁসি যাচ্ছি কাজির বিচারে—হাঃ—হা—হা—হা—হা—হা !…'

ভদ্রলোক নিজেও হো-হো করে হাসতে লাগলেন, আমিও জানালার বাইরে মুখ বের করে হাসছি, ওদেরও বেশির ভাগ যোগ দিয়েছে, বাকি প্রথম বিস্ময়ের ঘোরে চুপ করে রয়েছে, একজন—নিশ্চয় সমালোচনার দৃষ্টিটা সূক্ষ্ম—আপত্তি করে উঠল—এ নেহাত গাঁজাখুরি হয়ে গেল ঠাকুর্দা, বাঃ, যোদো তালগোল পাকিয়ে সেই কায়ার ব্রিগেডের লোকটার সঙ্গে পড়ল·· আবার বলছেন……"

ভদ্রলোকের হাসি থেমে গেল, আবার সেই রকম গম্ভীরভাবে সবার ওপর চোখ দুটো বুলিয়ে এনে আমায় সাক্ষী মেনে বললেন—"কে বললে ?"···শুনুন কথা মশাই !……যোদো বেচারী বারো-সেরা একটা খাসী রামছাগল ওপরে নিয়ে গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে দার্জিলিংয়ের শীতে সিজ্‌ন্‌ করবার জন্যে টাঙিয়ে রেখেছিল পাশের ঘরে—নেহাত ছাড়ে না দেখে কালো কম্বলে মুড়েসুড়ে লোকটার পিঠে বেঁধে দিয়ে বেমালুম সরে পড়েছে—আর বলে কি না !…"

"ঠাকুর্দা যে !"

গাড়ি এসে চার নম্বর হল্টে দাঁড়িয়েছে। "এই যে তুমি কোত্থেকে ?—এই গাড়িতেই নাকি ?"—বলে ভদ্রলোক হাসতে হাসতে নেমে পড়লেন—ওদেরও দু-একজন ছাড়া সবাই নেমে পড়ল—প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কি ভেবে একবার ঘুরে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতেই বললেন— আচ্ছা আসি, নমস্কার ; কি করি ?—ছেলেরা ছাড়ে না, সদ্য-সদ্যই তোয়ের করে বলতে হয়, অনেক ভুল-ত্রুটি থেকে গেল—অত কিন্তু বিচার করে দেখতে যাবেন না…"

নমস্কার করে বললাম—"এ-গল্পের পরেও আবার বিচারের নাম করে লোকে!"

হো-হো করে প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন, ওরাও যোগ দিলে, তারপর সদলবলে বেরিয়ে গেল।

এবার একটু বিচারের কথাতেই আসা যাক।

তোমার কি রকম লাগল গল্পটা? একটা কথা মনে রাখতে হবে, তোমরা যাকে সাহিত্যিক গল্প বল, এ তা নয়, এ হচ্ছে যাকে বলে একেবারে খোশ-গল্প। দুটোতে অন্তর আছে। সাহিত্যিক গল্পের শ্রোতা অন্য ধরনের, কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে, এই শ্রোতাই যখন সাহিত্যিক গল্পের শ্রোতা হয়ে বসে, তখন অন্য রকম কান নিয়ে বসে; গল্পের স্থান, কাল, পাত্র একটু এদিক-ওদিক হলেই গোল্লেকে চেপে ধরে। সমস্ত ঠিক রেখে, নিখুঁতভাবে সম্ভাবনার রাস্তা ধরে চলতে হবে, এতটুকু অসম্ভব বা অবান্তর এসে পড়লেই তার জাত গেল। মাঝপথে যদি আসেই অসম্ভব বা অবান্তর তো সেটা রস জমানোর জন্যেই, কথকের বা লেখকের অনেক সময় সেটা একটা ভাঁওতাও, পাঠককে একটু বিভ্রান্ত করে দেওয়া—বা খুঁত ধরেছি বলে পাঠক বা শ্রোতাকে একটা সাময়িক আত্মপ্রসাদ দেওয়া; যথাস্থানে—(সেটা একেবারে পরিণতিতে এসেও হতে পারে), তাকে কিন্তু এক-এক করে নিখুঁত ভাবে সব পরিষ্কার করে দিতে হবে।

আমি একেবারে Extreme Case নিয়েই বলছি, অর্থাৎ যে সব গল্পে বক্তা বা লেখক কতকটা অসাধারণ বা উদ্ভট কল্পনার আশ্রয় নিয়ে সেই ধরনের গল্পই ফেঁদেছেন। অন্য যে সব শাদা-মাটা গল্প, তাতে তাঁর কাজ ঢের সোজা, ঘটনা বা অনুভূতিটিকে ফুটিয়ে সামঞ্জস্য বজায় রেখে গেলেই তাঁর কাজ যাবে মিটে, সামর্থ্য অনুযায়ী রসটি তাঁর হাতে উঠবে ফুটে।

খোশগল্প কিন্তু একেবারে অন্য ধরনের জিনিস! সর্বপ্রথম, তাকে উদ্ভট হতে হবে, আর যত হয়, ততই তাব বাহবা। একথাটা হল বক্তা বা লেখকের দিক দিয়ে।

পাঠকের দিকে দিয়েও আছে; খোশগল্পের পাঠক বা শ্রোতা বসবে একেবারে খোশমেজাজে, (পাঠকের চেয়ে শ্রোতা হওয়াই আরো ভালো, কেননা, সাহিত্যিক গল্প যেমন লেখাতেই জমে, খোশগল্প জমে বলায়)। তাকে অনেক ক্ষ্যামা-ঘেন্না করতে হবে, কেননা ছোটখাটো খুঁতখাঁত কোথায় কি থেকে যাচ্ছে, সেদিকে কান দিতে গেলে পদে পদে প্রশ্ন তুলে সে-ই গল্পের মজলিসে হয়ে উঠবে অবান্তর। আসল কথা, অসম্ভাব্যতাই হচ্ছে খোশগল্পের প্রাণবস্তু; তার অন্তর্নিহিত রস—হাস্যরস—গল্পটা আসলে বিস্ময়েরই হোক, করুণার হোক বা ভয়েরই হোক; নিছক হাসির গল্প হলে তো কথাই নেই, তবে সে-হাসি প্রধানত তার উদ্ভটতার মধ্যে দিয়েই। একথাগুলো মেনে নিয়েই যখন গল্প শুনতে বসেছি, তখন বক্তাকে তো একটা ঢালোয়া-লাইসেন্স দিয়ে বসেছি, ছোটখাটো ব্যাপারগুলো এড়িয়ে বা টপকে না গেলে কিংবা বাস্তব বা শাস্ত্রসঙ্গত হল কি না, অত দেখতে গেলে গল্প এগুবে কোথা থেকে?

এই চিঠির মধ্যে আমি তোমায় দুরকম গল্পেরই নমুনা দিয়েছি। গুপী-নারাণী-পালবৌয়ের গল্পটা ধর; ওটা হাস্যরসের একটা সাহিত্যিক গল্প। ওতে আমায় কয়েকটা একটু অসাধারণ গোছের চরিত্র সৃষ্টি করে তাদের কতকটা অসাধারণ অবস্থার মধ্যে ছেড়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু যতই অসাধারণ হোক, না চরিত্র, না পরিস্থিতি—কোন কিছুর মধ্যে অসম্ভাব্যতার কিছু নেই। এ ধরনের গল্পে লেখক স্থান, কাল, পাত্র সব বিষয়েই তার জবাবদিহি নিয়ে তোয়ের আছে। তুমি চাও জবাবদিহি, পাবে, যদি না পাও তো যে পরিমাণ পাচ্ছ না, বুঝতে হবে, সেই পরিমাণে গল্পের মধ্যে গলদ আছে, গল্প রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি।

অবশ্য আমি এমন পাঠকের কথাই বলছি, যার মাথায় কিছু বস্তু আছে। নৈলে প্রশ্ন করে দিতে তো পাগলেও পারে। বরং বেশি পারে।

এবার এই গল্পটার কথা ধরা যাক। এটা একটা ডাহা অন্তত (typical) খোশগল্পের নমুনা। এর সবটাই অসম্ভব-অসঙ্গত, কোথায় আঙুল দিয়ে দেখাবে? আগুন নেই ফায়ার ব্রিগেড এল—সোজা না নামিয়ে বাঁকাপথে ওভাবে নামাতেই বা গেল কেন যোদো পাগলাকে? পড়ে থেঁতো হয়ে মরল,

[illegible] ঠিক হল বিষপ্রয়োগ—আসামী চাই, যে-কোনও একটা লোককে টেনে হাজতে পোর'—ক্লাইমেক্স হল সেই যোদো পাগলকেই আসামী করে ধরা যে বিশিষ্ট ঘরের ছেলে হয়ে হত্যা হয়েছিল—বিশিষ্ট ঘরের ছেলে যে ঐ যোদো পাগলারই সংগ্রহ করা একটি বারোসেরী খাসী, এটুকু তো নিতান্তই ফাউ!

এত উদ্ভট উদ্ভট ব্যাপার গলাধঃকরণ করবার জন্যে যারা তোয়ের রয়েছে, তারা ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি কোথায় কি ঘটছে, তার জন্যে মাথা ঘামাবে না, তারা আপত্তি করবে না যে, ফায়ার ব্রিগেড ওরকম ছেলেমানুষী কাণ্ড নয়, সিভিল সার্জেন কথায় কথায় নিজের হাতে পোস্টমর্টেম করতে বসে না, কিংবা পাবলিক হ্যাঙ্গিঙের (Public hanging) যুগ আর নেই বা এত তুচ্ছ কথায় হয় না। অথচ সাহিত্যিক গল্প হলে এই সব কথা নিয়েও সমালোচক ফোঁস ফোঁস করে উঠত। আরও অনেক খুঁটিনাটি যার কথা আর ধরলাম না।

তবুও, আবার সব কথা বলেও বলতে হয় খোশগল্পও শেষ পর্যন্ত সাহিত্যিক গল্পই। সাহিত্যের শেষতম কথা রস, যেমন ম্যুনিসিপ্যালিটির শেষতম কথা ট্যাক্স (সে-ও তো রসই)। এই ট্যাক্সের গন্ধ পেলেই ম্যুনিসি-প্যালিটি যেমন শহরের প্রত্যন্ত ভাগেও একটা ল্যাম্প পোস্ট বসিয়ে নিজের সীমানা বাড়িয়ে নেয়, তেমনি রসের সন্ধান পেলেই ব্যাকরণ-অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধিনিষেধ না মেনে সাহিত্য এগিয়ে তার ছাপ মেরে দেয় গায়ে, এই করে নিত্য-নিয়তই সেও নিজের পরিধি বিস্তার করে যাচ্ছে।

অত কথা কি, খোশগল্প তো পদে আছে, তুমি একটা গাঁজাখুরি গল্পই লিখে পাঠাও না, পরীক্ষায় উতরে গেলে তার জন্যও সাহিত্যপরিষদের সার্টিফিকেট যোগাড় করে দেওয়া শক্ত হবে না।

কিন্তু এসব কথা এই পর্যন্তই থাক আপাতত। গল্পই শোন, অত জাত-বিচার করে কি হবে?

সিরাকোলেই একটি যাত্রীর সঙ্গ পেয়েছিলাম, তার কথা বলা হয় নি। শরীরটা থলথলে মোটা, চেহারাটা মাকুন্দ-মাকুন্দ, গায়ে একটা পিরান, ডান ওপর-হাতে তামার তারে একটা বড় মাদুলি; বয়স বছর চল্লিশ হবে। বয়স

বাদ দিয়ে লোকটা পিকউইক পেপারের (Pickwick paper) সেই 'জো'র কথা মনে করিয়ে দেয়। বসে বসেই ঘুমুচ্ছিল, আমি ওঠবার পরই জেগে উঠে এমনভাবে চারিদিকে চাইতে লাগল, যেন ছমাস পরে ঘুম ভেঙেছে। বেশ বুঝতে পারা গেল, কোথায় আছে, কি ব্যাপার যেন ঠাহর করতে পারছে না, তার পরেই একটু চাঁক হতে ত্রস্ত হয়ে অনির্দিষ্টভাবে জিগ্যেস করতে লাগল —"এখানে কিছু পাওয়া যায় না? অ্যাঁ, এখানে পাওয়া যায় না কিছু?" তার পরে নজরটা প্ল্যাটফর্মের স্টলে গিয়ে পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল—"এই যে, দোকানী! এক ঠোঙা ফুলুরি আর বেগুনি—এই যে ধর আধুলি···শীগগির —গাড়ি ছেড়ে দিলে বলে···"

"আপনি ব্যস্ত হবেন না, ইঞ্জিন এখানে জল নেবে···"

"তা নিক, তুমি নিয়ে এস শীগগির—এই আট আনি বের করে রেখেছি —খুচরোটা হাতে করে নিয়ে এস···একটু তরস্ত হও···যেন গা নেই যে হে, জল নিতে আর কত লাগে ইঞ্জিনের? ভাঁড়ে করে তো নিতে হচ্ছে না···"

দোকানী একবার চোখ তুলে চেয়ে দেখলে, প্রশ্ন করলে—"কতর?"

"তা···ঠোঙাটা একটু বড় হবে—বেশ মাপিকসই বড়····একটু শীগ্রি—গার্ট-সায়েব ঐ বেরুল ঘর থেকে···"

[illegible] ছোকরা ঠোঙাটা নিয়ে এসে একটা দো-আনি দিয়ে আধুলিটা নিয়ে গেল।

গাড়ি যেটুকু থামল, তার মধ্যেই ঠোঙাটা পরিষ্কার করে দিয়ে বাইরে ফেলে দিলে। শেষের দিকে চিবুবার ক্লান্তি বা আমেজেই চোখ দুটি ঢুলঢুল করে এসেছিল, একটা তালি দিয়ে হাত দুটো ঝেড়ে ফেলে আবার গাড়ির দেয়ালে পিঠ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, সেই অবস্থাতেই পাশের একটা বুড়ির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। মুখটা বিরক্তিতে কুঁচকে-মুচকে বসেছিল, কোলে একটি রোগা-গোছের শিশু, বোধ হয় নাতি, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে নিয়ে বললে—"সেই কোন্ পৈলেন থেকে নিত্যি এই কাণ্ড—বসে বসে দেখেছি 'এখানে কিছু মেলেনি?'···তারপর ফুটি, কাঁকুড়,

পেয়ারা, শশা, মুড়ি, ফুলুরি—যা পাওয়া গেল এই রকম গোগ্রাসে গিলে ঘুম—কিছু না পেলে তা একটা ডাবই শেষ করে তার শাঁসটা নিয়ে পড়ল। একটি ইস্টিসন বাদ দিতে দেখলুম নি—পেট, না বাকড় গো!…কুম্ভকর্ণও খেত, তেমনি ছমাস নিদ্রেও দিত—এ যেন শাস্তোরকেও পিছুতে ফেলে এল বাবা! সামনে একটা শিশু বসে রয়েছে…হ্যাঁ, দেবে!…তা, ও ঠাকুর! খাও, ঘুমোও, তা পরের গায়ে অমন করে ঢুলে ঢুলে পড়লে চলবে কেন? সিধে হয়ে বোস—য্যাতো এগুচ্ছ, ওজন বাড়চে বই তো কমচে না—এই একটা আধমরা শিশু, চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে যাবে নি?…কাকে বলা!…হরিণডাঙা এলে যেন বাঁচি বাবা! …"

একটা ধাক্কা দিয়ে ছেলেটাকে সামলে নিয়ে একটু ঘুরে বসল।

হরিণডাঙায় গাড়ি বদল করতে নেমেই দেখি সেই ব্যাপার, আমায় প্লাটফর্মে দেখেই ব্যাকুল ভাবে জিগ্যেস করলে—"এ ইস্টিশনে কিছু পাওয়া যায় না বাবু?"

বললাম—"আপনি সিরাকোলে তো অতগুলি ফুলুরি বেগুনি খেলেন…"

"যায় না পাওয়া বুঝি কিছু?—বলে নিরাশভাবে বাইরের দিকে আবার নজর পড়তেই চোখ দুটো চকচক করে উঠল—"ঐ যে!… ও ঘুঘনি! এদিকে … এদিকে....এই নাও দো-আনি—কটা ঠোঙা দেবে?…"

ইন্টার ক্লাসে উঠেই আমি গল্পে গেলাম ডুবে, কটা ঠোঙা খালি হল, আরও কিনলে কি না সেটা আর দেখা হল না।

এর পর চার নম্বর হল্টে মজলিসের সবাই নেমে যেতে গাড়িটা গেল খালি হয়ে। অবকাশ পেয়ে আমার কৌতূহলটা আবার গিয়ে সেই লোকটাকে আশ্রয় করলে—খাচ্ছে, না, ঘুমুচ্ছে?

খালি গাড়ি ভালও লাগছে না, নেমে আবার থার্ড ক্লাসে ঢুকলাম—ওরই গাড়িতে। বেশ বোঝা গেল, গভীর নিদ্রা থেকে সদ্য জেগে উঠেছে। সামনে পেয়ে আমাকেই জিগ্যেস করলে—"এটা কোন জায়গা মশাই? কিছু পাওয়া যায় না?"

বললাম—"এটা একটা হল্ট—চার নম্বর হল্ট—কিছুই পাবার নেই এখানে, আপনি নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমোন।"

সেই ব্যাকুল দৃষ্টি, খুঁজছে। প্রশ্ন করলাম—"যাবেন কোথায়?"

"সরারহাট।"

"বাড়ি?"—প্রশ্নটা করলাম কতক যেন এই ভেবেই যে, কৃষ্ণের জীব, যেমন আরম্ভ করেছে সু-ভালাভালি ঘরে গিয়ে পৌঁছুতে পারলে যেন আমাদেরই একটা অস্বস্তি কেটে যায়।

"আজ্ঞে না, বেহাই বাড়ি।"

—আঁতকে উঠতে হল উত্তর শুনে।

"বেহাই-বাড়ি যাচ্ছেন!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ছোট মেয়েটাকে ঐখানেই পাত্রস্থ করলাম কি না, এই গত মাঘে।"

ঠায় চেয়ে রয়েছি, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। একে এই কুটুম, তাতে আবার নতুন কুটুম, কী সর্বনাশটাই যে ঘটাতে চলেছে গেরস্তের বাড়িতে!

"এই প্রথম যাচ্ছেন কুটুম্বিতার পর?"

"না, একবার হয়ে এসেছি, এর আগে।"

চেয়েই আছি অবাক হয়ে। জেনেই জিগ্যেস করলাম, কিংবা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"খবর দিয়ে যাচ্ছেন?"

—কার বিপদ, আর কার মাথা ব্যথা!

আসল কথা, বেয়াইয়ের ওপর মনটা মমতায় উঠেছে ভরে, বোধহয় মগ্নচৈতন্যে এমন একটা শুভ সম্ভাবনার কথা উদয় হয়ে থাকবে যে, খবর দিয়ে গেলে সে-বেচারা তবুও বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে সপরিবারে কোথাও গিয়ে আত্মগোপন করতে পারে।

মনের গলদ থাকার জন্যেই প্রশ্নটা করে নিজেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছি; কিন্তু বাঁচোয়া, লোকটা ধরতে পারে নি; অত খেলে বুদ্ধির ধার মোটা হয়ে যায়ই, জঠরের শক্তিও হবে, আবার মাথার শক্তিও হবে, ভগবান অত দুহাতে দান করেন না।

বললে,—"খবর দেওয়া আছে, বেহাই থাকবে ইস্টিশনে

আমার মাথায় এক চিন্তাই ঘুরে ঘুরে আসছে, আবার প্রশ্ন করে ফেললাম --"কেমন গেরস্ত বেহাই?"

"আজ্ঞে তা, বলতে নেই, ভালোই। মেয়ে আমার আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে ভালো ঘরেই পড়েছে, মোটা ভাত, মোটা কাপড়টার জন্যে কষ্ট পাবে না, ক্ষেত, খামার, পুকুর-বাগান—বাড়িতে চারটে গাই—দুটো দিচ্ছিলই দুধ, একটা আবার নতুন বিয়েছে, তাই বিশেষ করে লিখে পাঠিয়েছেন বেহাই—না, সেদিক দিয়ে মেয়ে আমার ··"

মেয়ের কথা ভাবি নি, যার কথা ভাবছিলাম, তার কথা ভেবেই মনটা বেশ হাল্কা হয়ে উঠল। আহা ভালোই, সম্পন্ন গেরস্ত, তার দুধের উপর দুধ উছলে উঠছে, সে ভোজনবিলাসী নতুন কুটমকে ডেকে এনে আমোদ-আহ্লাদ করছে —এযুগে একটা শোনবার কথা। বাঙলার একটা বিস্মৃত রূপ যেন চোখের সামনে ফুটে ওঠে—কুটুম এসেছে, পুকুরে পড়ল জাল, গোয়ালে চোঁচা শব্দের বিরাম নেই; খাইয়ে কুটুম, আহার দেখিয়ে সবার তাক লাগাচ্ছে, গেরস্ত ভাবছে লক্ষ্মীর আমার এতদিনে বেরুল জলুস···

এতক্ষণ কথায় যে একটা ব্যঙ্গের ভাব ছিল, সেটা কেটে গেছে, বেশ সহজ আনন্দেই প্রশ্ন করলাম—"তা অমন কুটুম-বাড়ি যাচ্ছেন; অথচ খাওয়ার পাট রাস্তাতেই একরকম সেরে নিয়ে · মানে, তাঁদের নিরাশ করা····"

অল্প হেসে পেটে হাতটা একবার বোলালে, বললে—"আজ্ঞে না, এতে ক্ষেতি হবার কথা তো নয়—পাওয়া গেল কোথায় কিছু? দেখলেন তো স্বচক্ষেই?"

তা দেখলাম বৈকি!

শুয়ে পড়ল। বাজে কথায় অনেক সময় নষ্টও হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়ল; আশ্চর্য ক্ষমতা দেখলাম। এখুনি না তোমায় লিখেছি, ভগবান দুহাতে দান করেন না? কথাটা যে খুব সত্যি, তা কি করে বলি?—এই দুঃখের দুনিয়ায় একটা লোক শুধু খেয়ে উঠে ঘুমোচ্ছে, আর ঘুমিয়ে উঠে খাচ্ছে, এ যাঁর বিধানে সম্ভব, তাঁর দানকে অমন সীমাবদ্ধ করাই বা যায় কি করে? এর ওপর আবার বেছে বেছে তাকে অমন বেহাই বাড়িও দিয়েছেন জুটিয়ে।

গায়ে পড়ে ঢুলছিল, বুড়ি নেমে যেতে একটু শুতে পেয়ে নাক ডাকতে আরম্ভ করেছে। বেশ লাগছে, কেননা, তৃপ্তি দেখেও তৃপ্তি পাওয়া যায়, সব সময় যে হিংসেই হতে হবে, এমন কি কথা আছে?

ফুটবল খেলা হচ্ছে। দূরে ওটা নিশ্চয় ইস্কুল; ওরই খানিকটা এদিকে একরকম চষা-মাঠেই হচ্ছে খেলা। এ-জিনিসটা আমায় বড্ড টানে, এখনও। খেলা বা খেলা দেখার কথা তো দূরে থাক, এক সময় ফুটবলের চিন্তায়ই যে আনন্দ পেতাম, বোধ হয়—কি তুলনাটা দিই?—বিয়ের চিন্তাতেও সে আনন্দ পাই নি। এক সময়ের কথা বলছি, যখন বিয়ের কথা আতঙ্কের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখনকার কথা নয়। এখন খেলা গেছে, চিন্তারও অবসর নেই, তবে দেখার আনন্দ আর উত্তেজনাটা বজায় আছে, একেবারে ততটা না হোক। এক কথায় ঐ জিনিসটা আমার যৌবনকে ডেকে নিয়ে আসে এখনও। একথাটা এ চিঠিতেই তোমায় আরও দু-এক জায়গায় লিখেছি—অর্থাৎ আমাদের জীবনে সবই একসঙ্গে রয়েছে—শৈশব, কৈশোর, যৌবন—অর্থাৎ যা অতীত, তা তো বটেই, এমনকি, যা আগামী প্রৌঢ়তা বার্ধক্য, তা পর্যন্ত; সময়ের ডাক পড়লে, ঠিক সেই তারে ঘা পড়লে, বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়।···আমি বয়সকালেই মাকে হারিয়েছি—কিন্তু সেদিনের সেই অসহায়তা—সেই যেন বুক থেকে খসে পড়বার ভাবটা এতই সত্য আর এতই নিবিড় হয়ে ফুটে উঠেছিল, সে এখনও মনে পড়লে ঝিমিয়ে আসে মনটা। অথচ অবস্থা তখন কত উল্টে গেছে দেখ, যাঁর স্তন্য ছিল জীবনের সম্বল এক সময়, আমিই তখন উপার্জ্জন করে তাঁর মুখে অন্ন দিচ্ছি, সন্তানই তখন মাতা, সন্তানই তখন পিতা।····বড় গোলমেলে ব্যবস্থা নয় ভগবানের? অবশ্য ভগবানকে চটাবার ইচ্ছে নেই, গোলমেলে আমাদের বুদ্ধির খর্বতার জন্যেই; তবে এ রকম বিরাট জটিল বিশ্ববিধানের মধ্যে এ রকম খর্ব বুদ্ধি দিয়ে পাঠিয়ে অন্যায় করেছেন বললে যদি চটেন তো নারাজ।

ফুটবল আমায় এখনও টানে। মোহনবাগান হলেই নিশ্চয় ভালো, অভাবে কালীঘাট, কুমারটুলি, শিবপুর, কলেজ, স্কুল—কিছুতেই বিতৃষ্ণা নেই।···খেলা জোর চলেছে—দূর থেকে যতটা বুঝতে পারছি। অবশ্য জোর মানে যে উঁচু

দরের কম্বিনেশন শট্, ড্রিবলিং, সে-সব কিছু নয়; এ অজ পাড়াগাঁয়ে আশাও করা যায় না; তবে জোর খেলার তো আরও লক্ষণ আছে, মাঠে ফ্ল্যাট হয়ে পড়ছে সব ঘন ঘন– ধাক্কা, ল্যাং, চোরা গোত্তাও চোখে পড়ল যেন গোটা দুই, রেফারি সামলাতে পারছে না। শুধু তাই নয়, রেফারিকেই সামলানো একটা সমস্যা হয়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে,—একটা বেশ বলিষ্ঠ খেলোয়াড়কে বাইরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বের করে দিতে চেয়েছিল, কলকাতার স্টাইলে, সে হরিণডাঙা-সরারহাটের স্টাইলে এগিয়ে এসে নাকের কাছাকাছি পর্যন্ত ঘুষিটা বাড়িয়ে এনে আবার খেলতে শুরু করে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে কি মন্ত্র ঝাড়লে অবশ্য এত দূরে কানে এসে পৌঁছল না। কয়েকটা ছেলে রেফারিকে লক্ষ্য করেই শটও হাঁকড়ালে, আইন বাঁচিয়ে ভদ্রভাবে পেড়ে ফেলতে চায় আর কি!

তুমি বলবে খেলা কোথায় যে দেখতে যাবে?…ও-ও তো খেলাই, গা বাঁচিয়ে ডিঙিয়ে-ডিঙিনেই যে খেলতে হবে, গায়ে আঁচড়টি লাগবে না, তার মানে কি? সে-কথা বাদ দিলেও আমি এই ধরনের খেলাতে কতকটা অভ্যস্তও। আমাদের সময়ে আমাদের ছাপরা, আরা, দানাপুর, গয়া, মোতিহারী খেলতে যেতে হত। মোতিহারীকে শুধু উগ্র তামাকপাতার জায়গাই বলে নিশ্চিন্ত থেক না, সবই উগ্র ওখানকার। আমাদের টিংচার আয়োডিন আর হর্স এম্ব্রোকেশন্ (Horse embrokation) ছাড়া পটি বাঁধবার জন্যে যথেষ্ট ব্যাণ্ডেজও নিয়ে যেতে হত। পকেটে যে শ্মশানকালীর ফুল থাকত সেটা বাড়তির মধ্যে। ছাপরার মাঠের পাশেই আবার একটা মকাইতের ক্ষেত ছিল; ইচ্ছাকৃত কি মাত্র একটা যোগাযোগ তা বলতে পারি না, তবে কম্পিটিশনের শেষ দিকটা ওরা ঠিক সেই সময়ে ফেলত যখন মকাইয়ের ডাঁটাগুলোও বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে।

সাধু সাজছি না, আমরাও নিরীহ ছিলাম না নিতান্ত, কি করব? যে যুগের আর যে জায়গার যা বিধি—ওর মধ্যে থেকেই কাপ-শীল্ড নিয়ে আসতে হবে, কেঁচো হয়ে তো কেউটের মাথার মণি ছিনিয়ে আনা যায় না। একবার মনে আছে, খেলোয়াড়দের সঙ্গে যা বোঝাপড়া হবার তা তো হল,

শেষকালে গোলের কাছে একটা ফ্রি কিক্ দিতে রেফারিকে ইতস্তত করতে দেখে সেণ্টারফরোয়ার্ড আমার সেজ ভাই এক হাতে বলটা তুলে নিলে, তারপর এক হাতে রেফারির কব্জিটা শক্ত করে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ফাউলের জায়গাটিতে বলটি বসিয়ে তাকে বললে—ভালো চাও তো হুইসিল দাও। নিজেদের মাঠ নয়, বাইরে খেলতে গেছি; মেরে তক্তা করে দেবারই কথা, কিন্তু এই চরম দুঃসাহসে দর্শক, শ্রোতা এমন তাক্ লেগে গেল যে, একটা আওয়াজ পর্যন্ত করলে না।

তা ভিন্ন ওরা পছন্দও যে করে এইসব; দুঃসাহসের অর্থটা আমাদের অভিধানে এক; ওদের অভিধানে আর। কেন, সে-যুগের ছাপরা-মোতিহারীই যে আদর্শ, তা অবশ্য বলছি না, তবু খেলায় এই যাকে বলে Hustiing tactics অর্থাৎ গুঁতোগুঁতি ধ্বস্তাধ্বস্তি—ওটা বাইরেও সর্বত্রই রয়েছে। এই কলকাতার মাঠেই করিন্থিয়ান্‌সদের দেখেছি, স্ক্যাণ্ডেনিভিয়ান টীমও দেখলাম, চীনে টীমও দেখলাম—ক্রীড়ানৈপুণ্যও আছে, সঙ্গে সঙ্গে পেশী-নৈপুণ্যেরও অভাব নেই।

তোমরা বাপু অতিরিক্ত বুদ্ধিবাদী, অত চালাকিতে কাজ হয় না। এক সময় না এক সময় বুদ্ধিও যায় ফেল মেরে, অর্থাৎ মাসল্‌সের সামনে আটকে। আমার তো মনে হয় ঠিক এই জন্যেই বাঙালী একটা ভালো সেণ্টারফরওয়ার্ড, বেরুল না! অর্থাৎ গোলের সামনে একেবারে চরম মুহূর্তে বিপক্ষ যখন মরিয়া হয়ে দাঁড়ায়, অতিরিক্ত বুদ্ধিবাদীর দৌর্বল্যটা প্রকাশ হয়ে পড়ে বাঙালী খেলোয়াড়ের। সব মাস্‌ল্ সজাগ করে নিয়ে মাস্‌লের স্তূপে ঝাঁপিয়ে পড়বার সাহসটা আর থাকে না। খবরের কাগজগুলো মন্তব্য করে—He failed at the right moment. His shot lacked powder—

—মোক্ষম সময়টিতে জিভ বের করে ফেললে; গুলি দাগলে, কিন্তু বারুদের অভাব ছিল…

অবশ্য সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই; সে খেলোয়াড়ও নেই, সে ছাপরা মোতিহারীও গেছে। এখন ওখানকার ছেলেরাও ফিনফিনে ধুতির কোঁচা দোলায়, ভাতের চালটা সরু না সারাদিন ঢেঁকুর তুলে সোডার

বোতল খুঁজে বেড়ায়, মাথায় টুপি কিংবা টিকি থাকলে ওজনের ভারসাম্য হারায়, তেল-চুকচুকে মাথায় লম্বা টেরি তুলে ফুরফুরে হাওয়ায় রাস্তা করে দেয়। এখন বঢ়হমৃদেও তেওয়াড়ীকে মনে হবে যেন তরুণ সেন।

ইচ্ছে দেখে আসি নেমে, কিন্তু সাহস হচ্ছে না। গাড়িটা কি একটা কারণে হল্টে একটু আটকে গেছে, কিন্তু গলা বাড়িয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম এবার আর ইঞ্জিন বিগড়োবার জন্যে নয়, পয়েন্ট অর্থাৎ লাইনের জোড়ে কি একটা গোলমাল হয়েছে সামনের স্টেশন সরারহাটে। একটু সময় যাবে পাওয়া, কিন্তু বেলা পড়ে এসেছে, পেছনে আর গাড়িও নেই, সাহস হল না।

আহা, হত আমাদের সে-যুগের বি, এন, ডবলিউ, আর। সে স্বরাজের কল্পনাও করতে পারবে না। স্টেশন-মাস্টারের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো হচ্ছে, গার্ড, ড্রাইভার, ফায়ারম্যান নেমে গিয়ে হাত জোড় করে বসল—হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান—কেউ বাদ নয়,—কথকতা শুনলে, প্রসাদ নিলে, আবার ভক্তিমন্থর গতিতে এসে নিজের নিজের ডিউটিতে মোতায়েন হল। একবার রাস্তার ধারের একটা বড় পুকুরে ছিপে মাছ গেঁথে শিকারী হিমসিম খাচ্ছে দেখে, ড্রাইভার নেমে গিয়ে সামলে দিয়েছিল মনে আছে, নামটাও মনে আছে, আলি জান, নালিশ করব বলে রেগে-মেগে টুকে রেখেছিলাম। নালিশ অবশ্য করা হয় নি। আলি জান একটা প্রায় অর্ধ মণের কাতলা ডাঙায় তুললে; একটা দুর্লভ দৃশ্য, তারই উল্লাসে মনটা কেমন উদার হয়ে গেল, ভাবলাম এরা মুক্ত জীব, নৈলে এরকম চাকরি কপালে জোটে না, থাক, ভোগ করুক।

নালিশ না করে একটা গল্পে আলি জানকে ট্রিবিউট দেওয়াই ঠিক করি; আমার "বি এন ডবলিউর ব্রাঞ্চ লাইনে" গল্পটা পোড়ো। পড়ে আলি জানের ওপর যদি রাগ পুষে রাখতে পার সেটাও জানিও।

খেলা দেখছিলাম স্টেশনের উল্ট দিকে মুখ ফিরিয়ে, হঠাৎ প্লাটফর্মের দিকে দরজার খটখটানি আর সঙ্গে সঙ্গে ত্রস্ত কণ্ঠস্বর—"দোরটা খুলে দিন—খুলে দিন না দোরটা—ছেড়ে গেল বুঝি গাড়িটা !...."

ফিরে দেখি একটি বৃদ্ধ গোছের লোক, তার বুকে একটি শিশু, পাশেই একটি তরুণী বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে। দরজাটা বেশ কড়াই, আমি এগিয়ে গিয়ে

খুলে দিলাম। লোকটি কাঁপছিল, বললাম—"ধীরে-সুস্থে উঠুন, গাড়ি ছাড়বার দেরি আছে এখনও।"

"মেয়েটাকে তুই ধর একটু—সাবধানে, আমি উঠি আগে।"

তরুণীর কোলে দিতে যাচ্ছিল, আমি বললাম—"বরং আমায় দিন।"

কাঁথায় জড়ানো মেয়েটিকে নিয়ে সরে দাঁড়ালাম, ওরা দুজনে উঠে এল। মেয়েটিকে দিয়ে দরজাটা লাগাতে যাব, একটু থেমে যেতে হল। একটা পাল্‌কি এসে হল্টের বাইরে নেমেছে, একটি যুবক আর একটি যুবতী বেরিয়ে এল, তারপর আমাদের গাড়িটা সামনে থাকার দরুন বেয়ারাদের মালপত্র নিয়ে আসতে বলে হন-হন করে এই দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল; এদের সঙ্গেও একটি শিশু ছেলে, তবে একটু বড়, বছর সাড়ে তিন-চারের হবে, আর বেশ সুস্থ; যুবকটি কোলে তুলে নিয়েছিল, জোর করেই নেমে হাটতে হাটতে ওদের আগেই এসে পড়ল। খোলা দোর দেখে উঠতেও যাচ্ছিল নিজে, আমি তুলে নিলাম। ওরা দুজনে উঠল, বেয়ারারাও জিনিসপত্র তুলে দিলে—একটা ভালো ট্রাঙ্ক, দুটো ভালো সুটকেস, জলের কুঁজো, হোল্ড-অলে বাঁধা বিছানা, একটা থার্মোফ্লাস্ক, একটা বন্দুক—ক্যাম্বিসের খাপের মধ্যে। তিনজনে বেশ সুসজ্জিতও, চেহারাতেও মনে হয় বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের। আমি দেখতে বেরিয়েছি—এও বোধ হয় বাঙলার একটি দ্রষ্টব্য রূপ বলেই দেখালেন ভগবান।

আমি যে দিক্‌টায় বসেছিলাম, এরাও বোধহয় আমার সাহায্যে ওঠার জন্যেই গাড়ির সেই দিকটাতেই বসল, মাঝের কামরায় বেয়ারারা মোটঘাট-গুলো তুলে দিলে; তারই একটা বেঞ্চে সেই ভোজন-বিলাসীটি ঘুমুচ্ছে, অত যে শব্দ হল একটু চোখের পাতা নড়ল না। বোধ হয় আহারের সম্ভাবনা না থাকলে ওঠে না, অত গভীর নিদ্রার মধ্যে কি করে সে প্রশ্নটা জেগে থাকে ওর মধ্যে তা ওই জানে! যেন একটা "Freak of nature"—প্রকৃতিদেবীর সৃষ্টির মধ্যে একটি ব্যতিক্রম, শুধু কার্যে প্রকাশ পেয়েছে তাই, যদি আকারেও প্রকাশ পেত তো দেখতাম, একটি ধড়, দুটি মুণ্ড, তার মধ্যে একটি চোখ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে, একটি চোখ মেলে অবিরাম খেয়ে যাচ্ছে।

ছেলেটি বড় চমৎকার, চঞ্চল বলে সে চমৎকারিত্বের আরও খোলতাই

হয়েছে। মা সাজিয়েছেও মনের মতন করে—অবশ্য তার মনের মতন করেই—পায়ে সাদা গোটানো মোজার ওপর নটি-বয় স্ট্র্যাপ জুতো, গায়ে সাদা আর নীল রঙের নেকার-বোকার, মুখে পাউডার; এর ওপর আছে ঠোঁটে রং, কপালে টিপ, চোখে কাজল; বড় বড় চুলগুলি বেষ্টন করে একটি নীল রঙের ফিতে পর্যন্ত মাথায় 'বো' (Bow) ফুলিয়ে রয়েছে। বেশ বোঝা যায় এটি মায়ের প্রথম সন্তান। ছেলেয়-মেয়েয় দু তিনটি না হওয়া পর্যন্ত বাঙালী মায়ের আশা মেটে না। তাই প্রথমটি যদি ছেলে হল তো তাকে টিপ-কাজল-ফিতেয় খানিকটা মেয়ে করে দেয়, যদি মেয়ে হল তো ইজেরের ওপর পেনির বদলে কামিজ-কোট পরিয়ে তোলে সাধ্যমতো ছেলে করে, এই করে ভগবান সদয় না হওয়া পর্যন্ত একের মধ্যে দুইয়ের সাধ মিটিয়ে চলে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে।

আমরা যে মনে-প্রাণে দ্বৈতবাদী, এটাও তারই একটা ধারা। মেম-মায়েরাও তো মা, কিন্তু কৈ, এত জটিলতার ধার দিয়েও যেতে দেখেছ?—আদরের এরকম জগাখিঁচুড়ি করে তুলতে?

চমৎকার ছেলেটি, এই যুগলরূপে যেন আরও চমৎকার; রূপ আবার অনেকখানি ভাবের মধ্যেও তো। অবশ্য শৈশব বলেই; সখীভাবে গোঁফের ওপর নোলক ঝোলাতেও দেখেছি, ভাব বলেই কি তার সাত-খুন মাফ?.... তা ভিন্ন তাকে ভাবই বলবে, না, স্বভাব?

সুন্দর ছেলেটি, দুটি বেঞ্চের মাঝখানের জায়গাটা দখল করে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে; পরিচয় করে গেল—"টোমার নাম কি?" ওর নিজের নাম "টোরুণ।"

কিন্তু সুন্দর সুস্থ, প্রাণের প্রাচুর্যে চঞ্চল বলেই, এই গাড়ির মধ্যেই একটা দিক যেন আরও বিষাদ-ঘন করে তুলেছে। শিশু মেয়েটি একেবারে অন্য ধরনের।

অত কুৎসিত আর নির্জীব প্রায় চোখে পড়ে না। হয়তো আসলে কুৎসিত নয়, চোখ দুটি বড় বড়, নাকটি টিকলো, রংও আছে, কিন্তু অদ্ভুত রকম শীর্ণ। এ ধরনের শীর্ণতা আমি এত ছোট শিশুর মধ্যে এর আগে দেখি নি; রগ দুটো বসা, গালের হাড় ঠেলে উঠেছে, মাংস পড়েছে ঝুলে, কপালের মাংসও

কোঁচকানো, মাথার চুল পাতলা, সব মিলিয়ে ঠিক যেন একটি বুড়ির মুখ। চোখ দুটি যে বড় বড় দেখাচ্ছে তাও কতকটা মুখে মাংসর অভাবেই, নাকটুকুও সেই জন্যেই অতটা তীক্ষ্ণ, রংটাও ওরকম কটাশে।

মেয়েটিকে দেখলেই একটা বিস্মিত প্রশ্ন জেগে ওঠে মনে—কি করে বেঁচে আছে! একটা অদ্ভুত ধরনের আতঙ্ক অস্বস্তি ঠেলে ওঠে।

বসেছি আমরা, আমার বেঞ্চে দুজন, আমি আর যুবকটি; সামনের বেঞ্চে তরুণী দুটি, এক কোণে বৃদ্ধ। মেয়েটা মায়ের কোলে নেতিয়ে পড়ে জুলজুল করে নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, ছেলেটা করছে দাপাদাপি। এর সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ওর কদর্যতাকে আরও তুলেছে ফুটিয়ে। কোন্‌টাকে দেখি?—এ টানছে, ও ঠেলছে বলে যেন আরও বেশি করে টানছে।

তারপর এই অদ্ভুত সমাবেশে, এই বিচিত্র পাত্র-পাত্রী নিয়ে—নায়ক-নায়িকাই বলি—একটি অদ্ভুত একাঙ্কিকা অভিনীত হয়ে গেল—তার রসটা কৌতুক বলি, কি মধুর বলি, কি করুণ বলি বুঝে উঠতে পারছি না, সব মিলিয়ে অনির্বচনীয় বলাই ভালো।....

একটি স্বয়ম্পূর্ণ একাঙ্কিকা নাটকই বৈকি; দৃশ্যের শেষে বিচক্ষণ শিল্পী মঞ্চের আড়াল থেকে নিবিড়-কৃষ্ণ যবনিকাও দিলে যে টেনে।

যে তরুণীটি পালকিতে করে পরে এল, সে প্রথমে কতকটা যেন শুচিতা বাঁচিয়েই একটু তফাত হয়ে বসে ছিল, নিজের ছেলেটাকে সামলাচ্ছে, মাঝে মাঝে মেয়েটির দিকেও একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখছে, তারপর দেখে দেখে কি মনে হল, একটু এগিয়ে গেল। কারণটা আমি আন্দাজেই বলছি, কিন্তু বোধ হয় ঠিকই,—অর্থাৎ নিজে মা বলে ওর বোধ হয় ভয় ঢুকে গেছে; জিগ্যেস করলে—"কি হয়েছে? এত রোগা যে?"

পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, গলাটা একটু চাপাই, একজন অপরিচিত পুরুষও রয়েছে।

ও-মেয়েটি উত্তর দিলে—"বলে তো পেঁচোয় পেয়েছে দিদি, সেই জন্মে ইস্তকই এই রকম বাড় নেই মেয়ের।"

"চিকিচ্ছে?"

"জলপড়া, ঝাড়ফুঁক, ওঝা, বদ্যি—কত রকম তো করলুম দিদি; ওষুধও

চলছে—ডাক্তারে বলে রিকেট নাকি। কৈ হচ্ছে কিছু? এর ভাব, বরং খারাপের দিকেই যাচ্ছে দিন দিন; কী যে হবে!"

"কলকাতায় নিয়ে যাও না।"

তরুণী একটু ম্লান হাসি হাসলে, বললে—"কলকাতা দিদি···আমাদের পক্ষে!···বাবা বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন—হোমিওপ্যাথির ডাক্তার—গোড়ায় দিন কতক করেছিলেন চিকিচ্ছে, আর একবার দেখবেন চেষ্টা।···"

যেন অসীম আশা আর আশ্বাসের সঙ্গে মেয়েটির কপালে, মুখে, বুকে একবার হাতটা আস্তে আস্তে বুলিয়ে নিলে, বললে—"বলছেন তো সেরে যাবে, ত্মাখো, আশা তো হয় না।"

ছেলেটি এতক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছিল, কতকটা বিফলমনোরথ হয়েই মার কাছে এসে দাঁড়াল।

প্রশ্ন হল—"কত বয়স হল ছেলের?"

উত্তর হল—"ছেলে নয় দিদি, মেয়ে।"

তারপর মুখটা আরও এগিয়ে এনে বললে—"তাই দুদিকেই ভয় দিদি, যায় তো গেলই, আর যদি বাঁচে তো এই রূপ নিয়ে···"

গলা ধরে এল, চোখ ডবডবিয়ে মেয়েটার কপালেই বড় বড় দু-তিনটে ফোঁটা ঝরে পড়ল। দ্বিতীয়া তরুণী এখনও কতকটা আলাদা হয়েই ছিল, শুচিতা বাঁচিয়ে, এবার আঁচল দিয়ে সেটুকু আস্তে আস্তে মুছিয়ে বললে—"চুপ কর, সন্তানের গায়ে এরকম করে চোখের জল পড়তে নেই।···এই ছিরিই কি থাকবে? ভালও হবে, ছিরিও খুলবে আবার মেয়ের।"

শরতের মেঘটা হঠাৎ কেটে গিয়ে খানিকটা আলো ঝলমলিয়ে উঠল; ছেলেটি এতক্ষণ মায়ের হাঁটু জড়িয়ে চুপ করেই দাঁড়িয়ে কতকটা যেন বিমূঢ়-ভাবে দেখছিল, "মা, বউ?" বলে এক পা এগিয়ে গেল।

"এই রে সব্বনাশ!"—বলেই মা হাতটা ধরে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই মুখটা ঘুরিয়ে খিল-খিল করে চাপা গলায় হেসে উঠল।

প্রশ্ন হল—"কি দিদি?"

"ও বউ নয়।"—বলে তরুণীটি ততক্ষণে টেনে নিয়েছে ছেলেটিকে, উত্তর

বললে—"এ এক গেরো ভাই; ঐ যে শুনেছে মেয়ে…ছোট মেয়ে হলেই সে ওর বউ…এমন বউ-পাগলা ছেলে দেখ নি!…ঐ যা, ডাকছে।"

বাপ ডাকছিলই, তার দিকে ঠেলে দিলে।

এক-একটা ছেলে সত্যিই এই রকম জন্ম-নায়ক হয়ে জন্মায়। আমি আর একটিকে দেখেছিলাম মজঃফরপুরে একটা ছোটখাটো বৈঠকী মজলিসে। বয়স প্রায়ই এই রকমই, সে আবার ছিল একনিষ্ঠ; তার আকর্ষণ ছিল এক প্রতিবেশীর একটি কন্যা। ছেলেটি বেশ চুপচাপ করে বসে খেলছিল, মেয়েটিকে নিয়ে ওরা আসতেই সতর্ক হয়ে উঠল; মুখে কিছু বলা নয়, শুধু ধরবে মেয়েটিকে। বড় একটি ঘরের মধ্যে বৈঠক, মেয়েটি ছুটে বেড়াচ্ছে, অনেকটা ভীতভাবেই, এ তাড়া করে বেড়াচ্ছে, মুখে কোন কথা নেই, ভরা মজলিসের এতগুলো লোকের হাসিমন্তব্যে দৃকপাত নেই, আরও সব রঙচঙে পেনিপরা মাথায়-বো-লাগানো মেয়ে আছে, ভ্রূক্ষেপ নেই, ওকে ধরবেই; আর ধরলেই বরের দাবি, একটি চুমো।

অতি নিরীহতার স্তরে অমন একটা অভিনব দৃশ্য আমি আর দেখি নি। এ-বর সে রকম "Aggressive" নয়, তবে নাছোড়বান্দাও কম নয়। বাপ ধরে রাখতে পারছে না—"বউ…আমাল বউ…বউ যাব….পাউডাল, চোনো, গয়না … !"

হার মেনে ছেড়ে দিতে হল বাপকে। পাচজনের সামনে একটা যে অপ্রীতিকর অবস্থা দাঁড়িয়েছে—অনেকটা পুত্রবধূর স্বাস্থ্য আর কদর্যতার জন্যেই—তার অস্বস্তিটা কাটাবার জন্যে দোষটা স্ত্রীর ওপর চাপালে—"যেমন অভ্যেস করানো হয়েছে!"

স্ত্রীও একটু আড়ে চেয়ে নিয়ে চাপা গলায় জবাব দিলে—"নাঃ, আর কেউ তো করায় নি!"

পাঁচজন রয়েছে বলেই দাম্পত্য কলহটা আর এগুতে পেল না; ছেলে ইতিমধ্যে এগিয়ে গেছে।

খুকির মায়ের হাঁটুতে বুকটা চেপে ডিঙি মেরে তার মুখটার দিকে কৌতুক দৃষ্টিতে একটু চেয়ে রইল। আমি চোখদুটির দিকে চেয়ে আছি;

অপূর্ব এক শুভদৃষ্টি!—নীচে নিষ্প্রভ দুটি চোখ, তাতে বিদায়ের ছায়া ঘন হয়ে এসেছে, ওপরের দুটি চোখে অনন্ত বিস্ময় আর অনন্তই যে কি একটা, ঠিক ধরা যায় না। শিশুরও একটা সহজ বোধ আছে, একটা সৌন্দর্যজ্ঞান আছে,—অবস্থাটা যে স্বাভাবিক নয় এটা উপলব্ধি করে যেন হঠাৎ কি রকম হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সৌন্দর্যজ্ঞান থাকলেও, একটু নিরাশ হলেও, দৃষ্টিতে এতটুকু বিতৃষ্ণার রেখা ফুটল না; দাঁড়িয়েই রইল অপ্রতিভভাবে একটু—আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি, দেখিই না, গ্রহণ কি প্রত্যাখ্যান,—এক সময় মেয়ের মার মুখে দৃষ্টি তুলে আস্তে আস্তে বললে—"বউ।"

তরুণী এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরলে, আধ-ঘোমটার মধ্যেই কথা বললে—"এ কী বউ বাবা? তোমার জন্যে রাজকন্যে আসবে ঘর আলো করে—কত বাজনাবাদ্যি, কত...."

গলাটা ধরে গেল, চোখে আঁচল দিতেও হল—নিজের সাধের কথাও যে সমান্তরালে ওদিকে চলতে থাকে মায়ের মনে—মেয়েকেও আমার নিতে আসবে না রাজকুমার?—চারিদিক আলো করে?—কত বাজনাবাদ্যি, কত....

সাহসের মুখেই এই অশ্রুর নদী দেখে ছেলেটি আবার অন্যভাবে অপ্রতিভ হয়ে মায়ের কাছে সরে এল, তারপরেই এই অপ্রতিভ ভাবটা অন্য পথ ধরলে—কতকটা যেন নিজের মান বাঁচাবার জন্যেই—"বউ বউ"—বলেই বার দুই-তিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একেবারে কান্নায় ফেটে পড়ল। তারপরেই শিশুদের যা হয়ে থাকে—মাথা চালা, হাত-পা নাড়া, মাকে মারা, আর কান্নার আওয়াজটা যতটা সম্ভব ওপরে তোলা যায়।...নিজের পরাজয়, নিজের লজ্জা ঢাকছে।

"পাউডাল দাও—টিপ—পিঁতে—চোনো—বউ পলবে..."

বাপমা দুজনেই বিরক্ত হয়ে গেছে, বাপ একটু বেশি, স্ত্রীকে পর্যন্ত দায়ী করে নিয়েছে কিনা; একেবারে বাইরের দিকে ঘুরে বসেছে। বাড়ি হলে এতক্ষণ চড়ে-চাপড়ে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা হত, এখানেও সে চেষ্টার বিলম্ব হবে না আশঙ্কা করে আমি ছেলেটিকে টেনে নিলাম।

পিঠে হাত দিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করতে লাগলাম

"চুপ কর তো, লক্ষী, বাঃ, খোকা আমাদের কি সুন্দর বর সেজেছে।—কেমন ইজের, কামিজ! মাথায় এই টোপর…"

ও-ও বেঁচেছে, একটু আদর হলেই মানটা থেকে যায় তো। কান্না থেমেছে, দুবার ফুঁপিয়ে বললে—"তোপোল না, পিঁতে।"

ভুলটা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিতে হল, যেন একটু ঠাহর করে দেখে নিয়ে বললাম—"ও তাই তো, দেখ আমার কি বোকামি! এটা তো ফিতেই দেখছি, চমৎকার ফিতে, খোকার জন্যে তাহলে টোপোর শীগগির আনাতে হবে যে—বাড়িতে গাড়িটা পৌছুলেই খোকা যে বিয়ে করতে যাবে!—রাঙা টুকটুকে বউ…"

মা একবার আড়চোখে ছেলের দিকে চাইলে, কতকটা ব্যঙ্গ, কতকটা গৌরব, ছেলেও চাইলে একবার ঠোঁটদুটো জড়ো করে। তারপর বোধ হয়, আমার দুরভিসন্ধিটা বুঝতে পেরে ঠোঁটের ওপর ডান হাতের তর্জনীটা বেঁকিয়ে ধরে একটু সন্তর্পণেই বললে—"ঐ বউ।"

ওর মা মুখটা ঘুরিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল, আমিও উঠেছি হেসে, ওর বাপও অল্প একটু হেসে মুখটা একবার ঘুরিয়ে বললে—"ও সাত তঁ্যাদড়ের এক তঁ্যাদড়।"

আবার অপ্রতিভভাবে দুজনের দিকে চাওয়াতে তাড়াতাড়ি বললাম—"হ্যাঁ, ঐ বউই তো। খোকা আমার কথা বুঝতে পারে নি; এ বউ ছাড়া আবার কোন্ বউ! অসুখ করেছে, বউ বাড়ি গিয়ে ভালো হবে, রাঙা টুকটুকে হবে, খোকা গিয়ে বিয়ে করে নিয়ে আসবে…"

"না; এক্কুনি।"

বৃদ্ধ সেই একভাবে গাড়ির বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছে, শুধু মাঝে মাঝে এক একবার দেখে নিচ্ছে মেয়েটিকে—একটা নির্বিকার দৃষ্টি। আর একবার দেখে নিয়ে, মুখটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললে—"কখন যে ছাড়বে গাড়িটা!"

"এক্কুনি" বলেই বর আবার মুখ ভার করেছে। বৃদ্ধের কথাতেই আমি গলা বাড়িয়ে বাইরে দেখে নিয়ে আবার ঠিক হয়ে বসতে বললে—"এক্কুনি বউ যাব, ঐ বউ—পাউডাল—চোনো…"

প্রবঞ্চনা বুঝতে পেরেছে, মুখ বেশ ভার, চোখের পেছনে জল ঠেলেছে, তরুণীকেই লক্ষ্য করে বললাম—"স্নো-পাউডার কিছু থাকে তো দাও একটু বের করে মা; এবার চটলে সামলানো যাবে না।"

তরুণী খুকির মায়ের দিকে চেয়ে বললে—"রোগা মেয়ের গায়ে যে ওসব দিতে নেই।"

তাও তো বটে। নতুন কি বলে সাত তাঁদড়ের এক তাঁদড়কে সামলাব ভাবছি, খুকির মা-ই জবাব দিলে। অদ্ভুত দৃষ্টিতে একদিকে একটু চেয়ে নিয়ে ম্লান হেসে বললে—"দিন, বায়না ধরছে ··অঁ্যা বাবা, দোষ আছে—তেমন?"

বৃদ্ধ আরও নির্বিকার দৃষ্টিতে চাইলে এবার মেয়েটির দিকে, কতকটা যেন অন্যমনস্কভাবেই টেনে টেনে বললে—"দো-ষ আর কি?···কখন যে গাড়িটা ছাড়বে!"

এর পরেই কোথা দিয়ে কি যে হল, সবার মনেই একটা অদ্ভুত প্রসন্নতা এসে গেল। অদ্ভুত বললাম ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না বলে, বোধ হয় বিষণ্ণ প্রসন্নতা বললে ঠিক হয়, একটা 'আহা'-র ভাবের সঙ্গে, এই ছুতোয় মেয়েটিকে যে একটু সাজাতে পারা যাচ্ছে তার জন্যে একটা তৃপ্তি। ছেলের মা উঠে ট্রাঙ্ক থেকে সব বের করে আনলে—পাউডার, স্নো, কাজল-লতা, আলতা, খানিকটা ফিতে, একটা এসেন্সের শিশি পর্যন্ত; দু-একটা কথাবার্তা হওয়ায় আমার কাছে সঙ্কোচটা একটু কেটে গেছে, ওদিকে তো বৃদ্ধই, সব সরঞ্জামগুলি সামনে জড়ো করে যেটুকু সঙ্কোচ বাকি আছে, তার মধ্যেই একটু মেয়ের মাকে উদ্দেশ করে চটুল হেসে বললে—"দাঁড়াও, এবার সাজাই আমার বউকে!"

তরুণীই তো; প্রথম সন্তানের মা, এই সেদিন পর্যন্ত খেলাঘরে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়েছে; তারই একটি দিন যেন কোন্ পথে হঠাৎ পড়েছে এসে।··· চমৎকার লাগছে!

খুকির মা বিষণ্ণভাবে হেসে বললে—"কিন্তু কি জাত, কোথায় বাড়ি, কেমন ঘর তা তো জিগ্যেস করলে না দিদি!"

"ওমা, তাই তো! ছেলের মতন আমিও বউ দেখে ভুলে গেছি ভাই···"

প্রসন্ন মনে বললেও খচ করে কথাটা যেন সবার কানে একটু বাজল, এক মুহূর্তের একটা ছায়া গেল যেন বিছিয়ে সবার মুখে, তখুনি কিন্তু সামলে নিলে তরুণী—"হ্যাঁ, তাও বলি—আজকাল নাকি আবার ওসব বিচার আছে? ছেলের বউ পছন্দ, ব্যস, বেয়ান আমার ধাঙড়নি হলেও আপত্তি নেই।"

—নতুন বেহানকে টাটকা-টাটকি ঠাট্টা করে আবার মুখটা ঘুরিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল; বললে—"রোসো, সাজাই এবার।"

স্নোর কৌটোটা খুলে আঙুলে একটু মাখিয়ে কিন্তু থেমে গেল, আবার একটু বিষণ্ণতা, একটু ভয়; বললে—"না ভাই, তুমিই মাখাও, সাজাও; বড্ড আলগা হাতে করতে হবে, আমি ঠিক বুঝতে পারব না বোধ হয়।"

চেয়ে আছি, মা মেয়েকে বিয়ের কনে সাজাচ্ছে—বেদনা ঠেলে একটা অপরূপ আনন্দ, আনন্দ ঠেলে একটা অপরূপ বেদনা, তেমন দৃশ্য আমি আর কোথাও দেখিনি। যা কখনও হবার আশা নেই, তাকেই যেন সার্থক করে নেওয়া আজ; স্নো, গালে ঠোঁটে একটু রঙ, সমস্তর ওপর হালকা পাউডার, চোখে কাজল,—এক একটা লাগাচ্ছে আর একটু থেমে গিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে—কী যে তৃপ্তি, কী যে অতৃপ্তি, সে এক মায়ের দৃষ্টিতেই দিয়েছেন ভগবান।

আমায়ও আজ কী যে দেখালেন!...তাঁকে অসংখ্য প্রণাম।

বরও বসে নেই, অল্প দুলে দুলে দেখছিল, কতকটা যেন অনুমোদনের ভঙ্গীতে; শাশুড়ি প্রশ্ন করলে—"কি বাবা, হল পছন্দ?"

মা একটু মুখ ঘুরিয়ে ছেলের হয়ে হেসে বললে—"ওমা! সে আমার ছেলে আগে চুকিয়ে রেখেছে, পছন্দ বলেই তো এত হাঙ্গামা গো!"

ছেলে কিন্তু কথাটা দাঁড়াতে দিলে না, একটু ডিঙি মেরে দেখে নিয়ে নিজের কপালে তর্জনীর ডগাটা টিপে বললে—"তিপ?"

দুজনেই হেসে উঠল, আমাকেও যোগ দিতে হল, ওর বাবাকেও; শাশুড়ি টিপ্পনি করলে—"ছাখো! মা হয়ে ছেলে চেন না দিদি, আমি শাশুড়ি হতে না হতেই কিন্তু জামাইকে চিনেছি..."

হাসির মধ্যেই উত্তর হল—"আজকালকার ছেলে যে ভাই, মায়ের চেয়ে শাশুড়িই আপনার।"

ছলছল হাসির মধ্যে বৃদ্ধ একবার সেই নির্বিকার দৃষ্টিতে ফিরে চাইল; তার যেন একটিমাত্র চিন্তা—গাড়ি ছাড়ে না কেন!

ফরমাসী বলে মা টিপটি বসাতে মনের সমস্ত দরদ যেন ঢেলে দিলে; হেঁট হয়ে মাথায় কাঁটার মুখে কাজল নিয়ে খুব যত্ন করে ভুরুদুটির মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসল, জিগ্যেস করলে—"এবার···হয়েছে তো?"

"পিঁতে।"

এবার একটু হেসে উঠল। মা কতকটা পুত্রগর্বে টিপ্পনি করলে—"নাও! ছেলেকে আমার ফাঁকি দেবে!"

আনন্দ যে মনে ঠেলাঠেলি করে বেরুবার চেষ্টা করছে, তাতেই ক্রমাগত ভুল, তরুণী সুধরে নেবার পথ খুঁজতেই যেন ঘাড় ফিরিয়ে একবার আকাশের দিকে চেয়ে বললে—"লগ্ন যে বয়ে যাচ্ছে ওদিকে—কোন্ দিকে সামলাই?"

এত সত্যি কথা বোধ হয় কোন মার মুখ দিয়ে কোন দিন বেরোয় নি।

লগ্নই বটে—লগ্নের রাজা, গোধূলি লগ্ন। আকাশ রাঙিয়ে সূর্যের প্রায় সমস্তটাই গেছে অস্ত, নেমে এসে পৃথিবীর অধরে প্রথম বাসর-চুম্বনটি দিয়ে সে যেন রাঙা কিরণে কণ্টকিত হয়ে উঠেছে—কুলায়-ফেরা পাখির ডাক—কাছে কোথায় একটি বধূ সন্ধ্যার শাঁক বাজিয়ে দিলে, খানিকটা আগেই, বোধ হয় নিবিড় গাছপালায় ঢাকা গৃহ-প্রাঙ্গণে সময়ের অত আন্দাজ না করতে পেরেই।···একটা ভুল করিয়েই সেই অলক্ষ্য-শিল্পী যেন লগ্নের রূপটা আরও দিলে ফুটিয়ে।

তারপর···কিন্তু সেটা আমার ভুলও হতে পারে, কেননা জানলা বেয়ে তখন একটা রাঙা রশ্মি ভেতরে এসে পড়েছে···একটা রূপান্তর—ছেলেটির অমৃত দৃষ্টির নীচে—কোথা থেকে এল মেয়েটি!···এই ছিল নাকি এতক্ষণ?—চীনে সিল্কের মতন পাতলা চামড়া ভেদ করে তার অণুতে অণুতে ঐ রাঙা রশ্মির পথ ধরে যেন অন্য কোন্ লোকের আলো প্রবেশ করে সমস্ত মুখটা দিয়েছে ঝলমলিয়ে, আর···এও হয়তো আমার ভুলই—ছেলেটি যে মুগ্ধ নতদৃষ্টিতে রয়েছে দাঁড়িয়ে, তারই মুখে চোখ তুলে একটি অপরূপ হাসি—অতি ক্ষীণ তবু অতি অপরূপ।···ভুলই বা কেন হবে? সুন্দর খেলার জুটিও তো একজন····

সবাই দেখছে, বাপ মুখ ফিরিয়ে অল্প অল্প হাসছে, নতদৃষ্টি তুটি তরুণীর অধরের ম্লান মুগ্ধ হাসি, আলোর আভা পড়েছে সমস্ত গাড়িটার ভেতর; একখানি অপার্থিব ছবি; সেই কোন্ অদৃশ্য শিল্পী আঁকছেই তো···

বৃদ্ধ বাইরের দিকেই চেয়েছিল, মুখ ফেরাতে তার মুখেও এবার হাসি ফুটল।

"বাঃ! নাতনী যে দেখছি একেবারে পরীটি···"—এইটুকু বলেই কিন্তু সে থেমে গেল। আমার দৃষ্টি তার মুখে গিয়ে পড়েছে, দেখি ভুরু একটু কোঁচকানো, দৃষ্টি স্থির, তীক্ষ্ণ, যেন ডাক্তার উঠেছে জেগে। ভেতরকার ভয়টা চাপা দেবার চেষ্টা করেই বললে—"বিমু, মুখে একবার মাইটা দে তো মা, শীগ্‌গির····"

আঁচলের আড়াল করে নিয়ে তরুণী স্তন্য দিতে লাগল—দেবার চেষ্টাই বলা ঠিক····অশোভন হলেও তীক্ষ্ণ উদ্বেগে চেয়ে আছি—শোভন অশোভনতার বাইরে একটা অবস্থা তো···চেষ্টা করছে মা—স্তনটিও যেন জীয়ন্ত হয়ে উঠেছে —কি করে বুকের একটু অমৃতবিন্দু ঢেলে দিতে পারে অধরের ফাঁকে···

একটু পরে মুখটা ঘুরিয়ে ক্ষীণ শুষ্ক কণ্ঠে বললে—"মাই·তো ধরছে না বাবা····কেন বাবা! কেন!···"

—সে যা দৃষ্টি, সেও এক শুধু মায়ের চোখেই ফোটে। বৃদ্ধ মুখটা ফিরিয়ে নিলে।

এরপর যতটুকু ছিল একবার কাঁদলে না মেয়েটি। ভয়, লজ্জা—এ মেয়ে কোলে করে কি করে নামবে? একটুও কাঁদলে না, শুধু গলা শুকিয়ে যাবার জন্যে মাঝে মাঝে ঢোঁক গিলতে লাগল।····তু-একবার আবার চেষ্টা করলে মাই খাওয়াবার, তারপর বাবার ঘোরানো মুখের দিকে ঘুরে ঘুরে চাইতে লাগল—কেউ বলুক না কি হয়েছে মেয়ের ওর? মাই ধরে না কেন আর!···

ওরা এইখানেই নেমে ফিরে গেল।

আমি ভাবছি, সেই অদৃশ্য শিল্পী অমন নিখুঁত ছবিটার ওপর হঠাৎ ওরকম করে ঢ্যারা কেটে দিলে কেন?

আর এই যোগাযোগ, এই co-incidence—ওরা আসবে, এরা আসবে

কিছু একটা হবে যার জন্যে গাড়ি থাকবে থেমে—আমিও জুটব, যাতে তোমাকেও করে নিতে পারি ভাগী আমার চিঠির পাতার মধ্যে দিয়ে··· আরও আশ্চর্য, এই অভিনয়টুকু সেরে যে যার যায়গায় যাবে ফিরে,—বৃদ্ধ আর ঐ যুবা কার ফরমাসে সদলবলে যেন এইটুকু করতেই এসেছিল।

মনটা তোমার খারাপ করে দিলাম? না; আজকের দিনে আমার এ-রকম কোন দুরভিসন্ধি নেই। তাহলে তোমায় অন্য গোটা দুই অভিজ্ঞতার কথা বলি; co-incidence বা যোগাযোগের কথায় মনে পড়ে গেল। ঠিক এ ধরনের জিনিস না হলেও বেশ কৌতুকজনক (অবশ্য আমি ব্যাপারটুকুর কৌতুকের দিকটা ধরেই বলছি—pure co-incidence-এর দিকটা)। তাতে ছিল অন্য ধরনের অনুভূতি—খানিকটা আত্মপ্রসাদের। ভাবটা গোটা তিন ইংরাজী কথাতে বোধ হয় আরো ভালো করে ধরা পড়ে—ঠিক যাকে বলে, Flattering to one's vanity.

করুণ নয় বলেই তোমায় বলছিও; নয়তো আত্মপ্রসাদের কাহিনী আত্মগতই রাখা নিয়ম আমার; তুমি শুধু এই ধরনের যোগাযোগগুলো কিরকম অদ্ভুতভাবে ঘটে লক্ষ্য করে যেও।

সেবারেও বেরিয়েছি বেড়াতে। দক্ষিণ দিকটার সঙ্গে তখন আমার নতুন পরিচয় হয়েছে আরম্ভ, কোথায় যাব কোথায় যাব করতে করতে বজবজের একটা গাড়িতে গিয়ে বসেছি থার্ড ক্লাসেই। যোগাযোগের সূত্রটা এইখান থেকেই হল আরম্ভ, কেন না যতদূর মনে পড়ছে, টিকিট ছিল আমার ইণ্টার ক্লাসের। কিছু একটা খেয়াল হয়ে থাকবে, কিংবা থার্ডক্লাসের গাড়িটাই সামনে পেয়ে গিয়ে থাকব, উঠে পড়েছিলাম। জায়গাটা পাওয়া গেল ভেতরের দিকে, বেঞ্চের মাঝখানে।

ঠিক ভিড় না হোক, ভর্তি ছিল গাড়িটা, কিন্তু গোটা দুই-তিন স্টেশন পরে একরকম খালিই হয়ে গেল। বেঞ্চের মাঝখানে আমার পোষাল না; দেখতে হবে লাইনের পর থেকে একেবারে দূরের আকাশ-রেখা পর্যন্ত, মাঝখানে বসে থাকলে তা হয় না। আমার কামরাটিতে ধারের চারটি

কোণই কিন্তু চারজনের দখলে। সামনের কামরাটিতেও তাই; চুপ করে থাকতেই হল।

পরের স্টেশনে সামনের কামরার ডান দিকের একটা কোণ খালি হল, লোকও আর উঠল না, আমি প্লাটফর্মে নেমে গিয়ে ও-দরজা দিয়ে উঠে সেখানটায় বসলাম।

গাড়ি যখন ছেড়ে দিলে, বেশ খানিকটা অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। আমার সামনের লোকটি বাইরের দিকে ঘুরে বসেছিল, রোগা গোছেরই কিন্তু ফিরে চাইতে তার চেহারা দেখে মনে হল যেন, খুব খারাপ কোনও অসুখে ভুগছে বেশই অস্বস্তিতে পড়লাম এবং এই ধাক্কাতে আমায় একটা কামরা এগিয়ে যেতে হল। সেখানেও ধারের দিকে মাত্র একটি জায়গা খালি আছে, এটা যেমন ছিল ডাইনে, ওটা একেবারে বাঁদিক ঘেঁষে। অবশ্য তখন আর জায়গা বাছাই করবার উৎসাহ নেই—একটা বয়স্থ লোক ক্রমাগত বেঞ্চ টপকে চলেছি এগিয়ে, একটু লজ্জিতও হয়ে পড়েছি, কিন্তু যখন পাওয়া গেল খালি, তখন সেইখানটিতেই গিয়ে বসলাম।

এখানে আমার সামনেই একটি ভদ্রলোক, বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ মনে হয়, খুব নিবিষ্ট মনে একখানি বই পড়ছেন আর ফিকফিক করে নিজের মনেই হাসছেন।

কৌতূহল হতে একটু গলা তুলে দেখি, আমার "বরযাত্রী" বইটা; বিয়ের আসরে গণশা যেখানে ত্রিলোচনকে বাসরের জন্যে গানের অন্তরাটা মক্স করাচ্ছে—"চিত মোর ব্যা-ব্যা-ব্যাকুল হোয়।"

আত্মপ্রসাদের কথা বাদ দিলেও একটা অদ্ভুত রকমের সুড়সুড়ি দেয় না মনে? ঠিক এই মুহূর্তটিতে এই যোগাযোগটুকু ঘটবে তাই আমি তিন শ মাইল থেকে এইমুখো হয়েছি এক সময়, নিতান্ত অহেতুকভাবেই বিকেলবেলা একটু বাইরে থেকে বেরিয়ে আসবার ইচ্ছে হল, ইণ্টার ক্লাসের টিকিট নিয়ে থার্ড ক্লাসে উঠে পড়লাম তাও এই যোগাযোগটুকু হবে বলে, যেটুকু বাকি ছিল সেটুকু পূর্ণ করতে হল ঐ বেঞ্চ টপকে টপকে।—কে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঐ পরিণতিটুকুর দিকে। ব্যাপারটা কিছু নয় অবশ্য একদিক দিয়ে

আবার অন্তদিক দিয়ে বেশ খানিকটা তো……মানুষের একেবারে কৈবল্য প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত Vanity যখন থাকবেই তখন অস্বীকার করি কেন যে ঘটনাটুকু সত্যি ছিল Flattering to my vanity. সভা করে মানপত্র দেওয়ার চেয়ে, নিতান্তই নিঃসন্দিগ্ধ এক পাঠকের ঠোঁটের ঐ অল্প একটু একটু হাসির যে কী মূল্য তা এক যে লিখেছে সেই তো বুঝবে।

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা হয় আর একখানি বই নিয়ে, সেও নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে নিতান্ত অপরিচিত জায়গায় লেখক-পাঠকে একেবারে সামনাসামনি। কিন্তু শুধু সামনাসামনি হওয়াটাই বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে যে-ভাবে সামনাসামনি হওয়া গেল। আরও একবার এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার; প্রত্যেকবারেই দেখেছি, কে যেন অলক্ষ্যে থেকে আমায় ঐ যোগাযোগটুকুর দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটা হয় বর্ধমানের কাছে। বর্ধমান থেকে মাইল আষ্টেক উত্তরে সাঁকো বলে একটা জায়গা আছে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর। আমার বন্ধু তুলসীবাবু তখন হেডমাস্টার ওখানকার স্কুলে, আমি হয়েছি তাঁর অতিথি। আরও কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে বাসে করে আমরা উত্তরে গলসীতে রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট (River Research Institute) দেখতে যাব। কিসের জন্যে খুব ভিড় যাচ্ছে, কয়েকটা বাস ছেড়ে দিতে হল বলে মনটা খিঁচড়ে আসছে। কুঁচকি-কণ্ঠা ঠেসে চলেছে, তাদেরও গরজ নেই। শেষে একটার একটু দয়া হল, কিন্তু সবাই ওঠা পর্যন্ত টিঁকল না দয়াটুকু, দিলে ছেড়ে। কাজেই দু-দশ গজ যেতে না যেতে, যাঁরা উঠেছিলেন তাঁদের টুপটুপ করে নেমে পড়তে হল। এটাতে আর জন দুয়ের সঙ্গে আমারও ওঠা হয়নি, সুতরাং আবার গোটা দুই বাদ দিয়ে যখন একটা পাওয়া গেল, বোধহয় স্মার্ট না হওয়ার বদনামটা ঘোচাবার জন্যে আমিই চাপ ভিড় ঠেলে আগে পড়লাম উঠে। তারপর বেশ খানিকটা এগিয়ে চেঁচামেচি শুনে ভিড়ের মধ্যে থেকে মাথাটা গলিয়ে যখন দেখবার অবসর হল, দেখি আমি ছাড়া আর কেউই স্মার্ট হতে পারে নি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফিরে যাবার জন্যে প্রবলবেগে হাত নাড়ছে। মনের অবস্থাটা বুঝতে পার। খানিকটা 'হ্যাঁ-না' করে শেষ পর্যন্ত যাওয়া বন্ধ করে

দেওয়াই ঠিক হল সেদিন। তারপর বাসায় ফিরে যাব এমন সময় আর একটি বাস এসে উপস্থিত হল। দিব্যি খালি, গিয়ে সবাই উঠে বসলাম দিব্যি গোছগাছ করে। এইখানেই আমার পাঠক আমার জন্যে ছিলেন অপেক্ষায়; হাতে···থাক, বইয়ের বিজ্ঞাপনের মতো শোনাল আবার।

কিন্তু দোহাই, সে-রকম কোন দুষ্ট উদ্দেশ্য নেই আমার। আমি এজন্যেই প্রসঙ্গটার অবতারণা করেছি যে সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে একটা প্রশ্নের আকারে দেখা দেয়। ঠিক যেন মনে হয় না কি যে নেপথ্যে কেউ রয়েছে, যে কলকাঠি নেড়ে এইসব ধরনের ব্যাপারগুনো ঘটিয়ে যাচ্ছে? আমার তো মনে হয়। আমার তো হয়ই মনে যে এগুনো যেন জীবনের গবাক্ষপথ, যার মধ্যে দিয়ে আমরা চকিতে সেই নেপথ্যবাসীর আঙুলের ডগাগুলি এক একবার ফেলি দেখে। আমার বেলায় সে আবার যেন একটু রহস্যপ্রবণ হয়ে ওঠে, কেননা তিনবারেই দেখেছি, বাধা দিয়ে দিয়ে মনের অবস্থা যখন বেশ সঙ্গীন করে এনেছে তখনই দিয়েছে এই পুরস্কারটুকু হাতে তুলে। যাই বল না কেন, তোমাদের জ্ঞাত বিজ্ঞানের জোরে, সত্যিই বড় আশ্চর্য। এগুনোর সম্বন্ধে মীমাংসাটা এই নয় যে কেন হবে না? বরং এগুনোর সম্বন্ধে প্রশ্নটা এই যে, কেন হবে? আর, সে-প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে ওঠেনি এখনও।

হচ্ছে না convinced বোধ হয়। হয়তো বলবে কি আর এমন মহামারী ব্যাপার—নিতান্তই চান্স, সেই চান্সেরই একটা দিক যার সম্বন্ধে Aldous Huxley নাকি বলছেন, গোটা ছয় বানরের হাতে কলম দিয়ে যদি হিজি-বিজি কাটতে দেওয়া হয় তো তারা সুদূর ভবিষ্যতে কোন সময় শেকস্‌পীয়ারের সনেট লিখে ফেলবে গোটাকয়েক।

যদি এইজাতীয়ই মত হয় তোমার তো এ গরীবের মতটাও বলি—অন্ধ চান্সকে এত বড় প্রতিষ্ঠা দেওয়া সত্যিই মর্কটকে শেকস্‌পীয়ারের আসনে বসানো।

তোমায় তাহলে আর একটা উদাহরণ দিই—আমার এক বন্ধুর নিজের অভিজ্ঞতার কথা, তাঁর নিজের মুখেই শোনা—

একদিন রাত্রের কথা, তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

তিনি এসেছিলেন একটু রাত করেই, তার ওপর আমার বন্ধুটি আবার একটু বেশি মজলিসী, সঙ্গী পেলে শীঘ্র ছাড়েন না; গল্পগুজবে রাত এগিয়েই চলল। যখন এগারোটা হয়ে গেল তখন উঠতে হল এবং বিদায় দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেবার জন্য বন্ধুও নেমে এলেন; ওঁরা দোতলায় বসে গল্পগুজব করছিলেন। গোল্পে লোক, সদর দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে খানিকটা গল্প হল, তারপর নেমেও পড়লেন গলিতে। কলকাতার একটা গলি, খানিকটা গিয়েই সদর রাস্তা; অন্যমনস্ক হয়ে গল্পের জের টানতে টানতে সেখান পর্যন্ত এসে পড়েছেন। এখানেও খানিকটা গল্প হল, এবং তারপর আবার যে কখন দুজনে গল্পে মশগুল হয়ে চলতে আরম্ভ করেছেন হুঁশ নেই। হুঁশ যখন হল তখন টের পেলেন বাড়ি ছেড়ে অনেকটা এসে পড়েছেন, এবং তার চেয়েও যা বড় কথা, অন্যমনস্ক হয়ে এমন পথ ধরে এসেছেন যেটা ঠিক ওঁর বন্ধুর বাড়িতে যাবার পথ নয়; যাওয়া যায়, তবে বেশ খানিকটা ঘুর পড়ে। দুজনে একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে হাসলেন, মাঝ-কলকাতায় নিশিতে পেলে নাকি! ওদিকে সদর দরজার শিকলটাও তুলে দিয়ে আসা হয়নি।

ফিরবেন, পকেটের মধ্যে হাতটা পড়তে হাতে একটা চিঠি ঠেকল, মনে পড়ল—ঠিক তো, সমস্ত দিনে ওটা পোস্ট করা হয়নি। কাছে একটা লেটার-বক্স আছে, ঠিক যে-গলিটা ধরে যাচ্ছেন তার ওপর নয়, আর একটা গলি বেরিয়ে গেছে, তার ভেতর দিকে খানিকটা যেতে হবে। ওঁর বন্ধুকে বললেন, যাবার মুখে ওটা বাক্সয় ফেলে দিয়ে যেতে। তারপর খেয়াল হল বন্ধুর বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছেন, ওঁকে পৌছে দিয়ে সোজা রাস্তাটা দিয়েই যাবেন। চিঠিটা বন্ধুরই হাতে, তিনিই আসবেন ফেলে, কিন্তু খানিকটা এগিয়ে চিঠির বাক্সের গলিটা যখন এসে পড়ল, বললেন—"দাও, আমিই চট করে ফেলে আসছি।"

গিয়ে গর্তের মধ্যে হাতটা দিতে যাবেন, দেখেন ঠিক ওপরটিতে একটা সাদা কাগজ আঁটা, আর তাতে কি লেখা রয়েছে; কৌতূহল হতে ঝুঁকে দেখে তাঁর ভ্রূদুটি কুঁচকে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আমার বন্ধুর নাম করে বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে—অমুকের শীঘ্রই একটা ভীষণ বিপদ আসছে।

শক্‌টা সামলাতে একটু সময় লাগল ; বুঝতেই পারছ তারপর বন্ধুর ডাকে হুঁশ হতে তাকেও ডেকে দেখালেন লেখাটা।

এখানে আর একটি কথা বলে দেওয়া দরকার। আমার বন্ধুর যা নাম, সেটা একজন মহাপুরুষের নাম কিন্তু খুব কম শোনা যায় বাঙালীর মধ্যে—যতীন, বিমল-এর মতো তো নয়ই, এমনকি শেখর, সুবিমল-এর চেয়েও দুষ্প্রাপ্য ; আমি সে-নামের মাত্র জন দুইকে জানি। যে পাড়ায় গিয়ে পড়েছেন, সে-পাড়ায় তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিতও।

তবু আমি একথা বলতে চাইছি না যে, ব্যাপারটা ভৌতিক কিছু একটা, বরং কেউ যদি বলে তো সাধ্যমতো তার সঙ্গে ঝগড়া করব। ভূতে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু তাই বলে যে ইস্কুল-কলেজেরও ভূত আছে আর মানুষের ভূতেদের তাইতে লেখাপড়া করুতে যেতে হয়—এতটা বিশ্বাস করা কঠিন। আমার মনে হয় (আর আশাও), ভূত হওয়ার সঙ্গে লেখাপড়ার হাঙ্গামটা আরও বেশি করে ভূত হয়ে যায়, নয়তো লাভ কি হল অত কষ্ট করে ভূত হয়ে বল না?···না, ভৌতিক নয়, সম্ভাবনা এই যে ছেলেদের ঝগড়ার ব্যাপার, ঐ নামে পাড়ায় কেউ আছে, তার প্রতিই শত্রুপক্ষের একটা সতর্ক বাণী, এ আকারে কেন সেটা বলা শক্ত। কিন্তু গোড়ার কথা এইটুকুমাত্র হলেও যোগাযোগটা অদ্ভুত নয়?—এটা হয় কি করে সেইটেই আমার মাথায় আসে না, অথচ তোমাদের ঐ যে হ্বালা-ফেলার জবাবদিহি—অন্ধ চান্স, সেটাকেও মেনে নিতে চায় না মন। ঘটনার ধারাটি এমন একটি সুপরিচালিত প্ল্যানের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে যাতে ওদের আক্রোশবশে (বা যে কারণেই হোক) লেখাটুকুর সঙ্গে তন্নামধেয় নিতান্তই অসংশ্লিষ্ট অন্য এক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার ঘটবে, যাতে সে নিতান্তই অন্য এক ধরনের অলক্ষ্য এক বিপদের জন্য সাবধান থাকে। হ্যাঁ, সে-কথাটা এখনও বলা হয় নি, আর সেইটেই সমস্ত প্ল্যানটির মধ্যে একটি উদ্দেশ্য নিহিত করে তাকে সার্থক করে তুলেছে, সেই সঙ্গে সমস্ত ঘটনাটুকুকেও করে তুলেছে আরও বিস্ময়কর।

দিন দুই পরের কথা, আমার বন্ধু সারকুলার রোডে দাঁড়িয়েছিলেন, কোন কারণে একটা বাস নিজের পথ থেকে হঠাৎ একটু যেন বেরিয়ে এসেই তার গা ঘেঁষে তীব্রবেগে বেরিয়ে গেল। কিছু হল না অবশ্য—রগের কাছটায় বাসের সামান্য একটু স্পর্শ, কিন্তু ঐ সামান্য থেকে সুনিশ্চিত মৃত্যুর প্রভেদ ছিল মাত্র এক চুল।

এ অংশটুকুর একটা সঙ্গত জবাবদিহি অবশ্য আছে, আমার বন্ধু ঐ অদ্ভুত যোগাযোগের পর থেকে বেশ একটু মনমরা আর অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন মাঝে মাঝে—রাস্তা পেরুবার মুখে তার জন্যেই বোধ হয় অসাবধানতা, যেটাকে বাসের ছিটকে আসা বলে ভ্রম হয়েছে; কিন্তু আরও একটা সম্ভাবনার কথা এসে যায় না কি, যে-কারণে বোধ হয় উনি রক্ষা পেলেন সে-যাত্রা? অর্থাৎ ঐ সতর্কলিপিতে অতিরিক্ত সাবধানও তো করে দিয়ে থাকতে পারে যার জন্যে উনি আর রাস্তাটা পেরুতে···

থাক এই পর্যন্তই, অদ্ভুত শুভদৃষ্টির যোগাযোগ থেকে রংবেরঙের অদ্ভুত যোগাযোগের কথা এসে পড়ল; এ সব ব্যাপারের কিন্তু মীমাংসা শক্ত।··· কোনখানটায় ছিল আমাদের গাড়ি?

হ্যাঁ, হল্ট নম্বর চার; শুভদৃষ্টির পর মেয়ে নিয়ে ওরা আবার নেমে বাড়ি ফিরে গেল। মায়ের চোখে একেবারে জল নেই, তবু একটু একটু যেন কাঁপছে, মেয়েটিকে আরও চেপে ধরেছে বুকে। চকিতে ডাইনে-বাঁয়ে এক একবার চাইছে—শোকের চেয়ে যেন মস্ত বড় এক লজ্জায় গেছে পড়ে।

আমাদের গাড়ি যেন এইটুকুর জন্যে অপেক্ষা করছিল, ছেড়ে দিলে। একটু এগিয়ে এসে বাঁদিকে একটা মেটে রাস্তা, পালকিটা এসেছে ঐ রাস্তা বেয়ে, হয়তো মেয়ে নিয়ে এরাও। রাস্তার ধারে একটা স্টেশন নেই, একটা হল্ট দিয়েই সেরেছে কোম্পানি, তবু ইস্কুল, রথতলা—রথটা গোল-পাতার ছাউনিতে ঢাকা।

জায়গাটার দর আছে বলে মনে হল।

ব্যাপারটুকুকে হল্টেই রেখে এসেছিলাম, রাস্তাটুকু দেখে আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি,—পথ জিনিসটা জীবনের বাহন, কোথা থেকে নিয়ে আসে, কোথায়

যায় নিয়ে, কিছুই যেন হিসাব পাওয়া যায় না…কত ভেবেচিন্তে করি তার রচনা, তারপর অভাবনীয়, অচিন্ত্যনীয় কত কী যে তাই বেয়ে হয় উপস্থিত.

না, ঝেড়ে ফেল মন থেকে, মনে জমিয়ে রেখ না, দুঃখ নয়, এমনকি সুখও নয়, শুধু বোঝা উঠবে বেড়ে; চলার পথে নিত্য-নতুনকে স্পর্শ করে চল, নিজেও নিত্য-নতুন হয়ে।

দু দিকের অপসৃয়মান মুক্ত প্রান্তরে কোথায় যেন এই সত্যটাই উঠেছে ফুটে; চোখ বুলিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় আমার পেছনে শেষের বেঞ্চটায় হঠাৎ ঝনঝন করে মন্দিরার শব্দ, আর সঙ্গে সঙ্গেই গান—

সুধামাখা হরিনাম,

গৌর এ নাম কোথায় পেয়েছে রে….

ফিরে দেখি একটি রোগা গোছের ফরসা মাঝবয়সী লোক—গাড়ি ছাড়বার মুখে কখন্ উঠে পড়েছিল—ভিক্ষে করবে, গানটা ধরেছে। প্রথম কলিটা কানে যাওয়ার সঙ্গে সর্বাঙ্গে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। এইখানে একটা সতর্কবাণী দরকার,—আমায় যেন মস্ত বড় ভক্ত ঠাউরে বোসো না। প্রথম কথা হচ্ছে, গানটা উঠল একেবারে আচমকা, তায় আবার পেছন দিক থেকে, তার ওপর মেয়েটির মৃত্যুবাসর থেকে নিয়ে ম্লান আকাশের তলায় অস্তরাগের বিচিত্র মায়ার মধ্যে কী একটা অপরূপ মিল আছে, শুধু কাঁটা দিয়ে ওঠা নয়, যে অশ্রুটাকে আমি এতক্ষণ ঠেকিয়ে রেখেছিলাম, তাকে আটকানোও হয়ে উঠল দুষ্কর, বেশ ভালো করে মুখটা ঘুরিয়ে আমায় গলাটা একটু বাড়িয়েই রাখতে হল বাইরের দিকে।

আর সুরটা গানের। এত খাঁটি বাঙলা সুর যেন কীর্তনেরও নয়। 'হরিনাম' এর পর একটি বিরতি, একটু টান দিয়ে; 'গৌর' বলে তার এক-চতুর্থাংশ—ঐ বিরতি আর টান, তারপরই সুরটা বাকি তিনটি কথার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে রে'র ওপর যেন থমকে দাঁড়াল; সে যে কী মিষ্টি, কত গভীরে গিয়ে স্পর্শ করে, বলে বোঝান যায় না, বোঝাতে গেলে যা যা ঘটল, সবসুদ্ধ সেই সময়টুকুকে আবার অনন্ত অতীতের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হয়। গান যে রেডিওর দাসত্ব করার জন্য নয়, তা মর্মে মর্মে বুঝলাম।

সে হুকুমের দাস হয়ে আকাশপথে তোমার জন্যে ছুটে আসবার জিনিস নয়, তার নিজের সময়ে নিজের পরিবেশে সে কোথায় আপনা হতেই বিকশিত হয়ে উঠল—তোমাকেই সেটা বের করতে হবে খুঁজে। অন্তত তাই মনে হল আমার তখন—গানটার মধ্যে যে প্রশ্ন, বিস্ময়, খোঁজার বেদনা, পাওয়ার উল্লাস ; গানের ভাষার যা দরদ, সুরের যা কারুণ্য, তার মধ্যে দিয়ে সেই বাঙলা যেন চরমভাবেই রূপ পরিগ্রহ করে দাঁড়িয়েছে, যাকে আজ এই তাপদগ্ধ দিনের মধ্যে দিয়ে এসেছি খুঁজে। এই গান ঠিক এই দেশেই গীত হবে, এই দেশ ঠিক এই গানেই ধরবে মূর্তি। দিনের শেষে, যাত্রার শেষে আমার পাওয়া হয়ে গেল ; অসীম কৃতজ্ঞতায় আমার মতন পাষাণের মনটাও গলে গলে কার চরণে চাইছে লুটিয়ে পড়তে।

কিন্তু আবার আমার সেই দুষ্ট-গ্রহ,—একটা স্বপ্নে যে একটু ডুবে থাকব, তা হতে দেবে না। সেই মিলিটারী কণ্ট্রাক্টরের কথা মনে আছে?—এবার অবশ্য সে নয়, তবে এ যেন আরও অদ্ভুত, আর উদ্ভাবনী শক্তির দিক দিয়ে একেবারে চরম বিস্ময়কর। কল্পনা করতে পার—একটা লোক আস্ত একটা কলম?—একটা কেন বলি, দুটো অর্থাৎ যুগ্ম কলম—একটা কালো কালির একটা লাল কালির।

ধাঁধাঁয় পড়েছ নিশ্চয়, ব্যাপারটা খুলে বলি—

গানটাতে তন্ময় হয়ে গেছি, পাশের লোকটা "উঃ!" করে শিউরে উঠল। ঘুরে দেখি পিঠের দিকে কোমরের ওপরটায় হাত দিয়ে একটু তেউড়ে মুখটা বিকৃত করে রয়েছে, যেন হঠাৎ কিছু গেছে ফুটে।

চাষাভুষো লোক, গা-টা খালি, কাঁধে একটা গামছা মাত্র।

একটা কথা বলা হয় নি, আমাদের গাড়ি ছাড়বার মুখে হঠাৎ কতকগুলো লোক এসে পড়ে স্টেশনে, যেন কাছে-পিঠে কোথাও যাত্রা বা কবির গান ভেঙে গেছে বা ভাঙবে ভাঙবে করছে, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে খবর পেয়ে বাইরের দিকের কিছু লোক এসেছে বেরিয়ে। ট্রেনটাই গেছে বেশ ভর্তি হয়ে, তার মধ্যে সামনে থাকার জন্যে আমাদের গাড়িটা একটু বরং বেশিই। সেই যুবকটি আর তার স্ত্রী সামনের বেঞ্চে, সেই ব্যাপারটুকুর পর কেমন

যেন একটু ঝিমিয়ে পড়েছে, ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়ায় যেন আরও বেশি করে। আমার পাশে ঐ লোকটি যে শব্দ করে উঠল, তার পাশে একজন শীর্ণকায় মাঝবয়সী লোক; মাথার চুল কাঁচা-পাকা, গায়ে একটা আধ-ময়লা ফতুয়া, কোলের ওপর কতকগুনো খেরোর মহাজনী খাতা, তার ওপর হাত দুটো মুঠো করে যেন একটু গুটিয়েই রাখা, দেখলে মনে হয় পাটোয়ারি বা মহাজনের হিসেব লেখে, অথবা নিজেই ছোটখাট মহাজন। একটু নির্বিকারভাবে সামনে চেয়ে আছে। তার পাশেই আট-নয় বছরের একটি ছোট ছেলে— যেমনভাবে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে, বোঝা যায় ওরই কেউ হবে। জন দুই লোক জায়গার অভাবে দাঁড়িয়েও রয়েছে সামনের বেঞ্চের দম্পতিকে একটু আড়াল করে।

শব্দটা শুনে আমি ঘুরে দেখে প্রশ্ন করলাম—"কি হল তোমার?"

"ফুটিয়ে দিলে মশায়। ওনার কাছে কি রয়েছে, প্যাঁট করে দিলে ফুটিয়ে, এই দেখুন না।"

কোমরের ওপরের দিকটা একটু ঘুরিয়ে নিতে দেখি সত্যিই একটা কি যেন বিঁধে গিয়ে মিহি একটি রক্তের ধারা নেমে এসেছে। লোকটা সেটা বোধ হয় এতক্ষণ দেখে নি, যন্ত্রণাতেই উঠেছিল সিঁটকে, রক্তটা বুড়ো আঙুলে মুছে নিয়ে হঠাৎ চটে উঠল—"এ কি রকম কও দি'কিন! গাড়িতে চলবে তা খুন করতে করতে।"

ও-লোকটা সেইরকমভাবে নিবিকার দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে আছে। শুধু ডানহাতের মুঠোটা আবার একটু যেন গুটিয়ে নিলে। তার ভাবগতিক দেখে এ লোকটা আরও গেল চটে, দাঁড়িয়ে আরও পাঁচজনকে সাক্ষী মেনে চেঁচামেচি করতে যাচ্ছিল, আমি হাত ধরে বসিয়ে দিলাম, বললাম— অসাবধানে লেগে গেছে, ভিড়, চাপাচাপি···"

"ছুরির ঘা মশায়।"

"ঘা কেন হতে যাবে? ইচ্ছে করে কাউকে ঘা দিয়ে বসবে?··· কেন? মগের মুল্লুক তো নয়। বোসো তুমি, ছুরির নখটা কি রকম

অসাবধানে লেগে গেছে ;···যদি খোলা থাকে তো ছুরিটা বন্ধ করে ফেলুন না মশাই, মোড়া যায় না ?"

লোকটা সেইরকম নির্বিকার, শুধু অল্প একটু আমার দিকে ঘাড়টা হেলিয়ে বললে—"আর লাগবে না।" ডান হাতটা আরও গুটিয়ে নিয়ে পিরানের মধ্যে সাঁদ করিয়ে দিলে। ছোট ছেলেটা ওর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে।

বললাম—"খোলা যদি থাকে কিংবা মোড়া যদি না যায় তো আবার লাগবেই। কোথায় আছে ছুরিটা, পকেটে ?"

এবার ঘাড়টাও আর বেঁকালে না, সোজা সামনে চেয়েই বললে—"বলছি আর লাগবে না···"

আমারও রাগ ধরে গেল জিদ আর উত্তরের ঢংটা দেখে, আহত লোকটাও আবার তেড়েফুড়ে উঠতে যাচ্ছিল, তাকে চেপে রেখে একটু বিরক্তভাবেই বললাম—"ছুরি খোলা থাকলে লাগবে, আপনার বন্ধ করে রাখতে দোষটা কি ? যেমন দেখছি, ছুরিটা বেশ ধারালও—পকেটে, না হাতে আছে ?"

ছোট ছেলেটা যেন আরও ভেবড়ে গেছে, একবার আমার মুখের দিকে চাইলে, একবার লোকটার নির্বিকার মুখের দিকে, তারপর আবার আমার মুখের ওপর দৃষ্টি তুলে কাঁচুমাচু হয়ে বললে—"ছুরি নয়, কলম জ্যাঠা-মশাইয়ের।"

শুধু এইটুকু দেখলাম, ফতুয়ার মধ্যে জ্যাঠামশায়ের হাত যেন আরও সঙ্কুচিত হয়ে গেল ; ভাইপোর দিকে একটা বক্র দৃষ্টি হানলে, কিন্তু ঘাড়টা না ফেরানোয় সেটা বোধ হয় পৌছালও না ঠিক মতন।

বললাম—"কলমের খোঁচা এইরকম। তা বেশ তো, অসাবধানে লেগে গিয়ে থাকে, আর যাতে না লাগে, তার ব্যবস্থা করতে হবে তো ? নিবটা উল্টে গুঁজে দিন—আছে কোথায় ? পকেটে না হাতেই ?"

"বলছি তো আর লাগবে না ; না লাগলেই হল তো ?"

রাগটা বেড়ে আসছে আমার, ও লোকটাও ফোঁসফোঁস করছে, এদিককার হাতটা চেপে আছে, ওদিককারটার বুড়ো আঙুল দিয়ে আর

একটু রক্ত মুছে নিয়ে সবার সামনে তুলে ধরলে আঙুলটা; আরও পাঁচজনের মধ্যে আলোচনা-মন্তব্য আরম্ভ হয়ে গেছে; বউটি একটু ভীতভাবেই স্বামীকে জিগ্যেস করলে—"হ্যাগা, পাগল-টাগল নয় তো?"—ঘুমন্ত ছেলেটাকে আর একটু টেনে নিলে কোলের মধ্যে।

আমি বললাম—"কিন্তু জিদটা আপনার কিসের? এইরকম চাপ ভিড়, নিবটা উল্টে কলমের মধ্যে গুঁজে দিলেই যদি হওয়া যায় নিশ্চিন্দি তো আপনার আপত্তিটা কিসের? না হয় আমরাই দিচ্ছি উল্টে বসিয়ে; পকেটে কলমটা?

—পকেটটা দেখবার জন্যে গলাটা একটু বাড়ালাম।

ছেলেটা সেইরকম কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে বললে—"না হাতে।"

বললাম—"হাতে তো বের করুন না মশাই, কেউ কেড়েও নিচ্ছে না, ভেঙেও দিচ্ছে না, তার জন্যে আমি দায়ী রইলাম। নিবটা শুধু খুলে উল্টে বসিয়ে দেওয়া; কি নিব? জি-মার্কা?"

শুধু একবার ছেলেটার দিকে আড়ে চেয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল। আমি ধৈর্য হারালাম, "এ কি রকম জিদ!"—বলে অনুচিত হলেও রাগের মাথায় কলমটা টেনেই বের করতে যাচ্ছিলাম, ছেলেটা ব্যাকুলকণ্ঠে হাত তুলে কতকটা চেঁচিয়েই উঠল—"খোলা যায় না সে নিব জ্যাঠামশাইয়ের গো!"...

লোকটাও একেবারে খিঁচিয়ে উঠল, লম্বাটে আমসির মতন মুখটা বিকৃত করে ছেলেটার দিকে ভালো করেই ঘাড়টা ফিরিয়ে ধমক দিয়ে উঠল—"তুই চুপ কর্, জ্যাঠা ছেলে। যত কিছু বলছি না তখন থেকে ক্রমাগত ফ্যাচফ্যাচ করছে। খোলা যায় না! খোলা গেলেই যার খুশি টেনে বের করবে, কোম্পানির রাজত্ব উঠে গেছে?"

মুখের চেহারা আর চিবিয়ে চিবিয়ে একেবারে এতগুলি কথা বলতে দেখে আমিও একটু থ হয়ে গিয়েছিলাম, আবার সামলে নিয়ে বললাম—"আর কোম্পানির রাজত্বে যে অকারণ রক্ত বইয়ে বেড়াচ্ছেন আপনি?"

এবার সোজা আমার দিকেই ঘুরে খ্যাঁকখ্যাঁক করে উঠল—"ভেসে যাচ্ছে গাড়িসুদ্ধ্যু সবাই রক্তগঙ্গায়! একসঙ্গে যেতে গেলে লাগে না অমন একটু-

আধুটু খোঁচা-টোঁচা? আর আপনার কি কল তো—বলে কার গাড়ে ঢেঁকি পড়ে, কার মাথাব্যাথা!"

হাতটা একটু আলগা হয়েই গিয়েছিল, আহত লোকটা নিজের হাতটা একটা হ্যাঁচকা দিয়ে ফতুয়ার মধ্যে থেকে টেনে বের করে বলে উঠল—"তাহলে যার মাথাব্যথা, সেই করছে বের।...এই দেখ, এই দেখে থোও আপনারা সমাজের পাঁচজন, এখন পজ্জন্ত রক্তের দাগ কলমে।"

ঝোঁকের মাথায় গড়গড়িয়ে বলেই হঠাৎ অবাক হয়ে থেমে গেল। আমাদের সবারও বাকরোধ হয়ে গেছে। কলম কোথায়? সরু লিকলিকে তর্জনী আর মাঝের আঙুলটার মাথায় সত্যিই দুটো বড় নিব,—সুতো দিয়ে বাঁধা নয়, নখ দুটোই লম্বা করে বাড়িয়ে তারপর নিবের মতন সূচলো করে কাটা, এমন আশ্চর্য কাণ্ড জন্মে দেখিনি, লক্ষ্য করে দেখলে মাথায় চেরার দাগটি পর্যন্ত দেখা যায়, পাশেরটিতে কালো কালির ছোপ ধরে আছে, মাঝেরটিতে লাল কালির—আঙুলের একটা পাব পর্যন্ত।

এতক্ষণ পরে অর্থ উপলব্ধি হল, জ্যাঠামশাইয়ের কলম!—ঐ আঙুল দুটো দরকার মতন লাল আর কালো কালিতে ডুবিয়ে খেরো লিখে যায়, হারাবার ভয় নেই, পুরনো হবার ভয় নেই, কেনবার বালাই নেই, কেউ যে ধার চাইবে সে-পথও বন্ধ—নি-খরচা, নির্ভাবনাব জিনিস; ফাউন্টেন পেনের দৌড় জামার পকেট পর্যন্ত, এ কলম হামে-হাল সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে; মাঝে মাঝে শুধু নিব দুটো একটু বেড়ে নেওয়া।

এ রকম জাট-কেপ্পন আর দেখেছ? সেই সুতো-চিংড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়। অবাক হয়ে চেয়ে আছি সবাই, পাশের সেই লোকটা তুলে ধরে আছে হাতটা, রাগ নেই, আক্রোশ নেই; একটা গোটা মানুষ যে সরু হতে হতে কলমের নিব হয়ে গেছে, অবাক হয়ে তাই দেখছে।

ও-লোকটিও বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছে;—"আচ্ছা, হয়েছে, ছাড়, তা যার যেমন সুবিধে"—বলে হাতটা ছাড়িয়ে নিলে, সঙ্গে সঙ্গেই ফতুয়ার মধ্যে গুঁজে দিয়ে সেইরকম নির্বিকার হয়ে বসে রইল!

একটু পরেই সরারহাট স্টেশনটা আসতে কয়েকজনের পেছনে পেছনে ও-ও নেমে গেল ; এক অভিনব সৃষ্টি বিধাতার !

"বেহাই আছেন ! বেহাই মশাই কোন্ গাড়িতে !..."

ইঞ্জিনের দিক থেকে আওয়াজটা এগিয়ে আসছে। আমার খেয়াল ছিল না, ধাঁ করে মনে পড়ে গেল, সেই ভোজন-তথা-শয়ন-বিলাসী মানুষটি ; ভিড়ের জন্যে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে থাকায় চোখের আড়ালেও পড়ে গিয়েছিল।

সরারহাটেই তো নামবে। গাড়ি থামলেই আপনি জেগে ওঠে, এবার বোধ হয় বেশি গোলমালে কি রকম ঘুমিয়ে পড়েছে, ডাক দিলাম—

—"ও মশাই, উঠুন, শুনছেন ?"

ধড়মড়িয়ে উঠেই সেই প্রশ্ন—"এখানে পাওয়া যায় না কিছু ? কতক্ষণ দাঁড়াবে গাড়ি ?

বললাম—"গোটা বেহাইটাই পাওয়া যাবে এখানে, আর ভাবনা কি ?— সরারহাটে এসে গেছেন।"

ওর প্রশ্নটা যেন আপনিই বেরিয়ে পড়ে, বোধ হয় মনের অন্তস্তলে সর্বদাই একটা বুভুক্ষু আশঙ্কা লেগে থাকবার জন্যেই যে, বুঝি গেল ফসকে।

একটু লজ্জিত হয়ে বললে—"না...সেজন্যে নয়....মানে...সরারহাটই বুঝি এটা ?...এই যে বেহাই, আমি এখানে !" শেষেরটুকু একটু গলা তুলেই।

বেহাই এসে পড়লেন। গোলগাল মানুষটি, গলায় দুছড়া তুলসীর কণ্ঠি, বললেন—"এখানে তো নামুন, গাড়ি ছেড়ে দেবে যে।....নাঃ, বেহাই আমাদের তেমনটিই রয়ে গেলেন। কোনও কষ্ট হয় নি তো গাড়িতে ?"

আমিই উত্তর দিলাম, বললাম—"কষ্ট পেতে হলে জেগে থাকতে হবে তো মানুষকে।"

হেসে বললেন—"এঃ, খুঁড়ছেন আমাদের বেহাইকে ? সে-ঘুম আর আছে কোথায় বেহাইয়ের ? কন্যা সম্প্রদান করছেন, পুরুতমশাই মন্ত্র পড়িয়ে যাচ্ছেন—যখন আধাআধি, হঠাৎ ফোঁত ফোঁত করে নাক ডাকার শব্দ হতে টের পাওয়া গেল, একতরফা হচ্ছে, তাড়াতাড়ি ছোট বেহাইকে ডেকে আবার কেঁচে গণ্ডুষ করাতে হয়......"

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, গলা চড়িয়েই বললাম—"কেন, বাড়ির গিন্নীর তো জানবার কথা—বেগুনি-ফুলুরিতে ভরে একটা জামবাটি হাতের কাছে রেখে দিলেই পারতেন ..."

ঘাড় ফিরিয়ে হেসে বললেন—"বেহান যে আবার বেহাইয়ের গুরু; মেয়ে বিদেয় করছেন, কাঁদবার নাম করে ঘরে গিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন..."

কানে গেল—গাড়ির মধ্যে সেই বউটি যেন একটু আঁতকে উঠেই তার স্বামীকে চাপা গলায় জিগ্যেস করছে—"হ্যাঁ গা, দুজনেই এই, চলে কি করে ওদের সংসার?"

সরারহাট ভালো করে দেখাই হল না এই সবের মধ্যে পড়ে। শুধু যে আমার গাড়িটা একটা ফুলে-বোঝাই গুলঞ্চ গাছের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তার গন্ধটা নাকে লেগে আছে।

এদিককার স্টেশনগুনোয় বিশেষ কিছু দেখবার নেই বলেই একটা কিছুও বাদ দিতে চায় না মন। তার কারণ বোধ হয় এই যে খুব বড় সমারোহের মধ্যে যেগুনো নির্বিশেষ একেবারেই চোখে পড়বার নয়, অভাবের মধ্যে সেগুনোও এখানে সবিশেষ হয়ে ওঠে। শুধু অভাবই বা বলি কেন? অভাব বলেই সেই অবসর, যা তুচ্ছকেও অসামান্য করে তোলে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসেছে গাড়ি, গলা বাড়িয়ে দেখতে লাগলাম—স্টেশনের বাইরে ডানদিকে একটি বটগাছ, মাঝখানে খানিকটা প্রাঙ্গণ ছেড়ে চারিদিকে কতগুলো বাড়ি কয়েকখানা টালির; যেখানে সেখানে অশুরবির টীকা, রাঙা রঙটা চিকচিক করছে। গাছের মাথায় কিচির-মিচির, যেন দূর থেকেও কান পাতা যায় না—পাখির ঝাঁক বাসার দখল নিয়ে ফয়সলা করে উঠতে পারছে না—আরও আসছে উড়ে; চিল, কাক, শালিক, জটিলতা আরও বাড়বে, তারপর এক সময় শান্তিঃ, শান্তিঃ, সব নির্বিরোধ। অন্ধকারই ওদের হাইকোর্ট; বিচার যাই করুক, অন্তত মানুষের হাইকোর্টের মতন অন্ধকার বাড়িয়ে তোলে না।

গাছের তলায় একপাল শিশু করছে খেলা, একেবারে ছোট কটি উলঙ্গ;

তবে মুক্ত সন্ন্যাসীই তো, গায়ে ধূলির ভস্মপ্রলেপ। বোধ হয় একটা হার-জিত হয়ে গেল, সমস্ত দলটা একসঙ্গে উল্লসিত আনন্দে চিৎকার করে উঠল,—কত রকমে নেচে, কুঁদে, শুয়ে, গড়িয়ে মুঠো মুঠো ধুলো দিলে উড়িয়ে, ওদের রচা এই মেঘেও অস্তসূর্যের শেষ আশীর্বাদ এসে পড়ল।

গাড়ি একটা বাঁকে ঘুরে গেল। দুদিকে মুক্ত প্রাঙ্গণ, যতদূর দৃষ্টি যায়। সূর্য তার একেবারে শেষের আলোটা যাচ্ছে বুলিয়ে—ঐ তার আশীর্বাদ—মাঠে এক রঙ, গাছের মাথায় এক রঙ, সোনালি উলুখড়ের বনে এক রঙ, ঐ জলাটার বীচিভঙ্গের ওপর যেন সম্পূর্ণ আর এক রঙ। আজকের মতন বিদায় দেবার আগে আলোকে যেন নতুন করে দেখছি।...তুমিই জীবন, তুমিই তো বৈচিত্র্য, অন্ধকার তো মৃত্যু—একাকার।

উলুখড়ের বনটা ঘুরে গিয়েই একি এক অপূর্ব দৃশ্য! কয়েক বিঘা জমি নিয়ে হলুদ রঙের ছড়াছড়ি একেবারে, এখুনি কারা যেন কার গায়ে হলুদ গোলা নিয়ে মাতামাতি করে গেছে। বেশ খানিকটা দূরে বলে প্রথমটা ঠাহর হয় না, তারপর বুঝতে পারলাম পালা-ঝিঙের ক্ষেত। ঝিঙে ফুল নিশ্চয় কখনও একটু অভিনিবিষ্ট হয়ে দেখ নি, কেউই দেখে না। কিন্তু অত্যন্ত ফ্যালনা নয়। আসল কথা, আমরা মেয়েদের আর কতগুনো ফুলকে রান্নাঘর থেকে আলাদা করে দেখতে অভ্যস্ত নই, বিশেষ করে সেইসব উদ্ভিদের ফুল যাদের ফলের জন্মই হচ্ছে আমাদের রান্নাঘরকে পরিপুষ্ট করবার জন্যে। আশ্চর্যের কথা এই যে, মেয়েরা কোথায় এর জন্যে একটু সমব্যথার ব্যথী হবে, না, উল্টে তারাই বেশী উগ্র,—সজনে ফুলের চচ্চড়ি করবে, কুমড়ো ফুলগুনোকে ব্যাসনে ডুবিয়ে আরও সরস করে ছাঁকা তেলে ভাজবে—Adding insult to injury—এমনকি যারা কুমড়ো সজনের দলে নয়, বাগানের এক কোণে থাকে পড়ে—বক, রজনীগন্ধা—তাদের পর্যন্ত আনবে টেনে! আমি মল্লিকার মোরব্বা খেয়েছি—মেয়েদের হাতের তৈরী, তাঁদেরই উদ্ভাবনী শক্তির নিদর্শন। "বেতার-জগৎ" কাগজখানা মাঝে মাঝে উল্টে যেও, ওঁরা এখন বাগানে ঢুকে ঐ সব কাণ্ড করছেন—"একপো টাটকা মল্লিকা ফুল নিতে হবে, আধপো গোঁড়া নেবুর রস,

আধপো চিনি, এক ছটাক আদা কুঁচি, প্রথমে ফুলগুলিকে খুব ঘিঠে আলে ঘিয়ে ভেজে নিয়ে…”

থাক, আর চটাব না।

যা যুগ চলেছে গোলাপফুল দেখবারই অবসর নেই মানুষের তো ঝিঙের ফুল! তবুও হাতের কাছে পেলে তুলে নিয়ে একবার দেখ। গড়নে তেমন কিছু নেই, কিন্তু রঙটি একটু লক্ষ্য করে দেখ। সবুজটা হচ্ছে হলদের মিত্রবর্ণ, সেই সবুজের একটি চমৎকার আমেজ আছে কিন্তু ফুলের হলদে রঙে; ঠিক অতসীর হলদে কিংবা জাফরানের হলদে নয়, বোধ হয় ঝিঙের হলদেটাই সেই মিষ্টি রঙ, যেটাকে বাসন্তী রঙ বলা হয়। আর, একটি দিব্যি গন্ধ; খুব উঁচুদরের বলব না, তবে বেশ ভালো, আর একটু নতুন ধরনের যেন। এদিকে খুব মৃদু,—তা ধরলে হেনার তুলনায় ওর মাত্রাজ্ঞান আছে মানতে হবে। গন্ধের ভাষা নেই, তবে তুলনায় যদি কতকটা হয় তো বলব চা-গন্ধী (Tea-scented) গোলাপের চেয়ে ভালো। না, আমি ঝিঙে ফুলের কাছ থেকে ওকালতনামা পাই নি, তবু গরিব বলে কেউ ওর পরিচয় দেবে না, এও তো অসহনীয়।

আর চমৎকার ফোটার সময়টি বেছে নিয়েছে ঝিঙে ফুল; এই সন্ধ্যা। তোমার যদি একটি ফুল তুলে পরখ করবার সময় বা সুযোগ না থাকে তো ঝিঙের ক্ষেতের খানিকটা দূরে দাঁড়িয়েই গোধূলি আকাশের নীচে এর সমষ্টিগত সৌন্দর্যটা দেখ—যাকে বলে Mass effect. শৌখিন মেয়ের মতো এর সময় আর পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে যে চমৎকার একটি জন্মগত সহজজ্ঞান আছে, একথাটা না মেনে উপায় নেই। না বিশ্বাস হয় এরই জ্ঞাতি ধুঁধুলের রুচিটা দেখলেই বুঝতে পারবে। ধুঁধুলের ফুল ফোটে সকালে; একই জিনিস, শুধু খানিকটা বড়, কিন্তু তুমি দেখলেই বুঝতে পারবে ও-রঙ নিয়ে সকালের আকাশের নীচে আত্মপ্রকাশ করায় যেন একটা গ্রাম্যতা আছেই।

এই রকম মানিয়ে ফুটতে আর একটি ফুলকে দেখেছি—জুঁই, সে আবার আরও সুন্দর; আকাশ ধূসর হয়ে এসেছে; এইবার নক্ষত্র ফুটবে, ছোট্ট ছোট্ট পাপড়িগুলি মেলে শুচিশুভ্র জুঁইয়ের দল বেরিয়ে এসে মুখ তুলে দাঁড়াল,

ধূসরিমার গায়েই ওর শুভ্রতার জেল্লা খুলবে। কার কাছ থেকে যে এই সব নূরজেহানের দল এসব তত্ত্ব আসে শিখে!

যাত্রার শেষদিকে সব কিছুরই বেগ বাড়ে—গোরু বলো, ঘোড়া বলো, আমাদের গাড়ির গতিও উদ্দাম হয়ে উঠেছে, এইবার শেষ স্টেশন ফলতা যে। আমিও একটু নড়েচড়ে বসলাম। অস্বীকার করব না এক ধরনের একটা ক্লান্তি এসেছে; যা দেখলাম-শুনলাম, তার প্রতি কণাটি করেছি উপভোগ, কিন্তু তবুও শহরের মানুষ শহরের জন্যে মনটা ভেতরে ভেতরে হয়েই উঠেছে উদ্‌গ্রীব। হোক ছোট্ট শহর, তবু বাঁধানো রাস্তাঘাট, বাজার-হাট, কিছু গাড়ি, ঘোড়া, রিক্সা—সর্বসমেত একটা সজীবতা—দেখছি এর বিরহ বেশিক্ষণ সয় না আমাদের ধাতে। অন্তত যাত্রাশেষে যে একটা শহরই আছে, এ প্রত্যাশাটা উৎসুক করে রেখেছে মনটাকে।

সে-প্রত্যাশার সঙ্গে আরও একটা প্রত্যাশা আছে। খিদে পেয়েছে; চনচনে নয় অবশ্য, কেননা সিরাকোলে নারাণীর হালুয়া তার ধার অনেকটা মেরে দিয়েছে, তবু পেয়েছে খিদে—সেটা অসহনীয় অন্তত এইজন্যে হয়ে উঠেছে যে, আমতলারহাটের সেই রসগোল্লাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করার কথা ভুলতে পারছি না, ফলতায় গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দক্ষিণের এদিক দিয়ে দাক্ষিণ্যও আছে—জয়নগরের মোয়া, মগরাহাটের রাবড়ি দই; ফলতারও নিজস্ব কিছু আছে নিশ্চয়ই।·· আর বাড়ি ফিরতেও তো সেই রাত দশটা।

শহরের কিছু কিছু লক্ষণ পাচ্ছে প্রকাশ, দুএকখানা করে ভালো-মন্দ বাড়ি, গাছ-পালার কিছু আধিক্য। সেই মেঠো ভাবটাও ক্রমে ক্রমে আসছে কমে। আমাদের গাড়ি যাচ্ছিল খাড়া পশ্চিমে, এবার দক্ষিণ-মুখো হল। ডানদিকে আকাশের নীচের দিকটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্ছে, তারপর মনে পড়ল শহরের পেছনেই গঙ্গা।

গাড়ি এসে স্টেশনে দাঁড়াল।

আমার মনটাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এতক্ষণ শহরের একটা মন-গড়া রূপ দাঁড় করিয়ে তার রাস্তাঘাটে যে ঘোরাঘুরি করছিলাম, তার কোথায় কি? স্টেশন বলতেও সেই এক জিনিস—এই খেলাঘরের লাইনে তারও যেন একটি

গড়া-পেটা ছাঁচ আছে, একটি না হয় গোটা দুই, তাইতে কাদামাটি ঢেলে তারপর শুকিয়ে জায়গায় জায়গায় বসিয়ে দিয়ে গেছে—মাঝেরহাট থেকে এই ফলক, ঐ দুরকম দেখলাম, তৃতীয়ের কথা মনে পড়ছে না। রেল দুহাতে টাকা লোটে, কিন্তু অন্তত স্টেশনগুলোকে একটু সুন্দর করে গড়ে না কেন, বুঝে উঠি না। এমন খাঁটি বণিক-মন বোধ হয় আর কোথাও দেখা যায় না। এরা মা-লক্ষ্মীর কাছে এত পায়, কিন্তু দুখানা গয়না দিয়ে সাজাবার কথা দূরে থাক, পায়ে দুটো ফুল দিয়েও যে মনের কৃতজ্ঞতা জানাবে, তাও তো দেখি না।

না, একটু ভুল হয়ে গেল ; মেলা ঘুরি নি, তবু বাগান রাখার রেওয়াজটা অন্তত একটা লাইনে দেখেছি, আমাদেরই ঘরের লাইনে—বি, এন, ডবলিউ, আর-এ (এখন নাম বদলেছে)। শত দোষ থাক, এ গুণটুকু আছে তার মধ্যে। তবে শুনেছি এই বৈশিষ্ট্যের নাকি বিশেষ কারণও আছে। তৎকালীন বি. এন, ডবলিউ, আর-এ ইংলণ্ডেশ্বরের নাকি মোটা রকম শেয়ার ছিল, আর তাঁরই নির্দেশে তাঁর রেলে এই রাজকীয় ব্যবস্থাটুকু···অর্থাৎ আভিজাত্যের ছোঁয়াচে বণিকের জাত গেছে এখানে।

তোমার আধুনিক মন বলবে—Sheer waste—ডাহা অপচয়—প্রয়োজনটা কি এটুকুর ?

একথার ঠিকমতো উত্তর অবশ্য দিতে পারব না। তবে যতটুকু ভেবে দেখেছি, তাতে মনে হয় তোমাদের অভিধানের যা "প্রয়োজন" তার হাতে সৃষ্টিকে ছেড়ে দিলে তার আর কিছু বস্তু থাকত না। সৃষ্টিকে সহনীয়, এমনকি শোভনীয় করে তুলেছে তোমাদের অভিধানের "অপ্রয়োজন", কতকগুলো আবার "অপ-প্রয়োজন"ও আছে তার মধ্যে। অভিজাতকে তোমরা বিদায় করতে বসেছ, তার সব কেড়ে-কুড়ে তাকে নিঃস্ব করে দিয়ে, আর একটু নিঃস্ব করে এই রেলের ধারে ফুল পোঁতবার গুণটাও কেড়ে নিয়ে তবে ছেড়।

স্টেশনের বাইরেটাও নিরাশ করলে। অন্য যানবাহন দূরের কথা, একখানি রিক্সা পর্যন্ত নেই। শুধু একটি ছই-দেওয়া গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, স্টেশন-প্রাঙ্গণে ট্রেনটা প্রবেশ করতেই যুবক মেয়েটিকে বললে—"যাক্, তোমাদের

গাড়িটা এসে গেছে, নিশ্চিন্দি, এখন আবার আমার নৌকাটা ছাড়ে তবে তো·

উত্তর হল—"না ছাড়লে আমি পাঁচ টাকার হরির-লুট দোব।"

—মুখটা বেশ ভার।

"তার মানে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনে হরির-লুট দেওয়া। আজ পৌছতে না পারলে কি ক্ষতিটা যে হয়ে যেতে পারে, জান না তো। বন্দুকের গোটাকতক ফাঁকা আওয়াজও যদি আজ করে রাখতে পারা যায়···"

ছই-দেওয়া গাড়ি থেকে একজন সেপাই গোছের লোক এসে জিনিসপত্র নামাচ্ছে। আমি নেমে পড়ে নীচে দাঁড়ালাম।

ওদের স্ত্রী-পুরুষে কথা-কাটাকাটি চলছে, পেছনে পড়ে আর একটু জোরও হয়ে উঠেছে—

"তাই চললেন বীরপুরুষ! অন্য কাউকে দিয়ে বন্দুকটা পাঠিয়ে দেওয়া চলত না যেন।"

"নিজে তোমার আঁচলের তলায় লুকিয়ে থেকে।···ওরে, যেগুনো গোরুর গাড়িতে যাবে, আলাদা কর,—ঐ স্যুটকেসটা, জলের কুঁজো, টিফিন কেরিয়ার—ওগুনো সব নৌকোর জন্যে।"

"আঁচলের তলায় লুকিয়ে থেকে! আর গোরুর গাড়িটা না এসে পড়লে কি করা হত?—বউ-ছেলে এই আঘাটায় ফেলে চলে যেতে তো—কাজের লোক?"

"কি না হলে কি হত, সেসব কথা ওঠে না, ওরকম বিপদটা এসে না পড়লে তো যাবার কথাও উঠত না। (একটু গলা নামিয়ে) তোমার সঙ্গে বিয়ে না হলে তো এই সব বুলিও শুনতে হত না। দেখো, খোকাকে একটু সাবধানে তুলে নিও, জেগে উঠলে সে বড় মুশকিল হবে।"

"আমি জাগিয়ে দোব; যাও কেমন করে যাবে···"

এগুলাম, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথা-কাটাকাটি শুনলে আমার চলবে না দাঁড়িয়েও যা পড়েছিলাম তা বিপদটা কি সেটা শোনবার জন্যে একটা কৌতূহল জেগেছে মনে। ও-পারটা মেদিনীপুর, দাঙ্গা-হাঙ্গামার জের এখনও চলেছে

কাল সন্ধ্যা, সামনে নদী, স্বামীকে যেতেই হবে পেরিয়ে, স্ত্রী দেবে না যেতে কোন মতেই—বেশ একটু রোম্যান্সের সুর ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, যদি লেখার বাই থাকত তো বুঝতে এর মধ্যে থেকে সরে যাওয়া তত সহজ নয়।

তবু পড়লাম এগিয়ে। মাত্র ঘণ্টা দেড়েক সময়, যানবাহন নেই, পায়ে হেঁটেই একটু দেখে-শুনে ফিরতে হবে এখুনি।...আর মেয়েটিকেও বলি—তোমরা বাপু সত্যিই ছেলেগুনোকে অমন আঁচল দিয়ে আগলে রাখবার চেষ্টা কোরো না, এই করে, আর পাঁচ-ব্যাঘ্যন-ভাত খাইয়ে খাইয়ে শেষ করে দিলে জাতটাকে—একটু বেরুক, মানুষে সমুদ্র পেরিয়ে রাজ্য জয় করছে, এতো বাঙালীর বাচ্ছা ছটাকখানেক গঙ্গা পাড়ি দিয়ে বন্দুকের দুটো ফাঁকা আওয়াজ করতে যাচ্ছে,'এইটুকুতেই আর পেছু ডেক না।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা টানা রাস্তা উত্তর-দক্ষিণে, এদিকে স্টেশনের ইয়ার্ড, ওদিকে গায়ে-গায়ে-ঘেঁষা বাড়ি, যাতে পেছনটায় কি আছে অন্তত স্টেশন থেকে বোঝা যায় না। বাড়ির বেশির ভাগই লোহার ঢেউ-তোলা চাদরের (corrugated iron sheets).

স্টেশনটা তাহলে শহরের ওপরে নয়। অর্থাৎ তখনও আশা। একটা লোককে একটু একলা পেয়ে প্রশ্ন করলাম—"ফলতা শহরটা কোথায় মশাই ?"

একটু বিস্মিত হয়েই মুখের দিকে চাইলে, প্রশ্ন করলে—"যাবেন কোথায় —কার বাড়ি ?"

এই ভয়েই কাউকে করি না প্রশ্ন। একটা লোকের কাজ নেই কর্ম নেই, বিনা কারণেই ঘর ছেড়ে এসেছে এতদূর, তাও কোথায় এসেছে কিছু না জেনেই—এমন অদ্ভুত কাণ্ডও যে জগতে ঘটছে এটা জাহির করে বলবার নয়। হয় মিথ্যা বলতে হয়, না হয় কৌতূহল চেপে একেবারেই চুপ করে যেটুকু নজরের সামনে এল, দেখে শুনে নিতে হয়। আমি তাই করি, এবার অতিরিক্ত কৌতূহলে কিরকম করে ফেলেছিলাম প্রশ্নটুকু।

বললাম—"না, এই স্টেশনের কাছেই একটু কাজ আছে, সেরে নিয়ে ফিরব এ' গাড়িতেই

পা চালিয়ে দিলাম। যেতে যেতেই শুনছি—"শহর বলে তো কিছু নেই, ডানদিকে খানিকটা গেলে একটি হাট পাবেন আর থানা, আর···"

ততক্ষণে রাস্তায় নেমে খানিকটা এগিয়েছি—কি মনে করে বাঁদিকেই; গুরুবল, লোকটার কথাগুনো ডানদিকেই এগিয়ে গেল। নজরটা পেছন দিকে গিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়াতে হল; এক ফালি···হ্যাঁ, গঙ্গাই তো, কিন্তু একি!

তারপরই নজর পড়ল খানিকটা সামনে কতকগুনো লোক মোটঘাট নিয়ে রাস্তার ঢালু গা বেয়ে নামচে; তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম।

ঘাট একটা। বাঁধানো নয়, তবে ঘাটই, ফেরি-ঘাট। সামনে, একেবারে রাস্তার নীচেই গঙ্গা। কিন্তু, কলকাতা থেকে কতটুকুই বা এসেছি, এরই মধ্যে এ কী রূপ গঙ্গার! কী প্রসার! কম করে ধরলেও কলকাতার গঙ্গার বোধ হয় তিন গুণ হবে। ওপারে সন্ধ্যার আকাশের নীচে নীল তটরেখাটা লি লি করছে, জোয়ারের জল ছোটখড় ঢেউয়ে এপারের তটরেখাকে মুঠিয়ে মুঠিয়ে ধরছে চেপে। ঝড় নেই, এমনকি বাতাস পর্যন্তও নেই বললেই চলে, শুধু নিজের পূর্ণতায়ই জলরাশি যেন অধির হয়ে ছলকে ছলকে উঠছে।

স্থির হয়ে চেয়ে রইলাম। ডাইনে বাঁয়ে বাড়ি, তাইতে দুদিকে দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, ঠিক পূর্ণভাবে দেখতে পাচ্ছি না গঙ্গাকে, তবু যা দেখছি চোখ ফেরাতে পারা যাচ্ছে না। আর, বোধহয় এই সময়, এই আকস্মিকতা,—সে আকস্মিকতা আবার ফলতাকে দেখে নৈরাশ্যের পর—এই সব মিলিয়ে একটা অপূর্ব অনুভূতি ঠেলে উঠছে যেন—যদি বলা যায় গঙ্গাই আমার মধ্যে প্রবেশ করে আমার কূল চেপে ধরছে তো প্রকৃত অবস্থাটা অনেকটা প্রকাশ করা যায়।···এই আমার নদীমাতৃক দেশের আর একটা রূপ—আর একটা রূপের আভাস বলাই ঠিক—আরও নেমে আরও কত বিস্তার—আর কত নদী, এইরকম, এর চেয়েও বিশাল—মাতলা, ভৈরব—আরও কত সব, অগণিত, তারপর পদ্মা, মেঘনা,—শুনি ওদিকের কূলের চিহ্নমাত্র যায় না দেখা, কূর্মপৃষ্ঠের মতন বর্তুল জলরাশির ওপর দিগন্ত-রেখা এসেছে নেমে!···কত বঞ্চিত হয়েছি, কত দেখবার যে ছিল, অথচ হল না দেখা···

একটা অদ্ভুত আনন্দ উঠছে ঠেলে—সেটা বুঝি অশ্রু হয়ে উদ্গত হবে এবার ; যতই ক্ষুদ্র হই, নিজের দেশের বিশালতা যে আমারই বিশালতা—আমি সেই নিজেকে করছি অনুভব।

ফলতার ওপর কৃতজ্ঞতায় আমার মনটা উঠছে ভরে। সে আমায় একদিকে নিরাশ করে, একদিকে আমার জন্যে এতখানি সঞ্চয় করে রেখেছে কে জানত ?…আর নিরাশ ?…ধর যদি হতই বড় শহর, যদি শহর দেখেই যেতাম ফিরে ! ও যেন আমার জীবনে এই একটি সন্ধ্যা সৃষ্টি করবার জন্যে নিজেকে বঞ্চিত করেছে এতদিন, একটা তপস্যায় নিজেকে শীর্ণ অসম্পূর্ণ করে রেখেছে।

"কি রে যাবি কেউ !"

চমক ভেঙে ফিরে দেখি, পেছনে আমার সেই সহযাত্রী যুবকটি। পাশে তার স্ত্রী, হাতে টিফিন কেরিয়ারটা, পেছনে সেই সেপাই গোছের লোকটা, তার মাথায় সুটকেসের ওপর হোল্ড-অলে বাঁধা বিছানা ; হাতে সেই জলের সোরাই।

ফেরিঘাটে গোটা তিন নৌকা রয়েছে…যাবার অপেক্ষায় কয়েকজন যাত্রীও ; কিন্তু মাঝিরা নিশ্চেষ্ট, সন্ধ্যা হয়ে গেছে বলে বোধ হয় পাড়ি জমাতে রাজী নয় ;—বৈশাখের সন্ধ্যা।

যুবকের ডাকেও কেউ সাড়া দিলে না।

মেয়েটি একটু উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল—"ঐ দেখ, ওরা পর্যন্ত সাহস করছে না—বলে, যাদের অষ্টপ্রহর এই কাজ।"

যুবক কিছু উত্তর করলে না, ওদেরই আবার হাঁক দিলে—"যাবি তো বল্, ডবল ভাড়া পাবি।"

মেয়েটি মন্তব্য করলে—"কী জিদ বাবা ! দেখিনি এমনটা।…মা কালী করেন যেন নাই রাজী হয়…"

"দেখ্, আরও কিছু যদি বেশি চাস্…"

মন্তব্য হল—সবারই তো টাকা-কড়ি সম্পত্তি বড় নয়, প্রাণটা আগে।"

ছেলেটি এবার ফিরে চাইলে, বেশ বিরক্ত হয়েই বললে—"জয়া, যত মনে

করছি যাবার মুখে কিছু বলব না, কিন্তু না বলিয়ে ছাড়বে না তুমি। এই জন্যই তোমায় ঘাটে আসতেও বারণ করলাম।...একটা কাজে যাব—কত দরকারি কাজ তাও জান, তবু তখন থেকে টিকটিক করছ। এদিকে কলেজে-পড়া মেয়ে, বড় বড় বুলিও শুনি মুখে—যেই নিজের ঘাড়ে পড়ল—ব্যস্, যেমন কলেজে-পড়া, তেমনি পুণ্যি-পুকুর-ব্রত-করা—সব একরকম।...নাও, আরম্ভ হল ফোঁসফোঁসানি।...."

ফিরে দেখবার উপায় নেই, তবে ফোঁপানিটা কানে গেল। এ দাম্পত্য মান-অভিমান-কলহের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা কেমন যেন ঠিক হচ্ছে না; একটু নেমেই দাঁড়িয়েছিলাম, ঘুরে উঠতে যাব, যুবকটির সঙ্গে মুখোমুখি হল। পেছন ফিরে ছিলাম বলে, আর খানিকটা তফাতে বলে আগে বোধ হয় চিনতে পারে নি, চোখাচোখি হতেই মেয়েটির দিকে মুখটা একটু ফিরিয়ে বললে—"ঐ দেখ, উনিও যাচ্ছিলেন।"

"ফিরে তো আসছেন আবার।" দুজনের কথাই এবার অপেক্ষাকৃত একটু চাপা গলায় হল।

যুবা কি একটু ভাবলে, সত্যি, আমার উঠে আসাটা তো তার সংকল্পের বিরোধিতাই করে, তারপর তার জিদ যেন আরও চড়ে গেল, আমার দিকেই চেয়ে প্রশ্ন করলে—"আপনি পারে যাচ্ছিলেন?"

হঠাৎ একটা খেয়াল উঠল আমার মাথায় যা আমার মতো নোঙর-ছেঁড়া ভবঘুরের পক্ষেও একটু নতুন।...বেশ তো, যাই না ওপারে—মেয়েটির যা অবস্থা, তবু অনেকটা সাহস পায়, এ দেখছি যখন যাবেই।...আগে এর আতিথ্যই, তারপর কোন একটা জায়গার নাম করে সরে পড়লেই হবে—একটা নাম অন্তত মনে আছে—তমলুক...কোথায়, কত দূরে, জানি না—বিশেষ করে এ কোথায় উঠবে তাও যখন জানি না; কিন্তু কিছু একটা হয়েই যাবে ঠিক—এর সঙ্গে গল্প করতে করতেই—সে আত্মবিশ্বাসটা না থাকলে এরকম বিনা-ব্যবস্থায় ঘোরাঘুরি করতে পারতাম না জীবনে।...যাই, মেয়েটি তবু ভরসা পায়।

কাল আর পরশুর যা প্রোগাম কলকাতার, কাজের আর অকাজের, মুছে ফেললাম ; যাব।

একটু যে দেরি হল উত্তর দিতে সেটাকে ঢাকবার জন্যে একটু ঘুরে চাইলাম ফেরিঘাটটার দিকে, তারপর দোমনাভাবে একটু টেনে টেনেই বললাম—"যাচ্ছিলাম তো, কিন্তু···"

যুবক ব্যগ্রভাবে বললে—"না, সে ঠিক হয়ে যাবে, আর একটু উঠলেই, এটা ওদের দর বাড়াবার ফন্দি। এই পথ দিয়েই যাওয়া-আসা আমার, জানা আছে তো···চলুন ··বাড়তি ভাড়াটা না হয় আমারই ; একটু গরজ আছে।"

ঘুরতে যাব, দৃষ্টিটা মেয়েটির মুখের ওপর গিয়ে পড়ল। বাধ্যই পড়তে। সে যে কী হতাশার দৃষ্টি, কী অ্যাপীল, দেখনি, সুতরাং বোঝানো যাবে না। চোখ দুটো আমার ওপর শেষ ভরসায় হয়ে উঠেছে স্থির, বিস্ফারিত, জলে ভাসছে বলে আরও দেখাচ্ছে বড়, পশ্চিমের শেষ আলো এসে পড়ায় আরও করুণ—নদীতটে সেই একখানি নারী-মুখের ছবি কখনও মুছবে না আমার মন থেকে, কখনও বর্ণনা করে কাউকে বোঝাতেও পারব না—সে যে কী উদ্বেগ, কী আশা, কী নিরাশা !

তারপর সীমন্তের সেই জলজলে সিঁদুর—নব সোহাগে গাঢ় করে টানা—সে যেন আমার অন্তঃস্তলের মিথ্যাচারটা ধরতে পেরেই ধিক্কার হানছে আমার ওপর।

না, দরকার নেই। উপায়ও নেই, এ জাতের মেয়েরা জন্মায়ই পুরুষকে ঘরে বেঁধে রাখবার জন্যে ; দেবতারাই হার মানে তো আমি কোন্ ছার। একটু দ্বিধা,—একজন পুরুষের দৃষ্টিতে কাপুরুষ প্রতিপন্ন হওয়া, আর একজন নারীর চোখের অশ্রুর জন্যে দায়ী হওয়া (কে জানে কতদিনের অশ্রুই বা তা)—কোন্‌টে বেছে নিই ?

দ্বিধা কিন্তু মুহূর্ত কয়েকের মাত্র, তারপর আর একবার নদীর দিকে ঘুরে দেখে নিয়ে বললাম—"থাক্, কালবোশেখীর দিন, একেবারে এরকম গুমট থাকলে যেন আরও ভয় হয়···"

নারীর সীমন্ত-সিঁন্দুরের ধিক্কারের চেয়ে পুরুষের পুরুষকারের ধিক্কারটা কি-

বেশিই বাজল ? কিন্তু সে-হিসাবের জন্যে আর না দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এলাম

এবার চললাম উত্তরদিকে, হাটটাই না হয় দেখে আসি ফেরিঘাটে অনেকখানিই সময় গেল নষ্ট হয়ে।

যান-বাহনহীন রাস্তা, লোকচলাচলও কম, দুধারে বাড়ি, টিনের দেয়াল, টিনের ছাত, কোনটাতে চায়ের দোকান, খান তিনচার বোতলে কিছু বিস্কুট-কেক ; কোনটায় মুদীখানা। মাঝে মাঝে ফাঁকও আছে, বাঁদিকের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে গঙ্গা যাচ্ছে দেখা। ময়রার দোকান একটাও নেই, এদিকে বেশ খিদে পেয়ে গেছে ; দোকান না থাকলে খিদে আবার বেশিই পায়। নেই ঘরে খাঁই বেশি—তা ঘরেই হোক বা পথেই হোক, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ব্যাপারখানা একই তো। বলবে চা-বিস্কুট কি দোষ করলে ? না, আমার ও-পাট নেই। চা-টা আমি আচার্য পি. সি. রায় মশাইকে দিয়েছি, লোকে যেমন জগন্নাথকে আমটা কাঁটালটা দিয়ে দেয় ; 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষে, সে উগ্র প্রবন্ধ তো তুমি পড় নি, সুতরাং বুঝবে না।

পা চালিয়ে দিলাম, দেখি হাটে যদি কিছু জোটে। জায়গার যা চেহারা দেখছি, জুটবে যে কি তাও আন্দাজ করতে বেগ পেতে হচ্ছে না। মাঝেরহাটে সেই মুড়ির যাত্রায় আরম্ভ, শেষও হবে মুড়ি দিয়েই। তাই না হয় জুটুক।

খানিকটা গিয়ে বাঁদিকে, অর্থাৎ গঙ্গার দিকে আর বাড়ি নেই। আমি একেবারে খোলা রাস্তা দিয়ে চলেছি, রাস্তার নীচে থেকেই গঙ্গা, সামনে পেছনে যেদিকে দেখ। কলকাতার স্ট্র্যাণ্ডের আর বাহার নেই, বাড়িতে-জেটিতে সব নষ্ট করে দিয়েছে, এক কেল্লার সামনে খানিকটা ছাড়া ; তার চেয়ে চন্দননগরের স্ট্র্যাণ্ড ঢের ভালো, তবে এখানকার এটুকুর কাছে যেন কোনটাই দাঁড়ায় না। সেটা আর কিছুর জন্যে নয়, নদীর বিস্তারের জন্যে। চন্দননগরের স্ট্র্যাণ্ড প্রকৃতই স্ট্র্যাণ্ড অর্থাৎ নদীর কোলঘেঁষা সড়ক, শৌখিন ফরাসী সাজিয়েও রেখেছিল ভালো করে, প্রশস্ত রাস্তার ওপরেই যত ভালো ভালো বাড়ি, হোটেল, অফিস, বাগানবাড়ি। অপরদিকে বাঁধানো বাঁধের

নীচেই গঙ্গা, ওপারে জুটমিলের বাড়িঘর, টানা এমুড়ো-ওমুড়ো চলে গেছে ;—সব মিলিয়ে, বিশেষ করে সন্ধ্যার সময়টিতে, যখন ওপারে আলোর মালা জ্বলে ওঠে, চন্দননগরের স্ট্র্যাণ্ড ইন্দ্রপুরী হয়ে ওঠে যেন। কিন্তু তবুও ফলতার এইটুকুকেই ফুল মার্ক দিতে হয়, অন্তত আমার হাতে তো পাবেই ; চন্দননগরে এ গঙ্গা কোথায়—ফলতার তুলনায় একটা খাল।

কথাটা হচ্ছে—গয়নায় রূপ, না রূপে গয়না? প্রশ্নটা এইখানেই যে শেষ হয়ে যায় তাও নয়, আরও একটু এগোয়—

গয়না কি রূপের দোসর জুটিয়ে তাকে খানিকটা বিকৃতই করে দেয় না? নিরলঙ্কার রূপই কি পূর্ণ বিকশিত রূপ নয়? আর নিরলঙ্কার রূপ—নিরহঙ্কারও তো; তাও যে অপরূপ। তটবর্ত্মের সেই নিরহঙ্কার পূর্ণ-বিকশিত রূপ দেখবার জন্যে কোন এক সন্ধ্যায় ফলতার এইখানটিতে এসে দাঁড়িও। আর পার তো একটি পূর্ণিমার দিনই বেছে নিও, কোটালের গাঙ যখন একেবারে কূলে কূলে ভরা।

ওকি! জলের মধ্যে থেকে ভেসে উঠল নাকি!···ফলতা যেন আজ ভোজবাজির ঝুলি নিয়ে বসেছে আমার জন্যে—

চমৎকার একটি বাড়ি—একটি হর্ম্যই বলা চলে। একটু আড়ালে ছিল বলে নজরে পড়েনি, গঙ্গার এত কোল-ঘেঁষা যে, হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে সত্যিই মনে হয় যেন গঙ্গার ভেতর থেকে এই উঠল। সন্ধ্যার গায়ে সাদা চুনকাম ঝিকঝিক করছে। একটা আশা হল, তাহলে বোধ হয় শহর একটা আছে, এখান থেকে আরম্ভ হল।

গতি একটু ভাব-মন্থর হয়ে উঠেই ছিল, পা চালিয়ে দিলাম। একটা নয়, দুইদিকে দুখানা বাড়ি, দেয়াল দিয়ে ঘেরা হলেও বোঝা যায় ভেতরে প্রশস্ত বাগান। রাস্তাটা গেছে মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে।

আমি বাঁদিকের বাড়িটাই দেখেছিলাম দূর থেকে, সেইটেই বড় ; তট-রেখাটা এখানে হঠাৎ অনেকখানি গাঙের ভেতর দিকে চলে গেছে, তাইতেই মনে হচ্ছিল, বাড়িটা যেন জল থেকে উঠেছে। বাড়ির লোহার গেট বন্ধ,

ভেতরেও লোক নেই, একটু এগিয়ে আর একটা ছোট দরজা। সেটাও বন্ধ।

বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে এই যে সব ঘুমন্ত পুরী—এগুনো বড় আবিষ্ট করে দেয় আমার মনটা। যেগুনো ভেঙে পড়ছে, যেগুনোর জীবন্ত ইতিহাস পড়ে গেছে অনেকখানি দূরে, সেগুনো তো তাদের কুহেলী-ঘেরা রোম্যান্স দিয়ে করেই, যেগুনো দাঁড়িয়ে আছে, ভালোভাবেই দাঁড়িয়ে আছে—মালী রয়েছে দেখাশোনা করবার জন্যে, যাদের বাড়ি তাদের যাতায়াত আছে মাঝে মাঝে, সে ধরনের বাড়িগুনোও আমায় কম আবিষ্ট করে না। অবশ্য বড় বাড়িই বেশি করে—হৃত-গৌরব জমিদারির সঙ্গে সেগুনো সংশ্লিষ্ট করা যায়। আমি বাংলার বাইরের মানুষ এক হিসেবে, সে-গৌরবের যদি কিছু দেখা না থাকত একেবারে তাহলে বোধ হয় এরকমটা হত না। কিন্তু দেখেছি যে, তাও দেখেছি শৈশবের স্বপ্নময় দৃষ্টিতে।

আমার ছেলেবেলার দুটো বছর কেটেছে চাতরা-শ্রীরামপুরে। রক্তে তখনও যেমন এই ভবঘুরে-বৃত্তিটা ছিল, বাইরের অবস্থাও এমন ছিল, যাতে সেটা প্রশ্রয় পায় প্রচুর। গঙ্গার ধারে গোঁসাই জমিদারের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যেতাম আমার অনির্দিষ্ট যাত্রাপথে—সকালে, দুপুরে, বিকালে যখনই ঝোঁক চাপত। সকাল-বিকালের সজীবতা—লোক-লস্কর, জুড়ি-গাড়ি, জমিদার বাড়ির নানা বয়সের পুরুষেরা—সুরূপ সুবেশ; পেরামবুলেটারে শিশুরা, সায়েবদের শিশুর মতন—সংখ্যায়-বৈচিত্র্যে—সবটুকুর বাহুল্য—আমার দৃষ্টিকে মোহাচ্ছন্ন করে দিত। দুপুরের নিস্তব্ধতায় যখন দেখতাম, তখন এক দিক দিয়ে সব যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠত। খুব কাছ থেকেও দেখেছিলাম, বছর দুই যে ছিলাম চাতরায় তাতে বোধ হয় বার দুই। নন্দ গোঁসাইয়ের বাড়িতে হত দোল, ঠাকুরমার সঙ্গে যেতাম। প্রকাণ্ড উঠান, তার চারিদিকে থাম, উঠানের উপর সামিয়ানা; তাই থেকে রঙ-বেরঙের ঝাড় লালঠেন নেমে এসেছে, আলোয় আলোয় ছয়লাফ। আর ঝাড়ের ডায়মণ্ড-কাটা চঞ্চল দোলকগুনো থেকে লাল, নীল, সবজে, বেগুনে—কত রকম আলোর দ্যুতিই যে ঠিকরে পড়ছে চারিদিকে! সামনে দোলমঞ্চ; জমজমে ভাবটা

মনে আছে, তবে মূর্তির মধ্যে মনে পড়েছে শুধু গরুড়ের মূর্তিটা, দেহটা মানুষের, শুধু পিঠে ডানা,—আর পাখির চঞ্চুর মত লম্বা নাক, হাতজোড় করে প্রশান্ত বিশালতায় সামনে চেয়ে বসে আছেন।

পথ দিয়ে যাই বা এরকম ভেতরেই এসে পাড়ি একটা দূরত্ব আর দুরাশার দৃষ্টি দিয়েই দেখতাম এই শ্রী আর সমৃদ্ধির মিছিল। হ্যাঁ, শিশুমনের একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা ছিল বৈকি, কিন্তু বরাবরই একটা সম্ভ্রমের ব্যবধান, একটা অপ্রাপনীয়তার আশ্বাস সমস্তটুকুকেই একেবারে অন্য জগতের করে রেখেছিল।

শৈশবের দৃষ্টিতে আকাঙ্ক্ষা থাকে কিন্তু হিংসা থাকে না, তাই দেখাটা এক ধরনের পাওয়ার আনন্দেই আমার কাছে আজও অম্লান রয়ে গেছে।

সুযোগ পেলেই আমি তাঁকে খুঁজি এই সব ঘুমন্ত পুরীর মধ্যে। দেশে গেলে এইজন্যে প্রায়ই একবার না একবার উত্তরপাড়াটা বেড়িয়ে আসতাম। মনে আছে, একবার দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দ্বার অবারিত পেয়ে একটা বড় বাড়িতেও করেছিলাম প্রবেশ। প্রশস্ত উঠান, থামের সারি দিয়ে ঘেরা; চণ্ডীমণ্ডপে দেবীমূর্তি। আধুনিকা নয়, এইটুকুই পেলাম সান্ত্বনা—বাড়ির ঠাকুর—দুর্গা, সরস্বতী এখনও প্রায় তাঁদের অন্তঃপুরিকা মূর্তিতেই রয়েছেন—কিন্তু লোক কোথায়? কোথায় সে সমারোহ? সে নিষ্ঠাই বা কোথায়? প্রকাণ্ড পুরী নিস্তব্ধ, বুঝলাম পুরীর যাঁরা অধিকারী তাঁরাও কেউ আসেন না বড় একটা—এমন একটা উপলক্ষ্যেও নয়। দোতলার বারান্দায় মাত্র একজন বয়স্থা মহিলাকে দেখলাম। একদিক থেকে অন্যদিকে কতকটা উদাসীন মন্থরগতিতে চলে যাচ্ছেন।

ওরকম একটা আঘাত জীবনে কম পেয়েছি···কোথায় গেল সব, কি হল?

এ বাড়িটা সে ধরনের কিছু নয়, তবু এখানকার জমিদারবাড়ি নিশ্চয়। কাছেপিঠে আর বাড়ি নেই, এ ধরনের তো নেই-ই, তার মানে আমি যে ভেবেছিলাম শহর হল আরম্ভ সেটা মাত্র ভ্রান্ত আশা একটা।

পথে লোক একেবারেই নেই যে একটু জিগ্যেস করি বাড়িটা কাদের, কে এখানকার জমিদার।

খানিকটা এগুতে দেখি, পেছনেই একটি ভদ্রলোক এসে পড়েছেন।

গেঁয়োলোক, বেশ হনহন করেই চলেছেন হাটের দিকে। প্রশ্নটা করলাম। বললেন—"না, জমিদার নয়, জগদীশ...." ঘোষ বললেন কি বোস বললেন, স্পষ্ট বোঝা গেল না।..."ওই যাঁর রেডিও।"

পরিচয়টুকু দিয়ে হনহনিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমি যে শকটা (shock) পেলাম সেটা যে ধরনের চিন্তার মধ্যে ছিলাম ডুবে, তারই জন্যে। এই শকটুকুর জন্যেই আমার চিন্তাটাও হঠাৎ মোড় ফিরে গেল।....সত্যিই তো, মনে ছিল না, ভরা বৈশ্য যুগ চলছে যে! রেডিও বেচার টাকা!

এ চিন্তাতেও পড়ল বাধা, নৈলে রেডিও রহস্যটা যে যেতে যেতেই পরিষ্কার হয়ে যেতে পারত।

কয়েক পা এগুতেই ডানদিকে একটা মেটে রাস্তা। তারই একটু ভেতর দিকে একটা জায়গায় দৃষ্টি গেল আটকে।

একটি ছেলে প্রায় বছর দশেকের, সঙ্গে একটি মেয়ে, বছর দুয়েকের ছোট —কেমন যেন জবুথবু হয়ে রাস্তার এক পাশে রয়েছে দাঁড়িয়ে। কৌতূহল হতে এগিয়ে গেলাম। ছেলেটির পরনে একটা ময়লা হাফ প্যান্ট, ডান হাঁটুর কাছটা ছেঁড়া, গলায় পৈতে; মেয়েটির পরনে একটা খাটো ডুরে শাড়ি, তাও নীচে খানিকটা ছেঁড়া, ময়লাই; চেহারাতেও দুজনের অভাবের ছাপ রয়েছে, তবুও দুজনেই সুশ্রী বলতে হয়। ছেলেটির ডান হাতে একটা কলাই-করা আর একটা কাঁসার বাটি, আমি একটু এগুতেই পেছন করে নিলে। মেয়েটির দুটি আঁচলে ছোট বড় দুটি পুঁটলি করে কি বাঁধা; সামনেই ধরেছিল, আমি এগুতে পিঠে ফেলে দিলে।

কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলাম—"কি হয়েছে খোকা তোমাদের? ওরকম করে..."

সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে নজর পড়ায় ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেল। জিগ্যেস করলাম—"পড়ে গেছে? কি ছিল?"

ছেলেটিই উত্তর দিলে—"তেল আর ঘি।" মেয়েটি ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

"কি করে পড়ল ?"

"হোঁচট লেগে।"—রাস্তায় একটা গর্তের মতন ছিল, তার দৃষ্টিটা সেইখানে গিয়ে পড়ল।

"তা পড়ে গেছে তো আর কি করবে ? ইচ্ছে করে তো আর ফেলনি, আবার কিনে নিয়ে যাও, পয়সা নেই কাছে আর ?"

একটি লোক এসে দাঁড়াল, প্রশ্ন করলে—"হয়েছে কি ?"

বললাম তাকে। ছেলেটিকে বললাম—"না থাকে পয়সা বাড়ি থেকেই নিয়ে এস ; কতদূরে বাড়ি ?"

লোকটা মাঝবয়সী, একটু কোলকুঁজো আর খেঁকুরে। নির্লিপ্তভাবে কথাটা শুনে এগিয়েছিল, ঘুরে দেখে বললে—হ্যাঃ, ফলছে পয়সা, নিয়ে এলেই হল। আমাদের ইয়ের ছেলে নয় ?"

বাপের নাম না করলেও ছেলেটি মাথা নেড়ে জানালে—হ্যাঁ।

"ফলছে পয়সা। যতসব বেহ্দ্দ শ ছেলেপিলে হয়েছে আজকাল। তোদের বাড়িতে তো আজ কুটুম আসবে ? আসবে না এয়েছে ?"

"আসবে।"—তিরস্কারে ছেলেটি আরও হতভম্ব হয়ে গেছে, কথাটা সে বললে আরও যেন ব্যাকুলভাবেই।

"আসবে তো হরি-মটোর খাওয়ান"—ক্রূর মন্তব্যটা করে চলে গেল লোকটা। মানুষও যে কতরকমের হয় !

"তাহলে…?"—প্রশ্নটা তুলতে যাচ্ছিলাম, ছেলেটা হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠল। মেয়েটিও ব্যাকুলভাবে একবার তার দিকে একবার আমার দিকে দেখে নিয়ে তেমনি করেই ভেঙে পড়ল।

দৃশ্যটি বড় করুণ, পেছনে যে ইতিহাসটুকু তাতে আরও করুণ করে তুলেছে। আমি এগিয়ে দুহাতে নিলাম কোলের কাছে দুজনকে টেনে, বললাম—"চুপ কর। গেছে পড়ে তো হবে কি ? চল, আমি হাটেই যাচ্ছি, কিনে দোব।"

মেয়েটি পা বাড়িয়েছিল, ছেলেটি কিন্তু নড়ল না, ফোঁপাতে লাগল।

মেয়েটিও গেল থেমে।

হাতের অল্প ঠেলা দিয়ে বললাম—"চল না।"

নড়ল তো না-ই, কথাও বললে না, সেইজন্যে আমাকেও একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হল, তারপর আর একবার বলতে ছেলেটি হাত দিয়ে চোখ দুটো মুছে অসম্মতির ভঙ্গিতে মাথাটা নাড়লে।

প্রশ্ন করলাম—"কেন, দোষটা কি?"

একটু হেঁট হয়েই রইল, তারপর আস্তে আস্তে মাথাটা তুলে বললে—"আপনি কেন কিনে দেবেন?"

—খুব নরম হয়ে কান্নার ভাবটা একেবারে না গেলেও তারই পাশে ঠোঁটে একটু অপ্রতিভ হাসি টেনে এমনভাবে বললে, বেশ বুঝতে পারা গেল, খুব সতর্ক, যেন প্রত্যাখ্যানে আমি কোন আঘাত না পাই। আরও একটু কি ছিল বলাটুকুর মধ্যে যাতে মনে হয় কথা কটা বইয়ে-পড়া বুলি নয়; এক একটা পরিবারে হাজার দারিদ্র্যের মধ্যেও একটা সহজ আত্মমর্যাদাবোধ থাকে, এ যেন তারই প্রতিধ্বনি। মাত্র লেখা বুলি হলে যেটা পাকামি বলে মনে হত, সেটা শুধু একটা মিনতির মতন কানে এসে ঠেকল।

বড় মিষ্টি লাগল; বড় পবিত্র। গলার পৈতাটার ওপর স্বতই দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল, ছেঁড়া মলিন হাফ প্যান্টটার ওপর এসে পড়েছে। যা শুনলাম তার সঙ্গে এটুকুর কেমন যেন একটা মিল আছে—দারিদ্র্যের ওপর শুচিতার মৌন আধিপত্য।

অপ্রতিভ করে দিয়েছে বৈকি বেশ একটু। একটা গল্পের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে; ছেলেবেলায় পড়েছিলাম। রোমনগরে একটি বৃদ্ধ মলিন কাপড়-চোপড় পরে টুপিহাতে রাস্তার ধারে ছিল বসে। একটি ভদ্রলোক ভিখারী ভেবে তার টুপিতে একটি মুদ্রা ফেলে দিলেন। বৃদ্ধ টুপি উল্টে সেটা ঝেড়ে ফেলে এমন একটা নীরব তিরস্কারের দৃষ্টিতে চাইলে যে, দানের শখ মিটে গিয়ে ভদ্রলোক পালাতে পথ পায় না।

সত্যিই তো, কি অধিকার আছে আমার এভাবে সাহায্য করতে যাওয়ার? দুঃখ-নৈরাশ্য যখন থাকবেই পৃথিবীতে তখন নিজের শক্তিতেই তা কাটিয়ে উঠুক মর্যাদার সঙ্গে, তাইতেই তো হবে শক্ত মেরুদণ্ডের একটা

গোটা মানুষ। আমি যা করতে যাচ্ছিলাম সেটাতে ভিক্ষায় হাতেখড়িই হত না কি?

চিন্তাগুনো বিদ্যুৎগতিতে আমার মনে গেল খেলে; কিন্তু অভিভূত করতে পারলে না আমায়। বিবেকের যুক্তিটা মানলাম, কিন্তু ফলতা আজ আমায় এত দিয়েছে, মনটা এত উঁচু পর্দায় হয়ে গেছে বাঁধা, যে প্রতিদানে একটা কিছু না করে আমি নিষ্কৃতি পাচ্ছি না....একটা এরকম অসহায় পরিবার, ঘরে কুটুম আসছে—চুলচেরা তর্ক নিয়েই থাকব?....কিছু করা যায় না?—উচিত নয় কিছু করা? মেয়েটি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে; সে তো দাদার মতন অত বোঝে না। সময় নেওয়ার জন্যেই প্রশ্ন করলাম—

"তোমাদের বাড়িতে কে কে আছেন?"

"বাবা, মা, ঠাকুরমা, দিদি, যমুনা, আমি।"

—যমুনা বলবার সময় মেয়েটির মুখের দিকে চাইলে।

"কি করেন তোমার বাবা?"

"স্কুলে পণ্ডিত।"

"এখানে?"

"না, ভিন্ গাঁয়ে।"

"সেখানেই থাকেন?"

"না।"

প্রশ্নগুনো আপনা হতেই বেরিয়ে যাচ্ছে মুখ দিয়ে আমার, নেপথ্যে চলছে চিন্তার স্রোত, কি করে কিছু করা যায়, সবদিক বাঁচিয়ে?

প্রশ্ন করছি—"যাওয়া-আসা করেন বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"এসেছেন তিনি?"

"আজ একটু দেরি হবে, জামাইবাবুকে সঙ্গে করে আনবেন কিনা...রাত হয়ে যাবে।"

অন্যমনস্কভাবেই প্রশ্নগুনো করছিলাম, আবার অবস্থার দিকে মনটা

অবহিত হয়ে উঠল ;—গৃহস্বামী নিজে যখন পৌছাবে—কুটুম সঙ্গে করে—কোনও উপায়ই থাকবে না আর।···কিছু যে না করলেই নয়।

হে ভগবান।

একটা প্রশ্ন মনে পড়ে গেল ; জিগ্যেস করলাম—"তিনি নিজে কিছু সঙ্গে করে আনবেন ? কুটুমের জন্যে ?"

কেন যে প্রশ্নটা করলাম, ঠিক বলতে পারি না ; কেননা, ঘি-তেলই তো আসল—তা তো আর সঙ্গে করে আনবে না। কিন্তু প্রশ্নটা বোধ হয় দৈবচালিতই ছিল—এক এক সময় এসে যায় ওরকম, কেননা উত্তর যা পেলাম তাইতে এক ঝলক আলো যেন ফুটে উঠল চোখের সামনে, যা হাতড়াচ্ছিলাম গেলাম পেয়ে।

ছেলেটি বললে—"বাবা শুধু দইটা আনবেন, এখানে তো পাওয়া যায় না ভাল।"

দই !!···আমার চিন্তায় হঠাৎ একটা আবর্ত উঠল।···By association (পরিভাষা দেখ) ছেলেবেলায় শোনা একটা উপাখ্যান মনে পড়ে গেল।···পথ খুলে গেছে আমার।·· আজকের দিনে আমার সবই সার্থক করবেন ভগবান। আমার সংকল্পে, আমার দানে কোনখানেই গ্লানি সৃষ্টি করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, একটি অপরিসীম শুচিতা, তার চেয়েও যা বেশি—একটি ভাগবত করুণা থাকবে আমার এই দেওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে।

অবশ্য, আমি হয়ে থাকব মিথ্যাচারী। তা হইগে।

গোধূলির রং আর একটু গাঢ় হয়েছে।

আমি অনুভব করছি আমার দৃষ্টির মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রসন্নতা এসে গেছে ; মিথ্যাচারের সঙ্গে তার তো মিশ খাবার কথা নয় !

একটু হেসে ছেলেটির মুখের পানে চাইলাম, বললাম—"চল, কোন দোষ নেই।"

দাঁড়িয়েই রইল। আমি মুখটা একটু ঝুঁকিয়ে প্রশ্ন করলাম—"সেই গল্পটা শুনেছ ?—মধুসূদনদাদার ?—গুরুমশাই মারা গেছেন, তাঁর শ্রাদ্ধে ছাত্ররা সব

জিনিস জোগাবে—এর পড়েছে দইয়ের ভার—অত্যন্ত গরীবের ছেলে, কোথায় পাবে দই ?…"

ছেলেটির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কথা কেড়ে নিয়ে বললে—"হ্যাঁ—হ্যাঁ শুনেছি, তারপর তার মা বললেন—তোর মধুসূদনদাদাকে ডাক, তিনি জুগিয়ে দেবেন দই—তারপর পাঠশালায় যাবার সময় বনের ধারে—"কোথায় মধুসূদন দাদা ! কোথায় মধুসূদন দাদা !" বলে ডাকছে, এমন সময় মধুসূদন বুড়ো-ব্রাহ্মণের বেশ ধরে এসে…"

মেয়েটিও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে, জড়তাটুকু গেছে কেটে, গল্প বলবার ছেলেমানুষী আগ্রহ আর চাপতে না পেরে মুখ তুলে বলে উঠল—"আমিও জানি, আমিও জানি—এসে বললেন—কি চাও ? না, গুরুমশাই মরে গেছেন, আমায় দই জোগাতে হবে—তা আমরা গরীব, রোজ ভালো করে খেতেও পাই না, কোথায় পাব দই ? তখন মধুসূদন দাদা বললেন, এইজন্যে ডাকা-ডাকি ? বলে…"

"বনের মধ্যে গিয়ে এনে দিলেন দই, না ?"

হ্যাঁ, ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনেছি…শুয়ে শুয়ে…অনে—ক বার…চমৎকার গল্প"…দুজনেই জড়াজড়ি করে বললে ; ফুটন্ত ফুলের মতন কচি মুখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আমিও শুনেছিলাম আমার ঠাকুরমার কাছেই—স্তব্ধ রজনীতে বিছানায় শুয়েই তাঁর কোলের কাছটিতে—অর্থাৎ স্বপ্নলোকে প্রবেশ করবার মুখেই। আর শুনেছিলাম এইরকম একটি শ্যামল স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যেই—গাছপালায় ঘেরা আমাদের চাতরার বাড়িতে।

আজ তাই পরিবেশের সমতায়ও আমি সেই উপাখ্যানটিকে রূপ দেবার লোভ পারছি না সামলাতে। করিও না সার্থক। বললাম—"শুনেছ তো ?… তার মানে তাঁকে যারা ভালোবাসে, মন যাদের পবিত্র, যারা নিষ্পাপ, তারা বিপদে পড়লে তিনি এসে রক্ষে করেন, না ? কিছু অভাব হলে জুগিয়ে দেন, না ?"

"হ্যাঁ।"—মেয়েটির মুখ আরও দীপ্ত হয়ে উঠেছে ; ছেলেটির কিন্তু একটু যেন নিষ্প্রভই হয়ে গেছে, সে বুঝেছে গল্পটা কেন।

বললাম—"তাহলে চল, 'না' বলছ কেন ?

ছেলেটি অপ্রতিভভাবে দাঁড়িয়েই রইল মুখের দিকে চেয়ে; মেয়েটিও এতক্ষণে যেন একটু ধাঁধায় পড়ে গেছে।

বললাম—"চল তাহলে। দাঁড়িয়ে কেন? হাটবাজার আবার উঠে যাবে তো?"

ছেলেটি আবার সেই লজ্জিত দৃষ্টি তুলে বললে—"কিন্তু···কিন্তু আপনি তো বুড়োমানুষ নন।"

কোন্ পুণ্যবংশের সন্তান, দারিদ্র্যকে করে আছে আলো! বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে; আপনি তো "মধুসূদন নন্"—বললে যে কথাটা রূঢ় হত সেটুকু পর্যন্ত জ্ঞান আছে!

বললাম—"না, বুড়োমানুষ তো ছিলেন ভগবান নিজে, তিনি তো সব সময় সব জায়গায় যেতে পারেন না, বা যান না, তাঁর চাকরদের দেন পাঠিয়ে।"

গোধূলি আরও একটু গাঢ় হয়ে এসে সহায়তা করেছে আমায়।

"আপনি তাঁর চাকর?"—বিস্মিত প্রশ্ন করলে মেয়েটিই। তবে ছেলেটিও যেভাবে মুখের পানে চেয়ে রয়েছে, মনে হয়, অভিভূতই হয়ে আসছে। আমি মেয়েটির দিকেই চেয়ে উত্তর করলাম—"চাকরের চাকর আমি মা-মণি, তিনি যে কত বড়, কত পুণ্যে যে তাঁর নিজের চাকর হওয়া যায় সে পুণ্যি কি আমার আছে?···আরও কাছে ডেকে নেবেন বলেই এই রকম কাজে মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দেন। নিজের মুখে কি সে-সব কথা বলতে আছে?····তাহলে এটুকুও করবার পুণ্যি থাকবে না যে।···তোমার ঠাকুরমাকে বোলো, তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন—তোমাদের বাবাও জানেন, মাও জানেন—"

—ছেলেটির মুখের দিকেও চাইলাম। সেই এবার করলে প্রশ্ন—"তাহলে কোথায় থাকেন আপনি?"—সরল বিশ্বাসে কণ্ঠে যেন অমৃত ঢেলে দিয়েছে।

বললাম—"আমি থাকি এখান থেকে বহু—বহু—দূর, আজ তিনি সেইখান থেকে এই কাজের জন্যেই দিয়েছেন পাঠিয়ে আমায়, তোমাদের

দেশে এই আজ নতুন এলাম। চল, বেশি জিগ্যেস করতে নেই, আমারও বেশি বলতে নেই।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতন দুজনে সামনে পা বাড়ালে।

সত্যি, তিনিই তো দিয়েছিলেন। নইলে সেদিনে অত টাকা নিয়ে বেরুব কেন? ফেরবার ভাড়া বাদে যৎসামান্যই বাঁচবার কথা তো। কিন্তু বাক্সয় খুচরো টাকা না থাকায় দুটো দশটাকার নোটই সেদিন নিতে হয়েছিল আমায়; সাধারণত কলকাতায় বা কলকাতার মধ্যে দিয়ে কোথাও যেতে হলে কম টাকাই নিয়ে বেরুই আমি।

দিয়ে অত আনন্দ আর কখনও পাইনি। টায়েটোয়ে ফেরবার ভাড়াটা রেখে যা কিনে দিতে পারলাম—ঘি, তেল, ময়দা, সুজি, চিনি, কিছু তরি-তরকারি, মাছ—তাতে একটি কুলি করতে হল। ওরা আর কোন কথা কইলে না; বুঝছি বিশ্বাসে-বিস্ময়ে বেশই অভিভূত হয়ে পড়েছে।

ফেরবার সময় সেই মোড়টাতে এসে বললাম—"এবার তোমরা যাও, মুটেকে সঙ্গে নিয়ে, এই পয়সা কটা ওকে দিয়ে দিও। আমার যাবার সময় হয়েছে।"

কথায় সাধ্যমতো রহস্যের ভাব টেনে যাচ্ছি। মেয়েটি প্রশ্ন করলে—"আবার আসবেন?"

"আসব বৈকি মা-মণি, তিনি পাঠালেই আসব। এবার তোমাদের কষ্ট দেখে পাঠিয়েছিলেন, আবার হয়তো তোমাদের সুখ দেখবার জন্যে পাঠাবেন তিনি; তোমার দাদা পড়বে শুনবে, বড় হবে⋯"

একটু বুকে চেপে ধরে দু পা সরে এসেছি, ছেলেটি হঠাৎ এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে, তার দেখাদেখি মেয়েটিও।

শুদ্ধ অন্তঃকরণের সে-প্রণাম স্বর্গীয়, মানুষের তাতে অধিকার নেই, স্পর্শ করবার আগেই তাড়াতাড়ি মনে মনে বলে উঠলাম—'শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিতমস্তু।'

অনুমোদন করলে না আমার সে সন্ধ্যার মিথ্যাচারটুকু? দোষ হল?⋯

কেন, সে উপাখ্যানও তো অলীক; আমি না হয় সেইরকম একটি উপাখ্যান অভিনীতই করলাম।

তবু হ'য়েছে দোষ? তাহলে আর করি কি?—

সে-দোষও ভগবান শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিতমস্তু।

ওরা ওদিকে চলে গেল, আমিও স্টেশনের পথ ধরলাম। দুপা এগিয়ে ঘুরে দেখি ওরা যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়েছে; আবার তখুনি ঘুরিয়ে নিলে।

আমি দ্রুত পা চালিয়ে দিলাম, একটু এগিয়েই একটা বেশ মোটা গাছ, তার আড়ালে দাঁড়াতে হবে, এবার ঘুরে যেন আর দেখতে না পায়।

তাহলেই তো বাড়িতে গিয়ে চোখ বড় বড় করে বলবে—"হ্যাঁ গো, সত্যি বলছি! ঘুরে একবার দেখলাম তার পরেই আর নেই, নারে যমুনা?···যমুনাকে জিগ্যেস কর, ও তো মিথ্যে বলবে না।···মধুসূদনদাদা না পাঠালে এমন কখনও হয়?"

আমার এই-মিথ্যাই ওদিককার মিথ্যাটুকুকে করবে আরও পূর্ণ, আরও শুচি। সবাই করবে না বিশ্বাস, তবে করবেও অনেকে; ঠাকুরমা করবেই, হয়তো মাও করবে বিশ্বাস। অবশ্য, অনেকের মন সন্দেহ-দোলায়ও দুলবে।

একটি উপাখ্যান প্রবেশ করলো আজ এই পবিত্র গৃহস্থালীর মধ্যে—এই উপাখ্যানকে পুষ্ট করবার জন্যে ঠাকুরমার কণ্ঠে আরও সব উপাখ্যানের ধারা নামবে। তারপর ওরা দুই ভাইবোনে বলবে ওদের সন্তান-সন্ততিকে, তারা তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে দেবে এগিয়ে—এই করে ভবিষ্যৎ যতদূর, আমার উপাখ্যান থেকে মিথ্যা ততই ঝরে ঝরে পড়বে, আমার উপাখ্যান সত্যের দীপ্তিতে হয়ে থাকবে শাশ্বত।

থাকবেই; আমি যে করছি বিশ্বাস। তাঁর অসীম করুণায় আমায় দিয়ে যেটুকু করালেন তাইতে আমি যে এইটেই করছি উপলব্ধি যে, তিনি এরই জন্য কোন্ সুদূর প্রান্ত থেকে তাঁর দাসানুদাসকে এনেছিলেন ডেকে।

হাত উলটে ঘড়িটা দেখলাম—এখনও তিন কোয়ার্টার সময় আছে। বড় হালকা বোধ হচ্ছে; এইরকম একটি দিনের এইরকম একটি সন্ধ্যাই যেন

মানায়, বাঙলার একটি অখ্যাত সুদূর পল্লীতে তা আমার জন্য ছিল গচ্ছিত, বুকে করে তীর্থ-সম্পদের মতোই যাচ্ছি নিয়ে।

তখনও কি জানি পূর্ণতার আরও আছে বাকি?

সেই দুপাশে দুটো বাড়ির কাছে এসে পড়েছি···তখন সেই লোকটি কি বললে? "ঐ যে যাঁর রেডিও"···নামটা কি বললে যেন···জগদীশ ঘোষ, না বোস?···রেডিও···জগদীশ—যদি বোসই বলে থাকে!···

উগ্র প্রত্যাশায় বুকটা ধক ধক করে উঠছে···কেমন যেন মনে হচ্ছে এই নগণ্য, অনাড়ম্বর পল্লীতে সবই সম্ভব···কে জানে কত অমূল্য রত্ন আছে এর ভাণ্ডারে লুকানো! রেডিও হবে, জগদীশ বসুও হবে (যদি তাই থাকে বলে) —এত হয়েও যে শেষ পরিণাম মাত্র একজন অখ্যাত বণিক—কৈ, ফলতা কি এ ধরনের প্রবঞ্চনা করতে জানে?

হাট ভেঙে আসছে, লোক বেড়েছে পথে; একজন ভদ্রলোক; সঙ্গ নিলাম।

"কার বাড়ি বলতে পারেন?—ঐ যে রাস্তার দুদিকে।"

"জগদীশ বসুর···"

"কোন্ জগদীশ বসুর?···আচার্য···স্যার জগদীশ বসু···বৈজ্ঞানিক, মানে যিনি···?"

কি করে গুছিয়ে যথাযথভাবে প্রকাশ করি নিজেকে! ওর উত্তরের একটু এদিক-ওদিকে যে এখুনি এক পরম সম্পদ যাব পেয়ে বা বসব হারিয়েই।

"জগদীশ বসু, বৈজ্ঞানিক, যিনি প্ল্যাণ্ট অটোগ্রাফ বের করেছেন—আর ওয়্যারলেস—রেডিও—এসবও তো···আপনি থাকেন কোথায়?"

নিশচয় ভেতরে একটা কিছু হয়েছে যার জন্যে মুখে আমার একটা ছেলে-মানুষী মূঢ়তা পেয়েছে প্রকাশ। খুব সন্তর্পণে বুকে-অবরুদ্ধ শ্বাসটা মোচন করলাম, বললাম—"না, এদিকে বাড়ি নয়, থাকি কলকাতায়।"

উত্তরটা নিজের কানেই বাজল—কলকাতায় থাকে অথচ ফলতার এ বিরাট গৌরবের কথাটি জানে না, এমন মানুষও আছে নাকি! তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললাম—"ঠিক যে থাকি কলকাতায় তাও নয়—যাওয়া-আসা আছে···এই নমাস ছমাসে—থাকি পশ্চিমে, বেহারে···তাও অনে– ক দূরে····"

"ও! কেন, বহুদিন বাড়ি করেছিলেন এখানে; মাঝে মাঝে এসে থাকতেন—নিরিবিলিতে—নিজের কাজ করতেন।"

"ও!" সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে পড়বার ভয়ে আর কিছু বললাম না।

গতিও শ্লথ করে দিলাম, লোকটা এগিয়ে যাক।

অনেকখানি যখন তফাত হয়ে পড়েছে, ঘুরলাম।···একটু যাওয়া যায় না ভেতরে। একটু মাটি স্পর্শ করা। তীর্থে এলাম, মন্দিরের দ্বার থাকবে রুদ্ধই?

লোহার ফটকটা তালা দেওয়া, লোক দেখছি না ভেতরে। আরও একটু পেছিয়ে এলাম। সেই ছোট দরজাটা একটু খোলা রয়েছে।···সন্ধ্যার সময়, থাকেই লোক তো, কিছু বলে না বসে। একটু দ্বিধা, তারপর ভেতরে পা দিলাম।

একটু ফুলের বাগান; একজন মালী ঘুরে ঘুরে কি দেখছে।

প্রশ্ন করলাম—"ভেতরে আসতে মানা আছে কি?"

বাঙালী মালী (এও দুর্লভ দৃশ্য) বললে—"আজ্ঞে মানা কিসের? আসুন না।"

"এটা কার বাড়ি?"

তারপর পাছে যা শুনে এসেছি সেটা কোন অজ্ঞাত রহস্যে উলটে যায়, নিজেই তাড়াতাড়ি জুড়ে দিলাম—"জগদীশ বসুর—যিনি রেডিও, বেতার—এইসব করেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ তুলে দেখলাম চারিধারটি। সামনেই গঙ্গার ওপর বাড়িটা, চারিদিকে বাগান, কয়েকটি বেডে (bed) ভাগ করা, দুধারে ইটের পাড় দেওয়া রাস্তা। ভরা গ্রীষ্মে গাছগুলোর খুব জুত নেই, তবু যত্ন আছে বোঝা যায়। সমস্ত জায়গাটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। একেবারে বাঁদিক ঘেঁষে ছোট একটি পুকুর; বেশ গভীর বোধ হল, এদিকটায় পদ্মের লতা, ওদিকে শাপলা, রাঙা, সাদা—দুরকমই। রাঙা কতকগুলো ফুটে রয়েছে।

কেমন যেন মনে হচ্ছে স্বপ্নের ঘোরে রয়েছি।

তবে বেশ সুস্থ অনুভব করছি। বাইরের সেই সঙ্কোচটা নেই; সেন্টিমেণ্টাল হয়ে পড়বার সে লজ্জাটাও নেই। ভয়, সঙ্কোচ, লজ্জা, ও-সব সভ্যতার রোগ দেয়ালের বাইরে রেখে এসেছি। যেখানে সহজ সেখানে সবই সহজ। সেই জন্যই তো বদনের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পেরেছিলাম অত অনায়াসে; সেই জন্যেই তো নারাণীর সংসারে অত শীগগির অত নিরবশেষ হয়ে মিশে যেতে বাধেনি।

হুঁশ হল লোকটা নিড়ানি-হাতে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে চেয়ে আছে, আমার মতন তারও তো বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে যাবার কথা, সন্ধ্যায় হঠাৎ এই নতুন ধরনের অভ্যাগত দেখে। কিছু বলা দরকার।

প্রশ্নের খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম বলে আগেকার প্রশ্নটারই পুনরুক্তি করলাম, কতকটা সময় নেবার জন্যে—"তাহলে....তাঁরই বাড়ি এটা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এখনও তাহলে তাঁদের দখলে?...কে হন তাঁরা বসুমশাইয়ের?...যাওয়া আসা আছে?...থাকেন কোথায়? ...কলকাতায়?"

—একটার গায়ে একটা করে যতগুনো প্রশ্ন এসে গেল মনে সবগুনো বের করে দিলাম।

উত্তরের জন্যে তত মাথাব্যথা ছিল না তখন, ও যতক্ষণ বলবে আমি দাঁড়িয়ে একটু দেখে নোব—সেই জন্যে কি বলে গেল মনে নেই স্পষ্ট, বোধ হয় ওর শেষ হবার আগেই প্রশ্নটা করলাম—"একটু থাকতে পারি এখানে? এই খানিকক্ষণ..."

"আজ্ঞে—এখানে তো..." লোকটি ভালো, একটু যে অপ্রতিভভাবে হেসে মুখের দিকে চাইলে তাতে দ্বিতীয়বার আমার সম্বিৎ এল ফিরে, হেসেই বললাম—"ও! না, সে থাকা নয়। আমি একটু দেখতে চাই জায়গাটা ঘুরে ফিরে, একটু বাড়িটার বারান্দায় উঠে বসতাম—আপত্তি না থাকে তো..."

বুঝেছি এই অদ্ভুত আচরণের গোড়ার কথাটাও বলে দেওয়া ভালো, একেবারেই সোজা এসে পড়লাম—

"কথাটা হচ্ছে—তুমি নিশ্চয় জানও—যাঁর বাড়ি তিনি আমাদের দেশের মস্ত বড় একজন মানুষ ছিলেন—ছিলেন তো?…আমি এসেছি অনেক দূর থেকে—কলতায় এই প্রথম এলাম—এইখান দিয়েই যেতে যেতে শুনলাম এটা তাঁর বাড়ি—তাই দেশের একজন অত বড় লোক—যখন ভাগ্যক্রমে এসেই পড়েছি…"

এদের কাছে সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ায় লজ্জা নেই বটে, কিন্তু গুরুত্বটা উপলব্ধি করানোও তো শক্ত; কি ভাষায় করি প্রকাশ?

সেন্টিমেন্টেরই আশ্রয় নিলাম ভালো করে, বললাম—"একটা তীর্থ ই তো আমাদের পক্ষে, নয় কি? বল না।"

"আজ্ঞে, তা বৈকি, তিথি বলে তিথি!"

কতদূর জানত তাঁকে জানি না, তবুও একজনকে এত বড় করে বলতে দেখে, সাধ্যমতো আর একটু রঙ চড়িয়ে সমর্থন করলে। এতেই আমাদের আত্মীয়তা দাঁড়িয়ে গেল। ধূর্তেও এক শুনলে দশ করে বলে, কিন্তু এদের তো ঠিক সে-ধরনের বলা নয়, এ আমার কথাটাকে নিগূঢ় বিশ্বাসে অন্তর দিয়ে করেছে গ্রহণ, তারপর মনের পূর্ণতায় বলেছে।…আমার সেদিন অনেক সাধারণভাবে দরকারী প্রশ্নই জিগ্যেস করা হয়নি—কতদিনের মালী, তাঁকে দেখেছে কিনা—এমনকি নাম পর্যন্ত হয়নি জিগ্যেস করা; তবুও কতকটা তো জানাই সম্ভব,—একটা গৌরব-বোধ ছিলই কোথাও, আমার শ্রদ্ধা-বাণীতে সেটুকু জেগে উঠেছে।

মুখটি হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল।

বললে—"তা দেখবেন বৈকি—দেখুন—দেখলে তো কেউ আর মাটি তুলে নিয়ে যাচ্ছে না…"

আজ আমার ভুল হবে না কিছু, কোনখানেই খুঁত থাকবে না, কে যেন নেপথ্যে থেকে খেই ধরিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সেই Law of Associtaion তোমাদের মনোবিজ্ঞানের,—আমি পা বাড়িয়েছিলাম, ওর কথাটা শুনে ঘুরে দাঁড়ালাম—দৃষ্টিটা পুকুরে একতাড়া ফুটন্ত রাঙা শাপলার ওপর গিয়ে পড়েছে, একটু হেসে ওর মুখের দিকে চেয়ে

বললাম—"তোমার ঐ তুলে নিয়ে যাবার কথায় মনে পড়ল,—একটা ভুল হয়ে যাচ্ছিল না?...নিয়ে যেতে হয় বৈকি তুলে, তীর্থের মাটি কপালে লাগিয়ে নিয়ে যেতে হয় না?"

"আজ্ঞে তা হয় বৈকি, বলে তিথিই যখন...."

"তাহলে তোমায় একটা কাজ করতে হবে বাপু....সন্ধ্যে হয়ে গেছে, বলতে একটু কিন্তু হচ্ছি—ঐ শাপলার লতা আমায় যদি একটা তুলে দিতে পার গোড়া থেকে—আমি বকশিশ করব—আমারও পুকুর আছে—বসিয়ে দোব—লোভের হেতুটা বুঝতেই তো পারছ—যখন এতে ক্ষতি নেই তোমার বাগানের..."

"আজ্ঞে, ধারে ধারে জঙ্গল শাপলার—আমি নে'লুম এই—ক্ষেতিই বা কি আর বকশিশেরই বা কি আছে এতে?"

ক্লান্তি এসেছে; অনেক পাওয়ার ক্লান্তি, একটা অবসাদ। হ্যাঁ, আজকে অনেক কিছুই তো পেলাম—অনেক—অনেক....দুহাত তুলে কে আমায় দিয়ে গেল, বয়ে উঠতে পারছি না।....সুখ আছে, আনন্দ আছে, উল্লাস আছে; অশ্রু আছে, শঙ্কা আছে, সঙ্কোচ আছে; শুধুই সুখ নিয়ে করতাম কি?

আজকের দিনটা আমার সমস্ত জীবনের প্রতীক, একটি দিনে যেন সমস্ত জীবনের প্রতিবিম্ব এসে পড়েছে, যে জীবন প্রায় কাটিয়ে শেষ করে উঠলাম,—প্রভাতটি ছিল প্রশান্ত, দ্বিপ্রহরে উগ্র, তারপর এই সৌম্য গোধূলি। আমি কিন্তু সেদিকটা ভাবছি না—আমার আনন্দ, তাপদগ্ধ দ্বিপ্রহরেও প্রতি মুহূর্তে আমি জীবনকে এসেছি পেয়ে, জীবনের পথে সব মাটি মাড়িয়ে এসেছি আমি। ক্লান্তিতে নিঝুম হয়ে পড়িনি একটুকুও। আমার পরমায়ুর একটা কণিকাও হতে দিইনি অপচয়।

ক্লান্তি তো তাপেই নয়, তাপের মধ্যেই তো জীবনকে সক্রিয়ভাবে এলাম পেয়ে—বাস্তবে-কল্পনায়—বদন—ঠাকুরপুকুর—উদয়রামপুরে সেই শিশুর স্বর্গ—গৃহী-ফকীর নবাবজান—আমতলার হাট—নারাণী—সেই মৃত্যুবাসর—চলার পথে শত-বৈচিত্র্যের জীবন আমার—তাঁর আশীর্বাদ; সব কিছুর

মধ্যেই ভূমা-মহিমায় তিনি নিজেকে প্রকাশ করে ধরেছেন আমার চোখের সামনে।...ক্লান্তি কখনও আসতে পায়?

ক্লান্তি এসেছে এইবার,...যখন যাত্রাশেষে এই দক্ষিণের হাওয়া এসে গায়ে লাগছে। ক্লান্তি তো খেলার সময় নয়, ক্লান্তি, মা যখন নরম হাত বুলিয়ে গায়ের ধুলো ঝেড়ে দেন, অঙ্কে তুলে নেবেন বলে। দক্ষিণের হাওয়ায় সেই আমার মায়ের নিশ্বাস...যাওয়ার স্বপ্ন এইবার আমার চোখে ঘনিয়ে আসছে।

* * *

বাগানটা একটু ঘুরে ফিরে দেখে নিই না। গাড়িটা ছেড়ে যেতে পারে? তা যাক, এমন করে সামনের ভাবনা আর পেছনের ভাবনা একসঙ্গে ভাবা যায় না; একটা রাত না হয় আকাশের চন্দ্রাতপতলেই যাবে কাটানো, তা-ই যারা কাটাচ্ছে তাদেরও তো কেটে যাচ্ছে,—কি রকম করে,—মন্দে, কি আরও ভালোয় সেটুকুই না হয় দেখা যাবে।

বাগানের একটা মৌন ভাষা আছে না? এই নৈমিষের ঋষিই তো একদিন পেয়েছিলেন সন্ধান....একপ্রস্থ ফুল এসেছে শুকিয়ে, ঝরে পড়ছে—মরশুমী ফুল—পিঙ্ক, এসটার, পিটোনিয়া, ডালিয়া। কিন্তু, দুঃখ কি তার জন্যে?—এই ঝরে পড়াই তো বাগানের শেষ কথা নয়। ঐ যে মল্লিকার ঝাড়ে মুক্তা-বিন্দু দিয়েছে দেখা, কুঞ্চিত কলির স্তবক মাথায় করে রজনীগন্ধার শীষ আসছে বেরিয়ে।...বাগানের এই হল মৌন বাণী আজ আমার কাছে —তার নিজের ক্ষুদ্র সুখদুঃখের অটোগ্রাফ নয়, সে শোনাচ্ছে জগৎ-সত্য,—ভাবনা কি? নবীন আসছে নবসজ্জায়, নবোল্লাসে তোমার মরশুম যখন ফুরিয়েছে, প্রসন্ন দৃষ্টি নিয়েই বিদায় নাও না...

এই বাণীই নিয়ে বারান্দায় উঠে—একেবারে ওদিকে গঙ্গার ধারটিতে গিয়ে বসলাম। মালী গেছে পুকুরধার থেকে শাপলার চারা তুলে আনতে।

বড় অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছি, নিজেই যেন নিজের নাগাল পাচ্ছি না...হাওয়া উঠেছে, ঢেউ উঠেছে—তারই দোলায় মনটা যেন কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে ভেসে—কতদূর-দূরান্তে—কোন্ যুগের উপকূলে...ঐ তো সগররাজার শতপুত্র ভাগীরথীর পুণ্যস্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল...ঐতো সাগর-সঙ্গমে মহা-

মুনি কপিলের আশ্রম।....মিলিয়ে গেল—যুগও গেছে পালটে—চন্দ্রবর্ণ বিদেশী বণিকদের দল—লুণ্ঠন, অত্যাচার—তার সঙ্গে কল্যাণও আছে বৈকি—সংঘর্ষে যে অগ্নি জ্বলল, তাতে হোমের কুণ্ডও যে হল প্রজ্বলিত—ধর্মে রামমোহন-রামকৃষ্ণ, কর্মে বিবেকানন্দ-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম এনেছে নূতন ভাষা....ঐ কপিল আশ্রমেরই কাছাকাছি কোথাও সন্ন্যাসিনী কপালকুণ্ডলার কণ্ঠে সেই ভাষার কলি জেগে উঠল—"পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?"

—হারানো পথ খুঁজে পাবারই নবযুগ এসেছে।

যাবার আগে আমার মনটা যেন নতুন করে মাকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরছে—সেই দেশমাতৃকাকে, যাঁর কোলে নিয়েছিলাম জন্ম। মনটা টনটন করে উঠছে, কোনও বাণীতেই সান্ত্বনা দিতে পারছে না—যেতেই তো হবে ছেড়ে এবার....

আমার পাশে এসে বসলেন একজন সৌম্য-পুরুষ—শ্যামকান্তি, পূর্ণ মুখ-মণ্ডল, প্রশস্ত ললাট বেষ্টন করে মাথায় কুঞ্চিত কেশ, প্রতিভা-ভাস্বর প্রশান্ত নয়ন।

"আমার এই বাগানের যা বাণী তা তোমায় দেখছি সান্ত্বনা দিতে পারছে না।"

"অস্বীকার করতে পারছি কৈ, দেব?....আপনি অনন্ত প্রাণের সন্ধান দিলেন, কিন্তু মৃত্যুই কি অনন্ত নয়? তারই ছায়া যে এল ঘনিয়ে..."

"মৃত্যু নেই..."

"বেশ, মৃত্যু বলব না, কিন্তু সেই রূপান্তর—পরিচিতের সঙ্গে নিত্য বিচ্ছেদে সেও যে কত মর্মন্তুদ!..."

"সে অর্থে রূপান্তর তো নেই—রূপে রূপে একই অনন্তরূপ হচ্ছে পূর্ণ...."

"ঐ তো সূর্য—সকালে এক, দুপুরে এক, সন্ধ্যায় এক—তার পর সে তো মৃত্যুই—না হয় আবার হলই পুনর্জন্ম...."

"তোমায় আশীর্বাদ, বেশ একটা ভালো উদাহরণ নিজেই তুমি হাতে তুলে দিলে। ঐ সূর্য—মৃত্যুহীন—এমন কি পরিবর্তনহীনও...প্রতি মুহূর্তে ঐ একই সূর্য উষার প্রসন্ন দীপ্তিতে, মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড জ্বালায়, আর গোধূলির ম্লান

বিষণ্ণতায় রয়েছে মূর্তি ধরে—একই সূর্য একই ক্ষণে হচ্ছে উদয় আবার যাচ্ছে অস্ত···লোকোত্তর জগতে এসে আমি এই সত্য আরও পূর্ণভাবে করছি উপলব্ধি—বিলুপ্তি নেই—বিকৃতিও নেই···কোটি মন্বন্তরে যদি ঘটেই বিলুপ্তি তো কে জানে তা কোন্ অজ্ঞাতলোকে আবার পূর্ণতর হয়ে বিকাশেরই অন্য দিক, যেমন সন্ধ্যা অন্য দিক প্রভাতের·······না, যে-প্রাণকে আবিষ্কার করেছিলাম—লতায়-গুল্মে-শিলায় সে-ই শাশ্বত—লোকে দেখবে তুমি ছেড়ে এলে, কিন্তু তোমার দৃষ্টি লোকোত্তরেই আবদ্ধ থাকবে না কেন?—অনন্ত কাল নিয়ে তুমি যে একই আধারে শিশু-কিশোর-যুবা-প্রৌঢ়-স্থবির—একই মহাকালে যে তোমার জন্ম-জন্মান্তর—সমস্ত বিশ্ব নিয়ে যে তোমার দেশ-দেশান্তর—তবে···?"

* * *

আঃ, এই মহাসঙ্গীতের গায়ে আবার সেই ফিরে যাওয়ার বংশীধ্বনি! ফলতা মেল শেষে এমন করে বাদ সাধলে?

ব. ভ. ম.